'পুঁথি'র আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ

(অক্ষয়কুমার সেন-বিরচিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির ভাষ্য)

স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার
গোলপার্ক, কলকাতা ৭০০ ০২৯

PHONES PBX : (033)
2654-1144 2654-5700
2654-1180 2654-5701
2654-5391 2654-5702
2654-9581 2654-5703
2654-9681 2654-8494
FAX : (033) 2654-4346
E-Mail : rkmhq@vsnl.com
belurmath@vsnl.com

RAMAKRISHNA MATH
P.O. Belur Math, Dist. Howrah
West Bengal : 711 202
INDIA

২৪ এপ্রিল ২০১১

আশীর্বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাইদের কর্তৃক প্রশংসিত “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি ” ।এই পুস্তকটি জনগণের বই, অতি সাধারণ মানুষের বই ।বইটি “ পুঁথি ” নামে সকলের কাছে পরিচিত। রচয়িতা শ্রীরামকৃষ্ণ-গৃহী শিষ্য অক্ষয় কুমার সেন, যাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন “শাকচুন্নী” । বইটি সুললিত পদ্যছন্দে রচিত। ঠিক যেন গ্রামের পাঁচালী। সকলেই সুর করে পড়েন।

স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দ ধারাবাহিকভাবে “পুঁথি ”পাঠ করেছেন ইনস্টিটিউট অব কালচার- এ। সেইসঙ্গে ব্যাখ্যাও করতেন। এইপাঠ ও ব্যাখ্যার ফলস্বরূপ “পুঁথির আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ” ।

এই পুস্তকটি ভক্তদের কাছে পরম আদৃত হোক— এই প্রার্থনা।

(স্বামী আত্মস্থানন্দ)
সঙ্ঘাধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ–মহাজীবনের অসামান্য দলিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ–পুঁথি। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন এই মহাগ্রন্থের রচয়িতা। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা থেকে তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ–পুঁথি' গ্রন্থটি সম্পর্কে একটি পত্রে লিখেছিলেন : 'ধন্য শাঁকচুন্নি! (স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনকে শ্যামপুকুরে 'শাঁকচুন্নি মাস্টার' আখ্যা দেন।) শাঁকচুন্নি ঐ পুঁথি সকলকে শোনাক। ... শাঁকচুন্নি একটাও আবোল–তাবোল লিখে নাই। আমি তার পুঁথি পড়ে যে কী আনন্দ পেয়েছি, তা আর কী বলব! ...বাহবা, সাবাস, শাঁকচুন্নি! সে তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) কাজ করছে। ... শাঁকচুন্নির পুঁথি and শাঁকচুন্নি himself (নিজে) must electrify the masses (জনসাধারণে শক্তিসঞ্চার করবে)।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ–পুঁথির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পাঠক ও সমঝদার স্বামী বিবেকানন্দের উক্তির আলোকে এই মহাগ্রন্থটির গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অসাধারণ। স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দজী ইনস্টিটিউটের বিবেকানন্দ হল–এ বিগত বেশ কয়েক বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ–পুঁথি' পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলার ঘটনাসমূহের পাশাপাশি শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার মাধুর্য তুলনামূলকভাবে বর্ণিত হওয়ায় বর্তমান গ্রন্থটিতে অসাধারণ মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এই পাঠ ও ব্যাখ্যাই বর্তমান গ্রন্থটির উপজীব্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ–পুঁথি মোট পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত হলেও এই পাঁচটি খণ্ডের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডের কিয়দংশ পর্যন্ত ব্যাখ্যা বর্তমান গ্রন্থটিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থটির পাঠ ও ব্যাখ্যা–প্রসঙ্গে যে–সমস্ত সহায়ক–

গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে বা যেসব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সে-সব গ্রন্থের একটি তালিকা গ্রন্থশেষে সংযুক্ত হয়েছে।

আপামর-জনসাধারণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবসাগরের অমৃতবারিতে স্নাত হলে আমাদের এই গ্রন্থটি প্রকাশ সার্থক হবে।

বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৪১৮ স্বামী সর্বভূতানন্দ

।। প্রাক্-কথন ।।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু ।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ।।
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্টগোষ্ঠীগণ ।
সবার চরণরেণু মাগে এ অধম ।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি পয়ার ছন্দে লেখা। পুঁথি কথাটি এসেছে মূল সংস্কৃত শব্দ 'পুস্তিকা' থেকে। এই শব্দটি প্রাকৃতে হয়েছে পুথিয়া, আর তা থেকে বাংলায় পুঁথি। পুঁথি শব্দটির আভিধানিক অর্থ হাতে-লেখা প্রাচীন বই। আরও একটি অর্থ হল পুস্তক। আবার পল্লীবাংলায় সাধারণ মানুষেরা বলেন পুঁথি হচ্ছে পাঁচালি, যা গ্রাম-বাংলায় ভক্তিমান সাধারণ মানুষ সুর-সংযোগে আবৃত্তি করে থাকেন। আসলে পাঁচালি বাংলা গীতিকাব্যবিশেষ। পাঁচালি শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে সংস্কৃত শব্দ 'পাঞ্চালিকা' থেকে। সুর করে উচ্চারণ করলে তা মানুষের মনে গেঁথে যায়। তাই কামারপুকুর অঞ্চলে দেখা যায় মায়েরা ও অল্পবয়সী কন্যারা ফুল তুলতে তুলতে অথবা অন্য কোনও কাজ করতে করতে লক্ষ্মীর পাঁচালী, রামায়ণ, মহাভারত অথবা রামকৃষ্ণ-পুঁথির বিশেষ বিশেষ অংশ সুর করে গাইছেন। আজ যুগের পরিবর্তনে—পুঁথির ভাষার সঙ্গে আমাদের আধুনিক শিক্ষায় প্রচলিত ভাষার অনেক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। ফলত প্রাচীন ভাষায় সুরসংযোগে পুঁথিপাঠ ও তা শোনা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। ভাষার এবং বানানের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন এসে গেছে এই নতুন প্রজন্মে। অথচ সহজ-সরল ভাব ও ভাষায় লেখা পুঁথির একটা নিজস্ব সর্বজনীন আবেদন আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির মধ্যে এমন অসংখ্য

কাহিনী আছে যেগুলি অন্য কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না—সেগুলি আমরা এই গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে জানতে পারব। এই সঙ্গেই জানতে পারব এই পুঁথির লেখক শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের সম্বন্ধেও। কেন তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি রচনায় হাত দিলেন, এ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার আগে শ্রীরামকৃষ্ণের বর্তমান যুগে আবির্ভাবের তাৎপর্য সম্বন্ধে দু-একটা কথা জেনে রাখা প্রয়োজন। এবারে তিনি কেন গ্রাম-বাংলার দুর্গম পল্লী-অঞ্চলকে আবির্ভাব-ক্ষেত্র নির্বাচন করলেন আর কেনই বা তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন? এই বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে আমাদের এই গ্রন্থটি বুঝতে সুবিধা হবে। ভগবানের লীলাকথা তো! স্বাভাবিকভাবেই অমৃতোপম। তাই যেভাবেই উপস্থাপিত হোক না কেন তা সবার ভাল লাগবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন : মিছরির রুটি আড়াআড়ি বা সোজাসুজি যেভাবেই খাও না কেন তা মিষ্টি লাগবেই। প্রথমে সেই কথাগুলি নিয়েই আলোচনা করা হবে যেগুলি পুঁথি আলোচনার সময় স্বাভাবিকভাবেই আসবে।

26-09-1884 The Durga puja festival

অনেকের মনে এই প্রশ্নটি জাগতে পারে যে, সংসারের নানা ঝক্কি সামলে আমরা যে কিছু কিছু জপ করি—এ সবে আমাদের কি কিছু আত্মিক উন্নতি হয়? শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যে-সমস্ত ভক্তরা আসতেন তাঁদেরও কারও কারও মনে ঠিক এই প্রশ্নই দেখা দিত। এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্যে দিয়ে বর্তমান গ্রন্থটির আলোচনার সূত্রপাত।

একটি পুষ্পের কুঁড়ি ধীরে ধীরে বাতাসে দুলছে। তার গায়ে হিমেল হাওয়ার মৃদু স্পর্শ। সকালের নরম আলো কুঁড়িটির সারা অঙ্গে এনে দেয় অরুণিমার ছোঁওয়া—বলে ফুটে ওঠো, আকাশ বলে ফুটে ওঠো, বাতাস বলে ফুটে ওঠো। কুঁড়ির মধ্যে জাগে ফুটে ওঠার শিহরণ। সে প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু বড় সংশয় ও বড় সংকোচ—পৃথিবী কি তাকে স্বীকৃতি দেবে? পৃথিবী কি তাকে মেনে নেবে? এই রকম সংশয়ভরা মন নিয়ে আমরা আধ্যাত্মিক জগতে ফুটে উঠতে চাই। সেই সময় যাঁরা

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন অথবা এখনও তাঁর নামে আকৃষ্ট হয়ে আসছেন, তাঁদের মনে সংশয়, সত্যি সত্যিই কি শ্রীশ্রীঠাকুরের করুণা তাঁদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে? তাঁরা কি ঠাকুরের করুণাধারায় স্নাত হচ্ছেন?

Question by Sanakadi to Sri Vishnu

এই সংশয় কিন্তু আজকে নতুন নয়, যুগ-যুগান্তের। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি চতুঃসনের মধ্যেও এই সংশয় দেখা দিয়েছিল। একবার সনকাদি চতুঃসন্ অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার—শ্রীবিষ্ণুর কাছে উপস্থিত হয়ে বলছেন : 'তোমাকে আর আমরা মানছি না এবং ভবিষ্যতেও মানব না। কেননা তোমার রাজত্বে কোনও বিচার নেই। যদি বিচার থাকত—তবে যে পুতনা তোমাকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে চাইল, সে কিনা বৈকুণ্ঠে বাস করছে! এর নাম কি বিচার?' শ্রীবিষ্ণু স্মিত হেসে বলছেন : 'বেশ! আপনাদের কথা তো শুনলাম। আমারও কিছু কথা শুনুন।' সনকাদি চতুঃসন বললেন : 'তোমার আর কি বলার থাকতে পারে?' ভগবান শ্রীবিষ্ণু বললেন : 'আচ্ছা আপনারা তো জানেন কেউ জেনেই হোক আর না জেনেই হোক যদি আগুনে হাত দেয়—কি হয়? হাত পুড়বে, একথা সবাই জানে। আচ্ছা বেশ! কেউ যদি ঠাণ্ডা জলে হাত দেয়? হাত শীতলতা প্রাপ্ত হবে। এটা তো আপনারা মানেন। ঠিক তেমনি, কেউ জেনেই হোক আর না জেনেই হোক যদি আমাকে স্পর্শ করে, তবে তার ''বৈকুণ্ঠ-বাস'' অবধারিত।' ঠিক তেমনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে আমরা যখন একবার ধরেছি—তখন আমাদের ওপরও তাঁদের শুভাশিস এবং কৃপা বর্ষিত হচ্ছেই, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। আমরা সেটি জানি আর নাই জানি।

Bhagavata 3.2.23

??

Many Divine Incarnations of GOD in India

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, আধ্যাত্মিকতার দেশ। আর তাই ভারতবাসীরা ধর্মকে একমাত্র পাথেয় করে ভবিষ্যতের পথে যাত্রাকে পরমার্থ জ্ঞান করে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? যদি তাই হয় তবে সুদূর রামায়ণের যুগ

থেকে আরম্ভ করে প্রায় প্রতি পাঁচশো বছরের ব্যবধানে একজন করে অবতার-পুরুষের এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হওয়ার দরকার কি ছিল?

Why Divine incarnation of GOD

সত্যিই দরকার ছিল। কেননা সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদনীতি যখন প্রবল হয়ে ওঠে, ধর্মের গ্লানি যখন প্রকট হয়ে দেখা দেয়, সবল যখন দুর্বলকে নির্বিচারে পীড়ন করে, অত্যাচারের অধীনে যখন সর্বপ্রকার দুর্নীতি সহস্রশির হয়ে দেখা দেয়, তখনই যুগে যুগে অবতার-পুরুষদের আবির্ভাব হয়ে থাকে এবং তাঁরা সেই জীর্ণ মৃতপ্রায় সমাজে প্রাণ সঞ্চার করে তাকে কল্যাণের পথে, সুন্দরের পথে চালিত করেন।

Why GOD take the incarnation of Sri Ramakrishna

ভারত-ইতিহাসের এইরকম এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে পরানুকরণপ্রবণ, আত্মবিস্মৃত, মোহাচ্ছন্ন, পরস্পর বিবদমান জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে এবারে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁর আবির্ভাব মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো সমস্ত জগতে কিরণ বর্ষণ করেছে। তাঁর তপঃসম্ভূত অমিত তেজোদীপ্তি, সাধনালব্ধ জ্ঞান, অভূতপূর্ব ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীক আত্মোৎসর্গ ভারতের এক গৌরবময় ভবিষ্যতের সূচনা করেছে এবং শুধু ভারতে কেন, পৃথিবীতে মানব-কল্যাণে ও বিশ্বশান্তি স্থাপনে তাঁর সেই মহান আদর্শ, মানবজাতির জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করছে।

Incarnation of GOD also brought with them their chosen Companions

অবতার অথবা অবতার-কল্প পুরুষেরা যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তখন তাঁদের লীলার সহায়ক হিসাবে আরও অনেক মহাত্মাকে এখানে নিয়ে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায়, তা না হলে ‘লীলা-পোষ্টাই’ হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে তাঁর লীলার বর্ণনা দেওয়ার জন্য এবং তাঁর এবারের আগমনের উদ্দেশ্য কি তা প্রমাণ করার জন্য তিনি অনেককেই সঙ্গে এনেছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন গৃহী-ভক্ত, আবার কেউ হয়েছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অথবা শিষ্য।

23/12/1883 M. At Dakshineswar

Significance of Incarnation of Sri Ramakrishna

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, অন্যান্য অবতার অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের তাৎপর্য অভিনব। এবার নারায়ণের আবির্ভাব

পণ্ডিতরূপে নয়, ধনীর গৃহে নয়, উচ্চ পদমর্যাদায় নয়, এমনকী মহানগরীর কোলেও নয়। নিরক্ষর, দীন-দরিদ্র গ্রাম্য বালকরূপে এবার তাঁর আবির্ভাব। দুর্গম পল্লী অঞ্চলকে তিনি আবির্ভাব-ভূমি নির্বাচন করলেন; সাধারণ মানুষের জীবনধারা গ্রহণ করলেন আর সর্বধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শ নিজ-জীবনে রূপায়িত করে সেই আদর্শের বাণী মানব-কল্যাণে প্রচার করে তিনি ঘোষণা করলেন—‘যত্র জীব তত্র শিব’??, ‘যত মত তত পথ’??। ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ’-কার স্বামী সারদানন্দ বলছেন : যে দুঃখ-দারিদ্রের মধ্যে সম্যক তুষ্টি বা তৃপ্তির সরসতা নাই, যে অসচ্ছল সংসারে শ্রী নাই, নিঃস্বার্থতা ও প্রেম নাই, যে দরিদ্র পিতা-মাতার হৃদয়ে ত্যাগ, পবিত্রতা ও কঠোর মনুষ্যত্বের সঙ্গে দয়া-দাক্ষিণ্যাদি কোমল ভাবসকলের মধুর সামঞ্জস্য নাই, সেখানে অবতারপুরুষগণ কখনোই জন্মগ্রহণ করেন না। ??

In which Family Incarnation of GOD is born

Why GOD takes birth i.e. incarnate in the house of poor

শ্রীভগবান গরিব-ঘরে জন্মগ্রহণ করেন এইজন্য যে, যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় যাঁদের সমাজের দুঃখী, দরিদ্র এবং অত্যাচারিতদের চোখের জল মুছিয়ে হৃদয়ে শান্তি দিতে হবে, তাঁরা ঐসকল মানুষের অবস্থার সঙ্গে আগে থেকে পরিচিত ও সহানুভূতিসম্পন্ন না হলে ঐসব কাজ করবেন কীভাবে? তাই এবারে যাঁরা তাঁর কাছে আসতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বসাধারণের প্রতিনিধিত্ব ছিল। কেবলমাত্র একজন শবরী অথবা একজন গুহককে তিনি উদ্ধার করেননি। অথবা গোপ বালক-বালিকাদের মধ্যে তাঁর লীলা সীমাবদ্ধ ছিল না। সর্বপ্রকার মত ও পথের লোককে তিনি সাদরে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

Who is Akshay kumar Sen

যে-সমস্ত গৃহী-ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে আসতেন তাঁদেরই একজন অক্ষয়কুমার সেন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি রচনা করে অক্ষয়-কীর্তি অর্জন করেছেন। তাঁর জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রাম। জয়রামবাটী থেকে ময়নাপুরের দূরত্ব প্রায় ১৮ কিলোমিটার। যখন অক্ষয়কুমার সেন জীবন-সায়াহ্নে উপস্থিত তখনও তিনি হাতে একটা

Letter written by Akshay Kumar Sen on 13th April 1919

লম্বা লাঠি নিয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে মাথায় করে শ্রীশ্রীমায়ের জন্য নানারকম দ্রব্য নিয়ে অত্যন্ত অসুস্থ শরীর নিয়েও জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে এসে উপস্থিত হতেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল একটি চিঠিতে অক্ষয় সেন মশাই লিখেছেন : ‘সংসার–প্রবাহে তৃণের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে পরম দয়াল ঠাকুরের কাছে গিয়া পড়িয়াছিলাম। তিনি নিজ গুণে ভিখারিকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়াছেন।’ সেই যৎকিঞ্চিৎ বস্তুটি ঠিক কি তা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুর উদ্যান–বাটীতে কল্পতরু হওয়ার দিনটি আমাদের স্মরণ করতে হবে।

অক্ষয়কুমার সেন যে খুব উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন তা নয়। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর মায়ের কাছ থেকে মাত্র একটি পয়সা নিয়ে তিনি কোলকাতায় এসে হাজির হন। জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে তিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানোর দায়িত্ব পান। কিন্তু সেখানে যে যথোপযুক্ত সম্মান পেতেন তা নয়। অনেক অবহেলা সহ্য করতে হলেও তিনি মনের দিক থেকে ভেঙে পড়েননি। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনেছেন এবং তাঁকে দর্শন করার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু সুযোগ হয়ে উঠছে না এবং তাঁর নিজের মনেও এত সাহস নেই যে তিনি নিজে গিয়ে দেখা করবেন। কারণ তিনি একটু ভীরু প্রকৃতির ছিলেন। ‘ঠাকুর বাড়ি’তে থাকার সময় তাঁর সাথে আলাপ হয় ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে। দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেন : ‘আমাকে একটু ঠাকুরের কথা শোনান।’ কিন্তু দেবেনবাবু তাঁকে বিমুখ করেন। তাঁর কদাকার চেহারার জন্য অনেকেই তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন।

First darshan of Sri Ramakrishna by Akshay in the house of Mahimacharan ??

একদিন ঠাকুরের গৃহী–ভক্ত মহিমাচরণ তাঁর বাড়িতে ঠাকুরকে নিয়ে খুব জাঁকজমক করে উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সেই উৎসবে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বহু ভক্তের সমাবেশ হয়েছিল। দেবেন্দ্র এবং ধীরেন্দ্র ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন

করলেন। এই সময়ে সদা–সঙ্কুচিত অক্ষয়ও ধীরে ধীরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রণত হলেন। আজ তাঁর ওপর ঠাকুরের কৃপাকটাক্ষে ঝরে পড়ল করুণার মন্দাকিনী। এইটি দেখে অক্ষয় মাস্টারের অন্তর এক অব্যক্ত আনন্দে ভরে উঠল। তাঁর নিজের অনুভব পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করেছেন :

Description of first meeting with Sri Ramakrishna by Akshay Kumar Sen in Puthi Pg. 403

‘করুণ–কটাক্ষপাতে, জানি না কি আছে তাতে,
বর্ণনায় নহে বর্ণিবার।
শ্রীমূর্তি নয়নদ্বারে, প্রবেশি হৃদয়পুরে,
হৃদয় করিলা অধিকার।।’ (পৃষ্ঠা ৪০৩)

At Shyampukur rented residence of Sri Ramakrishna Narendranath has given Akshya Sen a title / nick name 'Shakchunni'

‘পুঁথি’ থেকে জানা যায় শ্যামপুকুরে স্বামী বিবেকানন্দ অক্ষয়কুমার সেনকে ‘শাঁকচুন্নী’ আখ্যা দেন। আর যেহেতু তিনি ঠাকুরবাড়িতে পড়াতেন তাই তার সঙ্গে যুক্ত হল ‘শাকচুন্নী মাস্টার’।

‘জনে জনে আখ্যা দিলা নরেন্দ্র এখানে।
সৌভাগ্যবিদিত হৈনু শাঁকচুন্নী নামে।।’

এই ‘পুঁথি’ সম্বন্ধে স্বামীজী প্রশংসা করে লিখছেন—‘তার কণ্ঠে তিনি অবির্ভাব হচ্ছেন। ...ধন্য শাঁকচুন্নী! ...আরে মোর শাঁকচুন্নী, তোরে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করছি, ভাই! ...শাঁকচুন্নী বাঙ্গলার জনসাধারণের ভাবী বার্তাবহ।’??—১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ হাতে পেয়ে স্বামীজী অত্যন্ত আনন্দিত হন। তখন তিনি আমেরিকায়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তিনি লিখেছিলেন : ‘শাঁখচুন্নী একটাও আবোল–তাবোল তো লিখে নাই। আমি তার পুঁথি পড়ে যে কি আনন্দ পেয়েছি, তা আর কি বলব।’ (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ২৪৯ নম্বর চিঠি) উপরন্তু স্বামীজী পুঁথিকারকে শ্রীরামকৃষ্ণের অমূল্য ভাব নিজে উল্লেখ করে পুঁথির ভাষায় সেটি সংযোজন করতে বলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন, গ্রামেগঞ্জে অশিক্ষিত পল্লীবাসীর কাছে এই রামকৃষ্ণ–পুঁথি আলোড়ন তুলবে।

From Newyork to Swami Saradananda on 23/12/1895

এই পুঁথি রচনার কাজে ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়কে প্রেরণা দেন।

Akshay Sen on Devendranath Majumder who has encouraged him to write puthi

'প্রথমতঃ গুরুরূপে দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
যাঁহার কৃপায় হইল প্রভু দরশন।।
লীলাগীতি গ্রন্থারম্ভ তাঁহার আজ্ঞায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায়।।' (পৃঃ ৬৩৪)

Story of Raghubar (Rajguru i.e. preceptor of the King of Puri) and Sri Jagganath of Puri

রঘুবর স্বামী পুরীধামে জগন্নাথ মহাপ্রভুর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি উচ্চকোটির একজন সাধকও। পুরীর রাজবংশের তিনি গুরুদেব ছিলেন। মাঝে মাঝেই তিনি বালগোপালরূপে জগন্নাথদেবের দর্শন লাভ করতেন। বালগোপালরূপী জগন্নাথদেবকে তিনি 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করতেন। একদিন বালগোপালরূপী জগন্নাথদেব লীলাচ্ছলে রঘুবর স্বামীকে বললেন : 'রঘুবর, চলো আজ রাজার বাগানে কাঁঠাল পাড়ব।' 'না বন্ধু, চুরি করতে যাব কেন! তুমি কত কাঁঠাল খাবে বল–না। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।' 'চুরি করে খাওয়ার যে কী আনন্দ! যখন মা–যশোদার ভাণ্ডার থেকে ক্ষীর–ননী চুরি করে খেতাম তখন তার স্বাদই ছিল আলাদা। তুমি গাছে উঠবে। আর আমি নীচে থাকব। সবচেয়ে বড় এবং পাকা–ফলটি তুমি পেড়ে নীচে ফেলে দেবে। নীচ থেকে আমি লুফে নেব।' যথারীতি সবচেয়ে ভাল পাকা এবং বড় কাঁঠালটি পেড়ে রঘুবর বলছেন : 'বন্ধু, ধরো'। বালগোপালরূপী জগন্নাথদেব কাঁঠালটি না–ধরে চট করে সরে গেছেন। আর যা হবার তা–ই হয়েছে। কাঁঠালটি নীচে পড়ে গিয়ে ফেটে চৌচির। দ্বারোয়ানরা ছুটে এসে দেখে রাজগুরু রঘুবর স্বামী কাঁঠাল চুরি করছেন। তাড়াতাড়ি রাজাকে খবর দেওয়া হল। রাজা তো বিশ্বাসই করেননি। তিনি সভাসদদের নিয়ে বাগানে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, রঘুবর স্বামী গাছের বেশ উঁচুতে উঠে সত্যিই কাঁঠাল চুরি করেছেন। রাজা বললেন : 'গুরুদেব, আপনার কাঁঠাল খাওয়ার ইচ্ছে হয়ে থাকলে আমাকে আদেশ করলেন না কেন?' তখন

রঘুবর স্বামী আনুপূর্বিক ঘটনা রাজাকে সব বললেন। এর ফলে সব লোক রঘুবর স্বামীকে আরও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করল।

সেই রঘুবর স্বামী একবার মারাত্মক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ভুগছেন, মাঝে মাঝেই তিনি রোগের তীব্রতায় অচৈতন্য হয়ে পড়ছেন। যখন একটু জ্ঞান হচ্ছে, তখন দেখছেন একটি ছোট ছেলে তাঁর শরীর পরিষ্কার করে সুগন্ধ লেপন করছে। তিনি বুঝলেন গোপালরূপী জগন্নাথদেবই তাঁর সেবা করছেন। তখন রঘুবর স্বামী বলছেন : 'গোপাল, আর কেন? তুমি তো ইচ্ছে করলেই আমার সমস্ত কষ্ট নিমেষের মধ্যেই দূর করে দিতে পার।' তখন তাঁর বন্ধুরূপী জগন্নাথদেব রঘুবরকে বলছেন : 'তোমার কষ্ট এই মুহূর্তে দূর করে দিতে পারি ঠিকই। কিন্তু তুমি কি চাও না যে (এই কষ্টটুকু সহ্য করে নিলেই) তুমি আর আমি এক হয়ে থাকি!'

ঠিক তেমনই, অক্ষয় মাস্টার—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ–পুঁথির লেখক, তিনিও শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তাঁর শারীরিক কষ্টের হাত থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। একটি আঙুলের কিছুটা অংশ দেখিয়ে মা তাঁকেও বলেছিলেন, 'তোমার আর এইটুকু কষ্ট আছে'। ??পুঁথিকার বলছেন, 'আঙুলের একটুখানিতেই যদি এতো কষ্ট হয়, তবে মা যদি আঙুলটা আর একটু বেশি করে দেখাতেন তাহলে আমার এই শরীর তা আর সহ্য করতে পারত না।'

Sri Sri Ma had told Akshay Sen that he will suffer physically a litter before his demise by showing her a little portion of a finger

অক্ষয়কুমার সেনের অন্তরে ঠাকুরের জীবনগাথা রচনার প্রেরণা দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে প্রথম অঙ্কুরিত হয়। সেকথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় ছিল। স্বামীজীকে সেকথা জানালে তিনি তাঁকে দৈব কৃপায় কবিত্বের অধিকারী, নিরক্ষর ইংরেজ কবি সিড্‌মনের (Caedmon) কাহিনী শুনিয়ে উৎসাহিত করেন। স্বামীজীর এই উৎসাহ অক্ষয়বাবুকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি তো বিদ্বান ছিলেন না। গ্রাম্যভাষায় অত্যন্ত সহজ সরল

Swami Vivekananda inspired Akshay

করে রামায়ণ–মহাভারতের মতো পদ্যে এই রামকৃষ্ণ–পুঁথি লিখেছেন। এখন বিদ্বান ব্যক্তিরাও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এই পুঁথির সমাদর করেন।

Swami Shivananda on Akshay Kumar Sen

মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন : ‘অক্ষয় সেন যিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ–পুঁথি লিখেছেন—জগতের অনেক মঙ্গল করলেন। তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন। ভক্তিমান, কিন্তু বড় গরিব ছিলেন। তিনি পুঁথিতে যেসব ঘটনা দিয়েছেন তা অতি সুন্দর। ...তিনি তখন আহিরীটোলাতে সামান্য কাজ করতেন এবং রাত্রিতে এই বই লিখতেন। তিনি গঙ্গার তীরে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ব্যাকুলভাবে ডাকতেন ও অতি কাতরভাবে প্রার্থনা করতেন : ‘‘ঠাকুর, তুমি আমায় শক্তি দাও, যাতে আমি তোমার অমূল্য জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখতে পারি’’।’??স্বামী যোগানন্দজী, স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার—এঁরাই পুঁথিকারকে শ্রীরামকৃষ্ণ–জীবনকথা রচনার উপাদান যুগিয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়াও মা যখন কামারপুকুরে বাস করছিলেন তখন তাঁর ব্যবস্থাপনায় ঠাকুরের সমসাময়িক কামারপুকুরবাসীদের কাছ থেকেও নানা তথ্যাদি তিনি পেয়েছিলেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই বইটির গুরুত্ব অপরিসীম এবং অক্ষয়কুমার সেনই শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাগাথার প্রথম উদ্‌গাতা। তাঁর লেখা দুটি বিখ্যাত গানের কথা উল্লেখ করে আমরা মূল বইটির মধ্যে আসব।

Ami sadhe ki Ramakrishna puji - one of the famous songs written by Akshay Kumar Sen

১) আমি সাধে কি রামকৃষ্ণ পূজি।
সে যে আমার অকূল পাথার, ভব–নদীর করুণ মাঝি।
সে যে আমার পরম সখা, নিজে খুঁজে দিলেন দেখা,
শত দোষে হয় না বাঁকা, যা বলি হন তাতেই রাজি।
সদাই পাছু পাছু ফিরে, পাছে কিছু পড়ি ফেরে,
ভেবে মরি বুঝতে নারি, সে ভজে কি আমি ভজি।
সে যে আমার অতি আপন, প্রাণের মতন করেন যতন,
কে আর এমন সুহৃদ সুজন, যেমন আমার রামকৃষ্ণজী।।

Another famous song written by Akshay Kumar Sen - Pakhi tui thik bose thak Ramakrishna namer mastule

২) পাখি তুই ঠিক বসে থাক রামকৃষ্ণ–নামের মাস্তুলে।
(ও তোর) বৃথা ওড়া নড়া চড়া কূল পাবিনে অকূলে।।
(ও তুই) যেদিক যাবি দেখতে পাবি জলে জলাকার,
(ও তার) নাহি অন্ত দিক দিগন্ত অপার পাথার—
(ও তোর) ধরবে ডানা ঘোর যাতনা পড়বি মহা মুশকিলে।।
(ও সে) অনন্ত অনন্ত ভাবের অন্ত কে করে
প্রধান গ্রন্থ বেদ–বেদান্ত গেল চুপ মেরে।
পুরাণেরা দিশেহারা সার হোল নাম শেষকালে।।
এদিকে অবিদ্যা মায়া পিশাচী করাল,
পাতিয়াছে মনমোহিনী রূপ–রসাদির জাল,
পাখি তুই পড়বি ফাঁদে মরবি কেঁদে—
প্রাণ হারাবি বেহালে।।
(ঐ মাস্তুল ছেড়ে চলে গেলে)।।

।। কামারপুকুর ।।

Kamarpukur

মানুষ শাশ্বত শান্তি পেতে ছুটে আসে দেবতার শান্ত, স্নিগ্ধ মন্দির–অঙ্গনে। সেখানে সকল গ্লানি নিমেষে দূর হয়ে ব্যথাহত চিত্তে ঝরে পড়ে করুণার অমৃতধারা। যেন নিদাঘদগ্ধ রুক্ষ দিগন্তে নববর্ষার শুভ আবির্ভাব। তাইতো মানুষ সুযোগ পেলেই ছুটে আসে চরম শান্তি, সান্ত্বনা এবং তৃপ্তি পেতে দেবতার মন্দির–প্রাঙ্গণে।

শ্রীধাম কামারপুকুর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের মহাপীঠ। অযোধ্যা, দ্বারকা, কপিলাবস্তু, বেথ্‌লেহেমের পাশাপাশি পরম কারুণিক ঈশ্বরের নরলীলার জন্য নির্বাচিত অপর একটি ক্ষেত্র কামারপুকুর।

কামারপুকুরের ভোরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যেন কোনও তুলনাই হয় না। মঠে মঙ্গল-আরতির ঠিক পরেই গ্রামের পথে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় আলো-আঁধারি ভোরের আকাশের এক অপরূপ রূপ-লাবণ্যের ছটা, যেটি শ্রীভগবানের সেই বিরাট রূপের কথা, ব্রহ্মের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

তিল তিল করে ফর্সা হয়ে আসে পূবের আকাশ। টুপটাপ করে তারার দল ডুবে যায় আলোর বন্যায়। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় কোনও পাখির। ডাক দেয় সে আর পাঁচজনকে। অমনি কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে সমস্ত জায়গাটা। কুয়াশার কমফোর্টার জড়িয়ে পশ্চিম দিগন্তের গাছগুলো তখনও আলসেমি ভেঙে জেগে ওঠেনি। পূব দিগন্তের গাছের মাথায় মাথায় প্রথম আবিরের ছোঁওয়া। ভোরের একটা ফুরফুরে হাওয়া, ফুলের গন্ধ সারা গায়ে মেখে মন্দিরে-মন্দিরে তার ভক্তিনম্র প্রণতি জানাতে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে বেজে ওঠে ভোরের মাঙ্গলিক শঙ্খ। এ অনুভূতি সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে, গ্রহণ করতে বেশ লাগে।

'হুগলি জেলায় গ্রাম কামারপুকুর।
সৎ দ্বিজকুলে জন্ম হৈল শ্রীপ্রভুর।।
চাটুয্যে শ্রীখুদিরাম জনক তাঁহার।
তেজস্বী ব্রাহ্মণ অতি শুদ্ধ নিষ্ঠাচার ।।' (পৃঃ ১)

কামারপুকুরের অবস্থান হুগলী, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর—এই তিনটি জেলা যেখানে মিলিত হয়েছে সেই সন্ধিস্থলে। চোখ জুড়িয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক শোভাযুক্ত শস্যশ্যামল এই কামারপুকুর গ্রামখানি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মভূমি। কামারপুকুরের দক্ষিণে আছে শ্রীপুর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে মুকুন্দপুর নামে ছোট দুটি পল্লী। এত গায়ে-গায়ে লাগা যে দেখে মনে হয় একই গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পল্লী।

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ-মঠের একেবারে লাগোয়া দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে একটি ছোট্ট পল্লী আছে। নাম সাঁওতাল পল্লী। প্রতি পূর্ণিমায় মাদল এবং ধামসার তালে তালে ওদের নাচ এবং গানের চমৎকারিত্ব মনকে মাতোয়ারা করে দেয়। এই গান এবং নাচের মধ্যে দিয়ে ওরা যেন সারা রাত ধরে ঠাকুরের আরাধনাই করে। ইদানীংকালে তথাকথিত সভ্যতার বাতাস গায়ে লাগায় ওরা এই নাচ-গান বন্ধ করে দিয়েছে।

এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতের মধ্যে ছোট গ্রামগুলোকে মনে হয় যেন সবুজ-সাগরে ভাসমান ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ। এখানে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। এখানের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে-মন্দিরে নিত্য পুজোর সঙ্গে সঙ্গে নানা পালা-পার্বণাদিও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এখানে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি-বিজড়িত দুটি মহাশ্মশান—বুধুই মোড়ল এবং ভূতির খাল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বসতবাড়ির প্রায় লাগোয়া উত্তরদিকে যুগীদের শিবমন্দির এবং তার উত্তরে বিখ্যাত হালদারপুকুর। কামারপুকুরের উত্তর-পশ্চিমে মানিক রাজার আমবাগান, এখন যার অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। তবে হাতিসায়ের, সুখসায়ের এবং মানিকরাজার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের মধ্যে পরে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে বলা হবে বলে মোটামুটি শুধু নামগুলো বলে রাখা হল। কামারপুকুরে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, সদ্‌গোপ, কামার, কুমোর, জেলে, ডোম—প্রায় সর্বপ্রকার জাতিরই বসতি আছে। সকলের সঙ্গে সকলেই খুব সম্প্রীতি রেখেই বসবাস করেন। এখানকার লোকেদের সরলতা দেখলে অবাক হতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃদেব শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কোনও অর্থকরী বিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল কি না জানা যায় না। কিন্তু সত্যনিষ্ঠা, সন্তোষ, ক্ষমা, ত্যাগ প্রভৃতি যে গুণগুলি সৎ ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, বিধাতা তাঁকে ঐসকল গুণ প্রচুর পরিমাণে

দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ভক্তিমান, প্রিয়দর্শন। শারীরিক গঠন লম্বা এবং তিনি ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

তাঁর প্রকৃতি ছিল সদা অন্তর্মুখ। এজন্য তাঁর জীবনে মাঝে মাঝেই নানা দিব্যদর্শন হত। প্রতিদিন ভোরে ও সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যা করতে বসে তিনি গায়ত্রীদেবীর ধ্যান করতে করতে এত তন্ময় হয়ে যেতেন যে, তাঁর বক্ষঃস্থল লাল হয়ে উঠত এবং চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু ঝরে পড়ত। বিশেষ করে ভোরবেলা যখন তিনি সাজি হাতে নিয়ে ফুল তুলতে যেতেন, তখন দেখতেন তাঁর আরাধ্যা দেবী মা শীতলা আট বছরের কন্যার রূপ-ধরে লাল শাড়ি পরে ও নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ করতে করতে যাচ্ছেন এবং যে-ডালে প্রচুর ফুল ফুটে আছে সেই ডাল নুইয়ে ধরে তাঁকে ফুল তুলতে সাহায্য করছেন।

‘পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁর যাইয়ে আপনি।
আরাধ্যা শীতলামাতা বালিকারূপিণী।।
আভরণে শোভে অঙ্গ পরিধেয় লাল।
নুয়ায়ে ধরিত দ্বিজে কুসুমের ডাল।।’ (পৃঃ ১)

ক্ষুদিরামের শান্ত-সৌম্য রূপ দেখে গ্রামবাসীরা তাঁকে ঋষির মতো শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। রাস্তাঘাটে দেখা হলে বৃথালাপ বন্ধ করে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণামের ভঙ্গিতে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি যখন স্নান করতেন তখন অন্য স্নানার্থীরা তাঁর স্নান শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

‘ব্রহ্মশক্তি-পরিপূর্ণ তেজপুঞ্জ কায়।
দেখিলেই শ্রদ্ধা-ভক্তি আপনি উজায়।।
নিধন যদিও তাঁর ঘরে নাই অর্থ।
সম্মুখে দাঁড়াতে কারো না ছিল সামর্থ্য।।
যে পুকুরে নিতি নিতি হত স্নান তাঁর।
তাঁর আগে নামে জলে সাধ্য নাই কার।।’ (পৃঃ ১)

।। ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রামণি ।।

মহাতীর্থ কামারপুকুর পরিক্রমায় এখানকার আকাশ-বাতাস, গাছপালা, লতা-গুল্ম প্রভৃতির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক-ভাবটি ঘনীভূত হয়ে আছে সেটি বিশেষভাবে অনুভব করা যায়।

সূর্যদেবের রথচক্রের দ্রুত আবর্তনে অসীম আকাশে যেমন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়, বিকেল হয় রাত, রাত হয় সকাল—মহাকালের রথচক্রের আবর্তনে এক শতাব্দীর অন্ধকারপুঞ্জ তেমনই পরের শতাব্দীতে দূরীভূত হয়ে যায়। সত্যের শুকতারা একদিন যে প্রকাশিত হবেই। জীবনের দুঃখ-দৈন্যের অন্ধকার শুধু যে প্রভাতেরই অগ্রদূত—কলকাকলিময়, ফুলফোটা অমৃতঝরা প্রভাত।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সত্যপালনের মধ্যে দুঃখ আছে। কিন্তু দুঃখ-যন্ত্রণার পথ বেয়ে আঘাতের মধ্যে দিয়ে বরঞ্চ ভগবানকে লাভ করা যেতে পারে; কিন্তু বঞ্চনা, প্রতারণার মসৃণ পথ দিয়ে তিনি কোনোদিনও আনা-গোনা করেন না। আজন্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদিরাম এটি মন-প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। কুলদেবতা রঘুবীরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ক্ষুদিরাম দেরেগ্রামে জমিদারের হয়ে মিথ্যে সাক্ষ্য না দেওয়ায় তাঁর পৈতৃক ভিটেমাটি ও দেড়শো বিঘে চাষের জমি সব ত্যাগ করে গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন : তাঁর সত্যিই কি আর কিছুই থাকল না!

Dere gram - ancestral village of Kshudiram father of Sri Ramkrishna, Kshudiram left it due to
Dere gram Zamidar's atrocity

আছেন। তাঁর প্রাণপ্রিয় রঘুবীর আছেন। অভয় আশ্রয়ের স্নিগ্ধ আতপত্র মেলে ধরেছেন আকাশে। যার কেউ নেই, কিছু নেই তারও স্থান আছে। স্থান আছে অন্তরে, স্থান আছে অনন্তে।

Sukhlal Goswami Zamindar of Kamarpukur requested Kshudiram to stay in his
village

সম-স্বভাববিশিষ্ট ক্ষুদিরামের বহুকালের বন্ধু কামারপুকুরের জমিদার সুখলাল গোস্বামী মহাশয় নিজের বাড়ির একাংশে কয়েকখানি চালাঘর চিরকালের জন্য ছেড়ে দিয়ে বন্ধু ক্ষুদিরামকে কামারপুকুরে

এসে বসবাস করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ক্ষুদিরাম শ্রীভগবানের অচিন্ত্য লীলার কথা মন-প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করলেন। লক্ষ্মীজলার ধানী-জমি পেলেন একবিঘে দশ ছটাক। বর্তে গেলেন ক্ষুদিরাম। যিনি নেন, তিনিই আবার ফিরিয়ে দেন। এক দোর দিয়ে যান, হাজার দোর দিয়ে আসেন। নিত্যেও তিনি—লীলায়ও তিনি। একদিন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রামণি স্বামীকে বলেছিলেন, ‘ঘরে আজ চাল নেই।’ তবুও ক্ষুদিরাম বিচলিত হননি। বলেছিলেন, ‘তাতে কি? আমাদের প্রাণের রঘুবীর যদি উপোস করেন, তবে আমরাও উপোস করব।’ সৌম্যোজ্জ্বল চোখে হেসেছিলেন রঘুবীর। লক্ষ্মীজলার ধানী-জমি সোনার ধানে ঝলমল করে উঠল। ক্ষুন্নিবৃত্তির তৃপ্তিতে যেন প্রসন্ন হাসি হাসছেন দেবতা।

নানা ঘাত-প্রতিঘাতে এই সময় ক্ষুদিরামের স্বভাব হয়ে গিয়েছিল অত্যন্ত অন্তর্মুখ। এই দৈবী অবস্থাটির জন্য তাঁর জীবনে নানা দিব্যদর্শন মাঝে-মাঝেই এসে হাজির হত। প্রতিদিন ভোরে ও সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যাহ্নিক করতে বসে তিনি যখন ‘ওঁ আয়াহি বরদে দেবী’—ইত্যাদি মন্ত্র বলে গায়ত্রীদেবীর আবাহন ও ধ্যান করতেন তখন তাঁর বক্ষঃস্থল রক্তিম বর্ণ ধারণ করত এবং চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু ঝরে পড়ত।

তিনি ছিলেন বাক্‌সিদ্ধ। তাই গ্রামের কেউ অসুস্থ হলে বা অন্য কোনও অসুবিধায় পড়লে তাঁর পায়ের ধুলো এবং আশীর্বাদ নিতেন।

।। অবতার-পুরুষের পিতা-মাতা সরল হন ।।

Avatar purusher Mata pita saral hon.
Parents of Incarnation of GOD are usually guileless persons

যুগে যুগে ভগবান মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেই বিশেষ লীলা করেছেন। অবশ্য মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহ অবতারের লীলা একটু ভিন্ন রকমের। ভগবান যে-সকল লীলাতে মানুষ-রূপ ধারণ করে, মানুষকে ধর্ম শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, সে-সকল ক্ষেত্রে তিনি এমন মাতা-পিতার সন্তান হয়েছেন—যাঁরা অতি বিশুদ্ধ চরিত্র, ধর্মশীল এবং সরল প্রকৃতির। বহু জন্মের তপস্যার ফলেই মানুষ সরল হতে পারে। সরলতা একটি দৈবী গুণ। চন্দ্রামণি দেবী এবং ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ সৎ, পবিত্র এবং সরল ছিলেন। আর তাই ভগবান বিষ্ণু চন্দ্রামণির গর্ভে বালক গদাধররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যলীলার সঙ্গে তাঁর পরিবারের প্রত্যেকেরই একটা তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে। প্রত্যেকের মধ্যেই ছিল গভীর আধ্যাত্মিক ভাব। শ্রীভগবানের এই লীলা উপলব্ধির জন্য আমাদের ঐসব দিব্যচরিত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া দরকার। শ্রীযুক্ত রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ক্ষুদিরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি গ্রামের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করে ব্যাকরণ সাহিত্য এবং স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে সংসারের জন্য অর্থোপার্জন করতে আরম্ভ করেন। শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কাজে রামকুমার বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গানুযায়ী আদ্যাশক্তির উপাসনায় রামকুমার সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং একদিন পুজো করবার সময় আদ্যামায়ের দর্শন পান এবং অনুভব করেন মা আদ্যাশক্তি নিজের আঙুল দিয়ে তাঁর জিহ্বাগ্রে জ্যোতিষশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য কোনও মন্ত্রবর্ণ লিখে দিচ্ছেন। এর ফলে তিনি যে-কোনও রোগী সম্বন্ধে যা বলতেন সেগুলি সব সত্য হত। ভবিষ্যদ্বক্তা হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

Jyestha brata Ramkumar Pg. 40 of Puthi Character of Eldest brother Ramkumar

‘পল্লীমধ্যে পরিচিত শ্রীরামকুমার।
কেবল পাণ্ডিত্যে নহে বহুগুণ তাঁর।।
সিদ্ধবাক্ স্বল্পে তুষ্ট অতি মিষ্টভাষী।
সাধুর প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী’।। (পৃঃ ৪০)

দৈবীশক্তির অধিকারী হওয়ার পর তিনি কলকাতার এক ধনী ব্যক্তির স্ত্রীর মৃত্যু সম্বন্ধে সফল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং নিজের সুলক্ষণাযুক্ত স্ত্রীর অকালমৃত্যু সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ–লীলায় শ্রীযুক্ত রামকুমারের বিশেষ ভূমিকা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। তিনিই ছোট ভাই গদাধরকে কলকাতা নিয়ে আসেন এবং কালক্রমে দক্ষিণেশ্বরে রাধাকান্তের মন্দিরে পূজারি করেন।

Sri Ramakrishna started his worshiping duty as the worshiper of Sri Radhakanta of Dakshineshwar temple complex.

Akshay - Only son of Ramkumar

শ্রীরামকৃষ্ণ–লীলায় ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়েরও বিশেষ স্থান আছে। জন্মগ্রহণের সময়ই অক্ষয়ের মাতাঠাকুরানী পরলোক গমন করেন। কাকা গদাধর অক্ষয়কে দু–তিন বছর বয়স পর্যন্ত কোলে–পিঠে করে মানুষ করেছেন। অক্ষয়ের রূপ ও গুণ ছিল প্রশংসনীয়। যেন জীবন্ত শিবমূর্তি। সুন্দর ভাব । বাল্যকালেই তিনি রঘুবীরের সেবা–পূজাদি বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে করতেন। দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে অক্ষয় যখন পুজো করতেন তখন এত তন্ময় হয়ে যেতেন যে, সেখানে বহু লোক–সমাগম হলেও তাঁর বাইরের জগৎ সম্বন্ধে কোনও হুঁশ থাকত না। অক্ষয় একনাগাড়ে ঘণ্টা–দুই ঐভাবে ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকতেন। পুজো শেষ করে পঞ্চবটীতে গিয়ে অক্ষয় অনেকটা সময় নিয়ে শিবের পুজো করতেন। তারপর নিজের হাতে রান্না করে দুপুরে খাওয়া–দাওয়ার পরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতেন।

Akshay was also worked in Dakshineshwar temple complex as the worshipper of Radhagovindaji

Demise of Akshay

অক্ষয়ের বিবাহ হয়েছিল কামারপুকুরের কাছাকাছি বাঁকুড়া জেলার কুচেকোল গ্রামে। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে অক্ষয় খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ঠাকুর শুনে বললেন : ‘এইরে! ও হৃদু, এ লক্ষণ তো ভাল নয়। আমার মনে হচ্ছে কোনও রাক্ষসগণবিশিষ্টা কন্যার সঙ্গে অক্ষয়ের বিয়ে হয়েছিল। এ ছোঁড়া তো বাঁচবে নারে!’ এই যাত্রায় রামেশ্বর অক্ষয়কে কামারপুকুরে নিয়ে এসে ভাল করে চিকিৎসা করিয়ে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠিয়ে দেন।

Sri Ramakrishna predicted demise of Akshay

দক্ষিণেশ্বরে তাঁর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয় এবং তিনি আরও অনেক বেশি রূপবান হয়ে ওঠেন। দেখে মনে হয়, ‘বাঃ! এবার বোধহয় ভাল হয়ে গেল।’ কিন্তু আবার জ্বরে পড়েন। তখন ঠাকুর বললেন : ‘হৃদু, লক্ষণ ভাল নয়। ডাক্তাররা ধরতে পারছে না। বলছে যে, এমনি সাধারণ জ্বর। তা নয় কিন্তু। অক্ষয়ের বিকার দেখা দিয়েছে। খুব আশ মিটিয়ে ভাল ডাক্তার আনিয়ে চিকিৎসা কর, সেবা কর। ও ছোঁড়াটা বাঁচবে না।’ হৃদু বললেন : ‘ছি ছি! মামা, তোমার মুখ থেকে শেষপর্যন্ত একথা বেরল।’ ঠাকুর বললেন : ‘মা যা দেখান, যা বলান, আমাকে তো তা–ই বলতে হবে। আমি কি চাই অক্ষয় মরুক!’

Akshay left his mortal coil after repeating "Ganga, Narayan, Om Ram" three times as instructed by Sri Ramakrishna

মাসখানেক ভোগার পর যখন অক্ষয়ের শেষ সময়, তখন ঠাকুর তাঁর শয্যার পাশে গিয়ে বলছেন : ‘অক্ষয়, বল—গঙ্গা, নারায়ণ, ওঁ রাম।’ এই মন্ত্র তিনবার বলার পরেই অক্ষয় শরীর ত্যাগ করলেন। ঠাকুর তখন উচ্চভূমি থেকে মৃত্যুকে দেখছেন। হৃদয় যত কাঁদছেন, ঠাকুর উচ্চ ভাবভূমি থেকে ততই হাসছেন। দেখলেন যেন খাপ থেকে তরোয়ালটা বের করে নেওয়া হল। কিন্তু তরোয়াল যেমন, তেমনই ঝকঝকে থাকল।

From higher plane of consciousness Sri Ramakrishna did not feel the sorrow of Akshay's demise

উচ্চ ভাবভূমি থেকে সাধারণ ভূমিতে যখন ঠাকুর নেমে এলেন, তখন অক্ষয়ের অকালমৃত্যুতে খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে সিমুলিয়াপল্লীর মণিমোহন মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুর প্রসঙ্গটি স্মরণ করা যায়। মণিমোহন পুত্রের অকালমৃত্যুতে কাতর হয়ে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। এই সময়ে ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ করছিলেন। হঠাৎ পুত্রশোকাতুর মণিমোহনকে দেখে ঠাকুর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মণিমোহন উত্তরে বললেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের

Consoling Manimohan Mallick of Simuliapalli

দাহ-কার্য শেষ করে ঠাকুরের কাছে সান্ত্বনা পাবার জন্যে এসেছেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী এই নিদারুণ দুঃসংবাদে সবাই হতবাক হয়ে গেলেন। ঠাকুরও কিছুক্ষণ কোনও কথা না বলে নীরব থাকলেন। ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ঠাকুরকে নীরব দেখে কোনও কোনও ভক্ত মনে করলেন যে ঠাকুরের হৃদয় কী কঠিন, কঠোর! কিন্তু হঠাৎ ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় অপূর্ব তেজের সঙ্গে গেয়ে উঠলেন—

জীব, সাজো সমরে
(ঐ দেখো) রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।... ইত্যাদি

ঠাকুরের গলায় তেজোময় ভঙ্গিতে এই গান শুনে ভক্তগণও অনুপ্রাণিত হয়ে মনে মনে ঐকান্তিকভাবে ঠাকুরের পূতসঙ্গ চিরকাল লাভ করবার জন্য প্রার্থনা জানাতে লাগলেন।

সাধারণ-ভূমিতে নেমে এসে ঠাকুর পরম সহানুভূতির সঙ্গে মণি মল্লিকের কাছে বসে বলতে লাগলেন : 'আহা! পুত্রশোকের মতো কি আর জ্বালা আছে? খোলটা (দেহ) থেকে বেরোয় কিনা? খোলটার সঙ্গে সম্বন্ধ—যত দিন খোলটা থাকে ততদিন থাকে।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, প্রথম ভাগ, গুরুভাব পূর্বার্ধ, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃঃ ১৩) ঠাকুর এত বিমর্ষ ও গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলছিলেন যে, স্পষ্ট মনে হচ্ছিল যেন নিজের কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু নিজের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছেন।

গানের মধ্য দিয়ে ঠাকুর ভক্তদের মন ইতিপূর্বেই অনেক উচ্চভূমিতে স্থাপন করেছিলেন, এখন মণিমোহন তাঁকে বললেন : এই শোকে সান্ত্বনা পাবার জন্যেই তো শ্মশান থেকে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

।। অবতার-পুরুষের জন্ম অতিলৌকিক—সাধারণ মানুষের মতো নয় ।।

Avatar purusher janma atiloukik - sadharan manusher mato naye

ভগবান ধর্মের গ্লানি দূর করার এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে-যুগে মানুষকে নিজ জীবনের সাধনা দেখিয়ে ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অবতার-পুরুষের নরদেহ ধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম-মেনে হয় না এবং তা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগোচর। যজ্ঞের চরু ভক্ষণ করে কৌশল্যার গর্ভে আগমন করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। কংসের কারাগারে স্বপ্নে মা-দেবকীর গর্ভে আগমন করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান তথাগতের জননী মায়াদেবীও জ্যোতির্ময় শ্বেতহস্তীর রূপ ধরে কোনও পুরুষপ্রবর যেন তাঁর শরীরে প্রবেশ করছেন—এই রকম স্বপ্ন-দর্শন করে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন ভগবান বুদ্ধদেবকে। তাঁর সৌভাগ্য দেখে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ যেন তাঁকে বন্দনা করছেন। এক অভূতপূর্ব দিব্য আবেশে তন্ময় হয়েই মা মেরীর গর্ভে যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাব। এ-যুগে শ্রীবিষ্ণু গদাধর স্বপ্নে এবং বিশেষ বায়ুরূপে প্রবিষ্ট হয়েছেন মা চন্দ্রামণির গর্ভে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মও এই রকম দৈবলীলাতেই। শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে শ্রীভগবান এরকম 'দিব্য' জন্ম ও কর্মের কথা উল্লেখ করেছেন। আর একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, অবতারের মাতা-পিতাগণ সন্তানের জন্মের আগে বহুপ্রকার দিব্যস্বপ্ন এবং দেবদেবীর দর্শন লাভ করে থাকেন।

শ্রীভগবান যখন তাঁর নিত্যসিদ্ধ শ্রীমূর্তি জগতে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দর্শন ও সেবা করে ভক্তেরা কৃতার্থ হন। অসুর-প্রকৃতি দুষ্ট লোকেরাও সেই সময় তাঁর সংস্পর্শে এসে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু জগতের এই সৌভাগ্য তো বেশিদিন স্থায়ী হয় না। বহুকাল পরে শ্রীভগবান আবির্ভূত হয়ে অল্প দিনই এই জগৎকে ধন্য করে তারপর আবার অপ্রকট হয়ে যান। ভগবানের প্রকটলীলায় যেসব ব্যক্তিরা তাঁর

দর্শন পাননি তাঁরা ভাবেন—আমাদের তো সেই সময় জন্মগ্রহণ করবার সৌভাগ্য হয়নি—আমাদের কি গতি হবে? নরোত্তম দাস ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের নরদেহে অবস্থানকালে জন্মগ্রহণ করতে পারেননি বলে দুঃখ করে বলেছিলেন—'তখন না হইল জন্ম / এবে দেহে কিবা কর্ম / বৃথা মাত্র বহি দেহভার।'

ভগবানের তিরোধানে হতাশ জীবের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে দেবতারা বলছেন—হে প্রভু! আপনার প্রকটলীলায় যাঁরা আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁরা পরম ভাগ্যবান। অন্য সময়ে আপনার শ্রীমূর্তি ধ্যান করেই জীবেরা ভবসাগর পার হয়ে যায়।

।। মা চন্দ্রামণি ।।

Maa Chandramani

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ধর্মগ্রন্থে দেখা যায় অবতারপুরুষদের পৃথিবীতে আবির্ভাবকালে তাঁদের পিতামাতার জীবনে অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভব ও দর্শন হয়। এসব অতিলৌকিক ঘটনা না হলে মানুষ আর ভগবানে পার্থক্য হবে কেন? আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর পিতামাতার জীবনে নানা দিব্যদর্শন ও অনুভবের বিষয়ে জানতে পারব। ঠাকুরের পিতৃদেব ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে বেশ কিছু কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে এবং পরে মাঝে মাঝেই তাঁর সম্বন্ধে আরও তথ্যাদি উপস্থাপিত করা হবে।

গদাধর অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠাগ্রজ রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে ইতিপূর্বে দু-চারটি কথা বলা হয়েছে। রামকুমারের বয়স তখন পনেরো বছর। তাঁর বিবাহের এক বছর আগের ঘটনা। রামকুমার এই সময় শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি, পুজো-আচ্চা করছেন যজমান-বাড়িতে। লক্ষ্মীপুজোর রাত। দিন থাকতে-থাকতেই পাশের গ্রাম ভূরসুবো গিয়েছেন। মাঝরাত হয়ে গেল, তবুও তিনি ফেরেননি। ছেলের জন্যে ঘর-বার করছেন মা চন্দ্রামণি। মন বড় উচাটন। এখনও ফিরছে না কেন রামকুমার?

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিস্তব্ধ রাত এক ঐশ্বরিক রূপলাবণ্যে ভরপুর। শিশিরের ভারে নুয়ে পড়া লম্বা লম্বা দূর্বাঘাসগুলি চোখের জল দিয়ে যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম ধুয়ে দেবে বলে প্রস্তুত হয়ে আছে। বড় বড় গাছের পাতার শিরশিরে আওয়াজ একটু কান পেতে শুনলে মনে হয় ওরা যেন 'বাগেশ্রী' রাগে গান গেয়ে সর্বব্যাপী ঠাকুরের বন্দনা করছে। দূরের ছোট ছোট গ্রামগুলো চাঁদের আলোয় খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পথের দিকে আকুল চোখে তাকিয়ে আছেন মা চন্দ্রামণি। অনেকক্ষণ পরে দেখলেন কে একজন যেন মাঠ পেরিয়ে ভূরসুবোর দিক থেকে আসছে। রামকুমারই বোধহয়! দু-পা এগিয়ে গেলেন চন্দ্রামণি। কিন্তু এতো তাঁর রামকুমার নয়। এ যে একটি অপূর্ব সুন্দরী অল্পবয়সী কন্যা! স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা। 'কোত্থেকে আসছ মা তুমি'—প্রশ্ন করেন মা চন্দ্রামণি! —'ভূরসুবো থেকে'। ব্যাকুল হয়ে চন্দ্রামণি জিজ্ঞেস করেন : 'আমার রামকুমারের কোনও খবর বলতে পার?' —'যে বাড়িতে তোমার ছেলে পুজো করতে গিয়েছে আমি সেই বাড়ি থেকেই আসছি। ভয় নেই এখনি ফিরবে।' চন্দ্রামণির বুকের ভার যেন নেমে গেল। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেন, 'এত রাতে এত গয়নাগাটি পরে কোথায় যাচ্ছ মা? —তোমার কানে ওটি কি গয়নাগো?' স্বর্গীয় হাসিতে মেয়েটির মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল : 'ওকে কুণ্ডল বলে। আমাকে এখন অনেক দূরে যেতে হবে মা।' চন্দ্রামণির গলায় আকুলতা ঝরে পড়ে। 'মা তোমার বয়স অল্প। এই সময় না গিয়ে রাতটা আমাদের বাড়িতে বিশ্রাম করে কাল ভোরে যেখানে যাওয়ার যেও মা।' 'না মা আমায় এখনি যেতে হবে। আরেক সময় তোমাদের

বাড়িতে আসব।’ মেয়েটি চলে গেল। কিন্তু মাঠ দিয়ে বা মেঠো শুঁড়ি পথ দিয়ে নয়। তাঁদের বাড়ির পাশেই নতুন জমিদার লাহাবাবুদের সারি সারি ধানের গোলার দিকেই চলে গেল। ওদিকে তো কোনও রাস্তা নেই। মেয়েটি কি পথ হারালো? চন্দ্রামণি এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু গেল কোথায় মেয়েটি! কেমন যেন সন্দেহ হল। ‘নানাভরণশোভাঢ্যা নানারত্নোপশোভিতাঃ’—এ তবে কাকে দেখলাম আমি? স্বামীকে ঘুম থেকে তুলে সব বললেন চন্দ্রামণি। সব শুনলেন ক্ষুদিরাম। বললেন : মা লক্ষ্মী কৃপা করে তোমাকে দর্শন দিয়েছেন।

ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রামণির কন্যা কাত্যায়নী। তার বড় অসুখ। আনুড়ে তার শ্বশুরবাড়িতে মেয়েকে দেখতে গিয়েছেন ক্ষুদিরাম। অসুস্থ কন্যার হাবভাব দেখে তাঁর ধারণা হল ভূতাবেশ হয়েছে মেয়ের শরীরে। তখন সমাহিতচিত্তে শ্রীভগবানকে স্মরণ করে তিনি কন্যা-শরীরে প্রবিষ্ট জীবকে উদ্দেশ্য করে বললেন : ‘তুমি দেবতা বা উপদেবতা যেই হও, কেন আমার কন্যাকে এরকম কষ্ট দিচ্ছ? এখনি এর শরীর ছেড়ে অন্যত্র গমন করো।’ এই কথা শুনে ঐ জীব ভীত হয়ে কন্যা কাত্যায়নীর শরীর অবলম্বন করে বলল, ‘গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করবেন—এই কথা দিলে এক্ষুনি আপনার কন্যার শরীর ছেড়ে চলে যাব—কথা দিচ্ছি।’ ক্ষুদিরাম বলেন : বেশ, তা-ই হবে। যত শীঘ্র সম্ভব গয়াধামে গিয়ে তোমায় পিণ্ডদান করব। তবে তুমি যে পিণ্ডদানের পর উদ্ধার হলে সে-সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পেলে খুশি হব। তখন প্রেতটি বলল : ‘ঐ-বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণস্বরূপ সামনের নিমগাছের সবচেয়ে বড় ডালটি আমি ভেঙে দিয়ে যাব।’ শোনা যায়, এই ঘটনাটি ক্ষুদিরামকে গয়াধামে যাত্রা করতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। এই ঘটনার কিছুকাল পরে নিমগাছের ডালটি ভেঙে পড়ায় সকলে ঐ প্রেতের উদ্ধার হওয়ার কথা জানতে পেরেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের প্রবেশপথ (পৃঃ ১০-১১)

কামারপুকুর গ্রামের দৃশ্য (পৃঃ ১০-১১)

মানিক রাজার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ (পৃঃ ১২–১৩)

ভুরসুবোর মানিক রাজার আমবাগানের কিছু অংশ (পৃঃ ১২–১৩)

হালদারপুকুর (পৃঃ ১৪–১৫)

সেতুবন্ধ–রামেশ্বর তীর্থের পর এবার ক্ষুদিরাম চলেছেন গয়াধামে। চলেছেন পায়ে হেঁটে। পদব্রজে না হলে তীর্থ কি! ক্লেশ না করলে ক্লেশমোচনের স্পর্শ পাবেন কী করে? সেটা ১২৪১ সালের শীতকাল। গয়া পৌঁছালেন চৈত্রের শুরুতে। চৈত্র মাস মধু মাস। মধুমাসেই পিণ্ডদান প্রশস্ত। শাস্ত্রবিধি মেনে ক্ষুদিরাম পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অর্থাৎ গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ডদান করলেন। পিণ্ডদানের পর তাঁর মনপ্রাণ এক অভূতপূর্ব শান্তি ও আনন্দে ভরে গেল। শ্রীভগবানের অপূর্ব লীলা অনুভব করে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সারাদিন তাঁর মন এক অনাস্বাদিত শান্তিতে পূর্ণ থাকায় রাতে একটি দেব–স্বপ্ন দেখলেন। তিনি যেন আবার পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদান করছেন এবং তাঁরা দিব্য জ্যোতির্ময় রূপ ধরে আনন্দের সঙ্গে পিণ্ড গ্রহণ করে তাঁকে আশীর্বাদ করছেন। সুদীর্ঘকাল পরে পিতৃপুরুষদের পুনরায় দর্শন করে বিনম্র ভক্তি–শ্রদ্ধায় তাঁদের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করছেন। এই সময়েই আবার দেখতে লাগলেন, অদৃষ্টপূর্ব দিব্যজ্যোতিতে মন্দির পূর্ণ হয়ে গেল। আর সেই জ্যোতির সমুদ্রে নবদূর্বাদলশ্যাম এক পুরুষ–প্রবর প্রসন্নদৃষ্টিতে তাঁর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে তাঁকে কাছে যাবার জন্য যেন ইঙ্গিত করছেন। ঐ দেব–পুরুষের আদেশে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভক্তিগদগদচিত্তে নানারকম স্তব–স্তুতি ও বন্দনা করতে লাগলেন ক্ষুদিরাম। ঐ দিব্য পুরুষ এতে আরও প্রসন্ন হয়ে অত্যন্ত মিষ্টস্বরে বললেন : 'ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে আমি খুবই খুশি হয়েছি। পুত্র হয়ে তোমার সেবা গ্রহণ করব।' এই কথা শুনে তিনি যেন আনন্দের জোয়ারে ভাসতে লাগলেন। কিন্তু নিজের সাংসারিক অস্বচ্ছলতার কথা চিন্তা করে গভীর বিষাদে পূর্ণ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন : 'না–না প্রভু, আমার ঐরকম সৌভাগ্যের কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি যে কৃপা করে আমাকে দর্শন দিয়েছেন এতেই আমার মনপ্রাণ ভরে গিয়েছে। সত্যি–সত্যি আমার পুত্র হয়ে জন্মালে আপনার

1241 Bengali year winter [1835 CE] - Kshudiram started for Gaya and arrived at the beginning of Chaitra

সেবা ঠিকমতো করতে না পেরে আমি সেবা-অপরাধী হয়ে আরও অনেক বেশি কষ্ট পাব। ক্ষুদিরামের এই কথা শুনে প্রসন্ন হয়ে স্বয়ং বিষ্ণু বললেন : ‘ভয় নেই। তুমি আমাকে যা খাওয়াবে তাতেই আমি খুশি হব। আমি উপচার চাই না, ভক্তি চাই। আমি কখনও তোমার ত্রুটি ধরব না।’

এদিকে কামারপুকুরে একদিন যুগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে চন্দ্রামণি দেবী ধনী কামারনী ও প্রসন্নময়ীর সঙ্গে কথা বলছেন। হঠাৎ তাঁর দর্শন হল মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ থেকে একটি দিব্য জ্যোতি ?? বেরিয়ে এসে ঘুরতে ঘুরতে ?? ছেয়ে ফেলল চন্দ্রামণিকে। সেই জ্যোতি তাঁর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল প্রবল স্রোতে। টলে পড়ে যাচ্ছিলেন তিনি। কাছেই ধনী কামারনী ছিলেন, ধরে ফেললেন। ?? পরে ধনীর সেবা-শুশ্রূষায় জ্ঞান ফিরে এলে চন্দ্রামণি বললেন : ঐ জ্যোতি তাঁর জঠরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়েছে।

fill temple and rush towards me in waves... all of a sudden the light engulfed me

Stunned by wonder and fear, I fell down unconscious.

একমাস পরে বাড়ি ফিরলেন ক্ষুদিরাম। স্বপ্নের কথা স্বযত্নে রক্ষা করলেন মনে-মনে। বাড়ি ফিরে চন্দ্রাদেবীর স্বভাবের অদ্ভুত এক পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন তিনি। দেখলেন মানবী চন্দ্রামণি এখন যেন সত্য-সত্যই দেবী হয়ে উঠেছেন। এতকাল তিনি সবসময় গ্রামের সমস্ত ছোট ছেলেমেয়েদের নিজের ছেলেমেয়েদের মতোই ভালবাসতেন। এখন সেই অপত্যস্নেহ কুলদেবতা রঘুবীরের ওপর গিয়ে পড়েছে। তিনি নিজের পুত্রগণের অন্যতমরূপে তাঁকে দর্শন করছেন। শীতলাদেবী এবং রামেশ্বর বাণলিঙ্গ শিবটিও তাঁর হৃদয়ে ঠিক ঐরকম স্থান দখল করে নিয়েছেন। আগে ঐসকল দেবতাদের পুজো করার সময় একটা শ্রদ্ধা-মেশানো ভয় থাকত। এখন ঐ স্থলে সর্বজনীন প্রেম এসে তাঁর হৃদয় অধিকার করে সংসারের চাওয়া-পাওয়ার কোলাহল থেকে তাঁকে যেন ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছে। এখন তাঁদের কাছে কিছু চাইবার নেই, আছে মন-প্রাণভরা স্নেহ-ভালবাসা এবং তাঁদের সুখী করার অদম্য ইচ্ছা।

নিজেদের সংসারের চিন্তা অপেক্ষাও চন্দ্রামণিকে অভাবী প্রতিবেশীদের সংসারের চিন্তাই বেশি করে ভাবায়। নিজের সংসারের কাজ করতে করতে দশবার ছুটে যান এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের যার-যা দরকার তা জেনে নিয়ে নিজের সংসার থেকে নিয়ে অন্যদের দিয়ে আসেন। সংসারের সবাইকে খাইয়ে নিজে শেষবেলায় খেতে বসবার আগে আবারও বাড়ি বাড়ি গিয়ে সব্বাইয়ের খোঁজ নিয়ে আসেন, সকলের খাওয়া হয়েছে কি না! যদি কোনওদিন দেখেন যে, কোনও কারণে কারও খাবার জোটেনি, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বাড়িতে ডেকে এনে অত্যন্ত আনন্দিত মনে নিজের ভাত-তরকারি যত্নের সঙ্গে খাওয়ান এবং নিজে যৎসামান্য কিছু খেয়ে কাটিয়ে দেন। ক্ষুদিরাম বুঝলেন, নিঃসঙ্কোচ দেবভক্তি ও তাঁদের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করার ফলেই অত্যন্ত কোমলভাব-প্রবণ চন্দ্রামণি এখন এত উদারস্বভাবা হয়েছেন এবং সবসময় আনন্দে ভরপুর হয়ে রয়েছেন।

এক দিনের ঘটনা। ক্ষুদিরাম তখনও গয়াধামে। চন্দ্রামণি দেখছেন রাতে তাঁর বিছানায় তাঁরই পাশে এক জ্যোতির্ময় দেবতা শুয়ে আছেন। ধড়মড় করে উঠে বসলেন চন্দ্রামণি। প্রদীপ জ্বাললেন। কই কেউ কোথাও নেই তো! এত স্পষ্ট যে স্বপ্ন বলে বিশ্বাস হয় না।

শিবমন্দিরে জ্যোতি-দর্শনের পর চন্দ্রামণির দর্শন ও অনুভব ক্রমশই আরও বেশি-বেশি হতে লাগল।

গয়া থেকে গৃহে প্রত্যাগমন করে সব শুনলেন ক্ষুদিরাম। চন্দ্রামণিদেবী স্বামীকে বললেন : ‘আমার পেটে যেন কেউ এসেছে, এরকম অনুভব হচ্ছে। এই কথা ধনী এবং প্রসন্নকে বলেছিলাম। তারা শুনে আমাকে নির্বোধ, পাগল ইত্যাদি কত কি বলে তিরস্কার করল। বলল, আমার বায়ুরোগ হয়েছে। আজ দেখি কি হাঁসে চড়ে এক ঠাকুর এসে হাজির। দেখে ভয় হল। কিন্তু রোদে তার মুখখানি লাল রক্তের মতো হয়ে গেছে। দেখে মন কেমন করতে লাগল। তাকে বললাম,

ওরে বাপ হাঁসে-চড়া ঠাকুর! রোদে তোর মুখখানি যে একদম শুকিয়ে গেছে, ঘরে আমানি-পান্তা আছে, দুটি খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যা বাপ! আমার কথা শুনে ঐ দেবতা হেসে হাওয়ায় যেন মিলিয়ে গেল! এখন পুজো বা ধ্যান না করেই আরও অনেক দেবতা দেখতে পাই যাদের ছবি পর্যন্ত আগে কোথাও দেখিনি। আবার কোনও কোনও দেবতা দেখি মানুষের মতো রূপ ধারণ করে হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। ঐরকম দর্শন কি আমার দেবতার কৃপায় হয়েছে অথবা বায়ুরোগ হয়েছে?' সব শুনে ক্ষুদিরাম গয়ায় দেখা তাঁর স্বপের কথা বুঝিয়ে বললেন যে, 'অশেষ সৌভাগ্যের ফলে তুমি এবার পুরুষোত্তম গদাধরকে গর্ভে ধারণ করেছ এবং তাঁর পুণ্য সংস্পর্শেই ঐসব দিব্যদর্শন হচ্ছে। তুমি এখন থেকে এসব কথা আমাকে ছাড়া আর কাউকে কিছু বোলো না।'

পুরুষশ্রেষ্ঠ গদাধরকে গর্ভে ধারণ করে চন্দ্রামণির রূপ যেন আর বাঁধ মানছে না। বেশি বয়সে সন্তান-সম্ভবা হলেও তাঁর রূপ দেখে সবাই বিস্মিত। কেউ বলছে, 'ওর শরীরে ব্রহ্মদত্যি ঢুকেছে—বাঁচলে হয় এবার!'

'আইর লাবণ্যচ্ছটা অতি অপরূপ।
স্বরূপ ঘুচিয়া হইল সুরূপ স্বরূপ।।
… … …
যেরূপ রূপের ছটা গর্ভিনীর গায়।
বোধ হয় ব্রহ্মদৈত্য পেয়েছে উহায়।।' (পৃঃ ৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মাতা দেবকীর গর্ভে ছিলেন, দেবকীর অঙ্গচ্ছটায় তখন সমস্ত কারাগার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় একদিন কংস দেবকীকে দেখে মনে মনে ভাবতে লাগল, এইবার আমার প্রাণহন্তা শ্রীহরি এর গর্ভে এসেছেন। কারণ এর আগে তো কখনও দেবকীর এই রকম অঙ্গ-কান্তি দেখিনি!

নানারকম দিব্য দর্শন হচ্ছে চন্দ্রামণির। কখনও ত্রাস, কখনও উল্লাস, কখনও বা ঔদাসীন্য। কখনও বলেন : তাঁর এ গর্ভ পতিস্পর্শে নয়; কখনও বলেন : তাঁর দেহ-মধ্যে পুরুষোত্তম এসেছেন; আবার কখনও বা নিতান্ত অসহায়ের মতো বলেন : তাঁকে বোধ হয় গোসাঁইয়ে পেয়েছে! গোসাঁইয়ে পাওয়া অর্থাৎ ভূতে পাওয়া। কামারপুকুরে সুখলাল গোস্বামীর মৃত্যুর পর গ্রামের মধ্যে নানারকম দৈব উৎপাত দেখা দিয়েছিল। লোকের বিশ্বাস হয়েছিল সুখলাল গোস্বামী মৃত্যুর পরে ভূত হয়ে তাঁদের বাড়ির সামনের বকুল গাছে বাস করছেন। আর তাই কামারপুকুরে কাউকে 'ভাবে' পেলে বলত গোসাঁইয়ে পেয়েছে। কিন্তু ক্ষুদিরামের দৃঢ় বিশ্বাস স্বয়ং নারায়ণ পুত্ররূপে তাঁর গৃহে আবির্ভূত হচ্ছেন।

।। জন্মকথা ।।

Janmakatha / Narration of Birth

মন যাঁকে মনন করতে পারে না, ইন্দ্রিয়গুলি যাঁকে অনুভব করতে পারে না—যিনি বাক্য ও মনের অতীত, অনির্বচনীয় হয়েও ভক্তের কাছে অশেষ করুণায় প্রকাশিত, পৃথিবীতে তাঁর পুণ্য আবির্ভাব সম্পর্কে যেসব তথ্যাদি পাওয়া যায় তা হল এরকম :

একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে দোর-গোড়ায় আঁচলটি বিছিয়ে শুয়ে আছেন চন্দ্রামণি। হঠাৎ শুনতে পেলেন কোথায় যেন রুনুঝুনু নূপুরের আওয়াজ। কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলেন। নূপুর-ধ্বনি তো তাঁর বন্ধ ঘরের মধ্যেই। ঘর শূন্য দেখে বন্ধ করেছেন দরজা। তাহলে কেউ কি তাঁর অগোচরে ঘরে ঢুকে পড়ল নাকি! তাই বা হয় কী করে! ঢুকে পড়ল তো নূপুর পেল কোথায়! তাড়াতাড়ি বন্ধ দরজা খুলে ফেললেন চন্দ্রামণি। কই, কেউ তো কোথাও নেই। যেমনই

?? Nupur dhvani / sound of anklets

শূন্য ছিল তেমনই শূন্যই আছে। কী আশ্চর্য! কিন্তু তিনি তো পরিষ্কার শুনেছেন। তবে কি চোখের মতো তাঁর কানও ভুল করতে শুরু করল? স্বামীকে এই নূপুরনিক্কণের কথা বললেন চন্দ্রামণি। চন্দ্রামণিকে গয়াধামের স্বপ্নের কথা আবারও বুঝিয়ে ক্ষুদিরাম বললেন : ‘এতে ভয় পাবার বা বিস্মিত হবার কিছু নেই, কেননা, গোকুলচন্দ্র আসছেন।’

‘হেনকালে শুনিলেন আই ঠাকুরানী।
Nupur dhvani / sound of anklets - Puthi Pg. 3
রুনুঝুনু নূপুরের সুমধুর ধ্বনি।।

… … …

আশ্চর্য গণিয়া আই ভাবে মনে মন।
নূপুরের বাদ্য ঘরে হয় কি কারণ।।’ (পৃঃ ৩)

কোথাও কিছু নেই, কোনও গন্ধদ্রব্য নেই, ধূপধুনোও জ্বালানো হয়নি কোথাও, তবুও কোথা থেকে যেন অচেনা ও অনাঘ্রাত খুব সুন্দর একটা গন্ধ আসছে। যখন দেবতার আবির্ভাব হয় বা যখন দেবতারা সকলের অলক্ষ্যে আমাদের খুব কাছাকাছি এসে পড়েন, তখন তাঁদের অতি পবিত্র শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়া একটি সুন্দর অপার্থিব গন্ধে সমস্ত জায়গাটি ম–ম করতে থাকে। চন্দ্রামণির একদিন মনে হল চন্দনের সুগন্ধ পাচ্ছেন চারিদিকে। আবার একদিন মনে হল পদ্মফুলের হালকা মিষ্টি গন্ধ যেন চারিদিক ভরিয়ে তুলেছে।

Sandal fragrance in the air / shandaner vas - Puthi Pg. 3
‘কোনও দিন পাইতেন চন্দনের বাস।
চন্দনের কাঠে যেন নির্মিত আবাস।।
কোনও দিন দিব্য গন্ধ পাইতেন ঘরে।
যেন কত পদ্মবন ঘেরা চারি ধারে।।’ (পৃঃ ৩)

ঘরের মধ্যে কখনও কখনও যেন বিদ্যুতের রঙবেরঙের তীব্র আলোকের দীপ্তি দেখছেন।

Colourful electrical display inside the house - Puthi Pg. 3
‘কত কি দেখেন আই কব আমি কটা।
ঘরের ভিতরে কোটি বিজলীর ছটা।।’ (পৃঃ ৩)

স্বপ্ন দেখছেন বুকের ওপর উঠে এক শিশু যেন তার কচি কচি তুল–তুলে হাত দুটি দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে, আর পিছলে পড়ে যাচ্ছে গড়িয়ে। শিশুটিকে দু–হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখতে পারছেন না চন্দ্রামণি।

Beautiful infant climbing onto her - Puthi Pg. 3
‘আর দিন নিদ্রাযোগে দেখেন স্বপন।
কি সুন্দর শিশু কোলে করে আরোহণ।।

… … …

অস্পষ্ট কতই কথা ধীরে ধীরে বলি।
অবশেষে বুক হতে পড়িল পিছলি।।’ (পৃঃ ৩)

এভাবে দিন যায়। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে এলো শরৎ। ধানের মঞ্জরিগুলো ভরে উঠল ফুলে। শেষে পরিপুষ্ট হয়ে বাতাসে নাচতে লাগল লক্ষ–কোটি মঞ্জরি। চাষীর ধান কাটার সময় এল। হেমন্তের পাতলা কুয়াশা–ঢাকা ম্লান সন্ধ্যায় পড়ল পৌষের ছায়া। শরৎ–হেমন্ত–শীত শেষ হয়ে ঋতুরাজ বসন্ত এসে উপস্থিত। শীত ও গ্রীষ্মের যুগলবন্দিতে মধুময় ফাল্গুন সবাইয়ের মনে একটা বিশেষ উৎসাহ, আনন্দ ও ঐশ্বরিক প্রেমের অনুভূতি এনে হাজির করল।

গৃহদেবতা রঘুবীরের ভোগ রাঁধতে রাঁধতে আসন্নপ্রসবা চন্দ্রামণি প্রাণে প্রাণে আজ একটা দিব্য উল্লাস অনুভব করছেন। কিন্তু শরীরটা বড্ড অবসন্ন মনে হচ্ছে। হঠাৎ তাঁর মনে হল, শরীরের যা অবস্থা তাতে কখন কি হয়! যদি এখনই প্রসবকাল এসে উপস্থিত হয় তাহলে বাড়িতে দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন কেউ নেই যে, আজকের ঠাকুরসেবার কাজটি চালিয়ে নেবে। তাহলে এখন উপায়? শঙ্কিতা হয়ে তিনি ঐকথা স্বামীকে বললেন। ক্ষুদিরাম তখন তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন : ‘ভয় নাই। তোমার গর্ভে যিনি শুভাগমন করেছেন, তিনি রঘুবীরের পুজো–সেবায়

ব্যাঘাত ঘটিয়ে কখনোই সংসারে প্রবেশ করবেন না—এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কাজেই নিশ্চিন্ত হও।’ ?? Lila prasanga

‘ঠাকুরের ভোগ রাগ হয়ে গেলে সব।
তখন হইবে তুমি দিনান্তে প্রসব।।
যথা কথা দ্বিজ-আজ্ঞা দিবা অবসান।
সন্ধ্যাকালে দ্বিতীয়ার চাঁদ দীপ্তিমান।।’ (পৃঃ ৪)

‘আজকের মতো ঠাকুরসেবা তুমি নিশ্চয়ই চালিয়ে নিতে পারবে। কাল থেকে আমি এজন্য আলাদা ব্যবস্থা করে রেখেছি এবং ধনীকেও আজ রাত থেকেই তোমার কাছে থাকার জন্য বলে রেখেছি।’ চন্দ্রামণি স্বামীর ঐকথায় শরীরে নতুন শক্তি পেয়ে বাড়ির কাজে মন দিলেন। ঘটনাও ঐরকমই হল। রঘুবীরের দুপুরের ভোগ এবং সন্ধ্যাকালীন শীতলাদি নির্বিঘ্নেই শেষ হল। পূর্বব্যবস্থা অনুসারে ধনী এসে চন্দ্রামণির সঙ্গে একই ঘরে শুয়ে থাকলেন। বাড়িতে রঘুবীরের ঠাকুরঘর ছাড়া বসবাসের জন্য দুখানি চালাঘর ও একখানি রান্নাঘর। অন্য আর একটি ছোট চালাঘরে ধান ভানবার জন্য একটি ঢেঁকি এবং ধান সেদ্ধ করবার জন্য একটা উনুন ছিল। এই ঘরটিই চন্দ্রামণির সূতিকা-গৃহ হিসাবে ঠিক হয়েছে। রাত শেষ হতে তখনও আধদণ্ড বাকি। চন্দ্রামণি দেবী এক অনিন্দ্যসুন্দর পুত্রসন্তানের জননী হলেন। যা অনুমান করা গিয়েছিল তা-ই অর্থাৎ, নরবেশে নারায়ণই তাঁর পুত্ররূপে এসেছেন। প্রতিশ্রুত প্রতিমূর্তি।

ধনী সাহায্য করতে গেল প্রসূতিকে। কিন্তু এ কী সর্বনাশ, ছেলে কোথায়? কোথায় সেই নবজাত শিশু? চকিত হরিণীর মতো ছটফট করে উঠল ধনী। কাঁপা কাঁপা হাতে প্রদীপের সলতে উসকে দিল। কিন্তু শিশু কই?

‘মহানন্দে আসি ধনী ইতি উতি চায়।
সূতিকা-আগারে শিশু দেখিতে না পায়।।’ (পৃঃ ৪)

মেঘাবৃত আকাশ ও বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত (পৃঃ ৫০-৫১)

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কামারপুকুরের আকাশ (পৃঃ ২২-২৩)

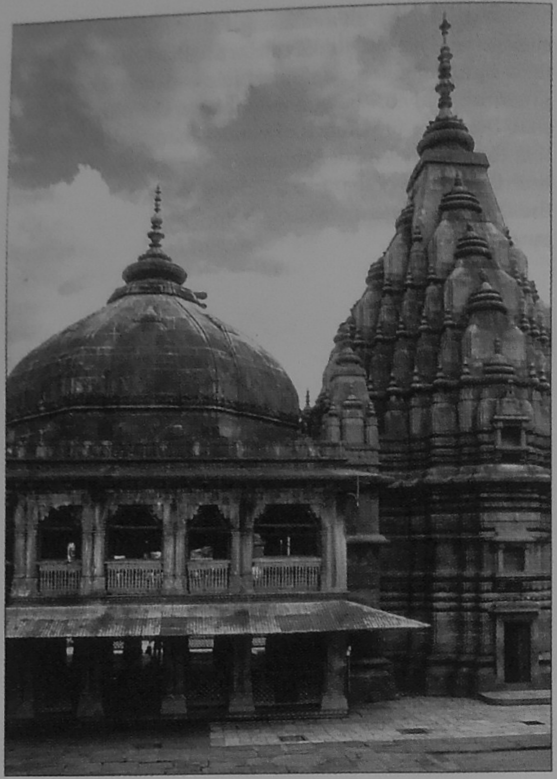

গয়াধামে বিষ্ণুমন্দির

এখানে ক্ষুদিরাম স্বপ্নে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর
দর্শনলাভ করে গদাধরকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন (পৃঃ ২৪-২৫)

গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম (পৃঃ ২৪-২৫)

দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হয়ে গেল নাকি? খুঁজতে খুঁজতে ধনী দেখতে পেল সদ্যোজাত শিশুপুত্রটি পিছল মাটিতে হড়কে হড়কে ধান সিদ্ধ করার উনুনের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। উনুনে আগুন ছিল না কিন্তু ছাই ছিল গাদি-করা। ভাস্বর ভস্মভূষণ। ধনী তখন তাকে কোলে নিয়ে প্রদীপের আলোয় দেখল—অদ্ভুত প্রিয়দর্শন শিশু যেন ছয় মাসের ছেলের মতো বড়। ধনী নাড়ে-চাড়ে আর বারবার দেখে। খালি গা। অথচ গায়ের ঔজ্জ্বল্য দেখে মনে হয় যেন কত মণি-রত্ন পরে আছে। দ্বিতীয়া তিথি। মনে হয় যেন অদ্বিতীয় চাঁদ।

‘সুদীর্ঘ আকার শিশু পরম সুন্দর।
শোভা পায় গায় বর্ণ জিনি শশধর।।’ (পৃঃ ৪)

Bengali era 1242, 6th Phalgun, Shuklapaksha; English 1836 CE, 18th February, Wednesday

১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন, শুক্লপক্ষ, ইংরেজি ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি, বুধবার। ব্রাহ্মমুহূর্ত। প্রসন্নময়ী প্রমুখ চন্দ্রামণির দু-চারজন সমবয়স্কা সঙ্গিনী খবর পেয়ে এসে হাজির। পূতগম্ভীর ব্রাহ্মমুহূর্তে তপস্বী দরিদ্র ক্ষুদিরামের কুটির মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে শ্রীভগবানের শুভ আবির্ভাব ঘোষণা করল। এই সময়েই গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে বেজে উঠল ভোরের মাঙ্গলিক শঙ্খ। মনে হয় যেন গ্রামবাসীরা অজান্তে শঙ্খধ্বনির মধ্যে দিয়ে শ্রীভগবানকে ভক্তিনম্র স্বাগত জানাচ্ছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার পুনরাবৃত্তি হয়েছে ঠাকুরের বাল্যলীলায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় ঠিক কি হয়েছিল যদি দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে ভগবান নয়ন-ভোলানো মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন। ভক্তের ধ্যানগম্য সেই অপরূপ রূপ বসুদেব অপলক-নেত্রে দেখতে লাগলেন। জগতের সমস্ত মানুষও যাতে যুগ যুগ ধরে সেই অতিসুন্দর রূপের ধ্যান করতে পারে, সেইজন্য শুকদেব সেই রূপের কিছুটা বর্ণনা করেছেন। সেই সব কথা ভাগবতের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই সেগুলির মধ্যে বিস্তারিতভাবে না গিয়ে শুধু বলা যায়, শিশুর অঙ্গ-জ্যোতিতে তখন সমস্ত সূতিকাগৃহ তথা কারাগার আলোকিত

হয়েছে দেখে বসুদেব নিশ্চিতরূপে অনুভব করলেন যে, যথার্থই শ্রীভগবান আবির্ভূত হয়েছেন। বসুদেব কারাগৃহে তাঁর পুত্রকে দর্শন করলেন মহা-ঐশ্বর্যমণ্ডিত চতুর্ভুজরূপে। তিনি ভগবানের ঐশ্বর্য দর্শন করে এবং বাৎসল্যপ্রেমে আপ্লুত হয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। বসুদেব ভাবছেন, ‘আমি বুঝেছি, জেনেছি, যে আপনি স্বয়ং ভগবান, সর্বশক্তিমান। কংস আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু কি দুর্দৈব! পিতৃস্নেহে অন্ধ হয়ে, আপনার স্বরূপের কথা ভুলে গিয়ে, আপনাকে কংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।’ এরকম ভেবে তিনি অপলক নয়নে শিশুপুত্ররূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে লাগলেন এবং বারবার শঙ্কিত হতে লাগলেন—এই বুঝি কংস এসে পড়ল।

Sri Krishna showed his four armed figure to his parents after birth

রামায়ণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-পুরুষদের পিতামাতাগণ, সন্তান জন্মগ্রহণ করবার আগে ও পরে নানারকম দিব্যদর্শন লাভ করে যদিও উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁদের সন্তান স্বয়ং ভগবান এবং তাঁকে দেবতারা সবসময় রক্ষা করছেন, তবুও অপত্যস্নেহের প্রভাবে ঐকথা ভুলে গিয়ে তাঁদের পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সবসময় চিন্তিত থাকেন। ক্ষুদিরাম এবং চন্দ্রামণিও এর ব্যতিক্রম নন। প্রিয়দর্শন শিশুর শ্রীমুখ দর্শন করে গয়াধামের দেবস্বপ্ন, শিবমন্দিরের দিব্যদর্শন ও নানা দৈববাণীর কথা এখন প্রায় ভুলে গিয়ে শিশুরূপী ভগবানকে ঠিক ঠিক ভাবে লালনপালনের জন্য চিন্তিত হয়ে নানারকম উপায় বের করতে লাগলেন। উপার্জনক্ষম ভাগনে রামচাঁদের কাছে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণের খবর পাঠালেন। মাতুলের অভাবী সংসারে দুধের অসুবিধার কথা চিন্তা করে রামচাঁদ একটি দুধেল গাই-গরু পাঠিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা দূর করলেন। দেখা গেল এই ভাবে নবজাত শিশুর জন্য যখনই যে জিনিসের দরকার তা বিভিন্ন দিক থেকে অভাবনীয়ভাবে এসে হাজির হচ্ছে। তবুও কিন্তু ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রামণির চিন্তা দূর হচ্ছে না।

Milch cow send by nephew [son of sister] Ramchand

এদিকে নবজাত শিশুর চিত্তাকর্ষণশক্তি কেবলমাত্র পিতামাতার ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করেই থেমে থাকল না। তা দিন-দিন বর্ধিত হয়ে পরিবারের সকলের ওপর এবং বিশেষ করে পাড়ার মায়েদের ওপরও নিজের আধিপত্য ভালভাবেই বিস্তার করল। পল্লীর মেয়েরাও এখন রোজই চন্দ্রামণির কাছে আসতে লাগল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, ‘তোমার ছেলেটিকে এখন রোজই দেখতে ইচ্ছে করে—তা কি করি বল!’ এই কারণে আশপাশের গ্রাম থেকে পল্লীরমণীরাও ক্ষুদিরামের বাড়িতে এখন খুব ঘনঘন আসতে লাগলেন। এইভাবেই নবাগত শিশু সকলের আদর-যত্নে দিন-দিন বড় হতে লাগল। এই সময় থেকেই ক্রমশই ক্ষুদিরামের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। তাঁর ভূসম্পত্তি বলতে মাত্র লক্ষ্মীজলা নামে সাতপোয়া জমি। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটিরটি দেখলে মনে হত যেন কোনও মহাতপা ঋষির আশ্রম। কোনও সাধু বা অতিথি তাঁর কুটিরে এলে তিনি তাঁকে শাক-ভাত না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়তেন না। এঁদের খাবার যে কী করে তিনি সংগ্রহ করতেন তা কেউই জানতেন না। তবে যাঁর গৃহে স্বয়ং ভগবান, যাঁর আলয়ে মা-লক্ষ্মী বাঁধা আর কুবের যাঁর ভাণ্ডারী তাঁর অভাব কিসের?

।। অন্নপ্রাশন ।।

Annaprashan - First solid food Ceremony

ছেলে কোলে নিয়ে একদিন রোদ পোয়াচ্ছেন চন্দ্রামণি। হঠাৎ মনে হল তাঁর কোল-জুড়ে যেন ভারি পাথর পড়ে আছে। ভার যেন আর বইতে পারছেন না। বিশ্বম্ভরের ভর হয়েছে ছেলের ওপর। অসহ্য! কোল থেকে ছেলে নামিয়ে বিছানা-সহ কুলোর ওপর শুইয়ে দিলেন চন্দ্রামণি। শিশুর ভারে কুলো চড়চড় করে উঠল। কুলো ভেঙে যাবে

Increase of weight of infant Gadadhar felt by mother Chandramani Pg.5

নাকি? ব্যাকুল হাতে চন্দ্রামণি ছেলেকে আবার কোলে তুলতে গেলেন। ছেলে নিশ্চল—পাষাণ। মা চন্দ্রামণির দু-হাতে এমন শক্তি নেই যে শিশুকে টেনে তোলেন। যিনি গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন তিনিই যে শুয়ে আছেন কুলোর ওপর তা কে জানে! চন্দ্রামণি কাঁদতে লাগলেন।

Pg.5

‘বিশ্বম্ভর আবেশ হইল শিশু-গায়।
কোলে ছেলে বড় ভারী আই টের পায়।।
অসহ্য দেখিয়া থোন কুলার উপরে।
সশয্যা সে কুলাখান চড়চড় করে।।’ (পৃঃ ৫)

যে যেখানে ছিল ছুটে এল। জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে? ‘ছেলেকে কোলে তুলতে পারছি না—’ ‘কেন? কি হয়েছে?’ ‘নিশ্চয়ই ওই নিমগাছের ব্রহ্মদত্যি ভর করেছে বাছার ওপর—’ উপস্থিত সবাই বলে উঠল—ভূতের ওঝাকে আনাও। কাজেই ভূতের ওঝাকে ডাকতে পাঠানো হল। ভূতুড়ে এসে কাঁদুনি গেয়ে কুলোর কাছে বসে মন্ত্র পড়তে লাগল। নিমেষে শিশু হালকা হয়ে গেল। যেমন আগে ছিল ঠিক তেমনই হয়ে গেল। চন্দ্রামণি তাকে কোলে তুলে নিলেন।

Comparison with increase of weight of infant Sri Krishna - Trinavarta episode

আমরা ভাগবতেও দেখি মা চন্দ্রামণির মতো মা যশোদাও একদিন শিশু কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে আদর করছিলেন। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন শিশু যেন পাহাড়ের মতো গুরুভার হয়ে গেছে। সেই ভার মা যশোদা আর কিছুতেই বইতে পারছেন না। মা যশোদা বিস্মিত হয়ে ভাবছেন এই ছোট্ট ছেলে এত ভারি যে আর বইতে পারছি না! মা যশোদা ভাবলেন কোন গ্রহের ফেরে এইরকম হয়েছে। তাই তিনি শিশুকে মাটিতে শুইয়ে রেখে ঘরের কাজ যা বাকি আছে, সেইগুলো করতে গেলেন।

মা যে ছেলের গুরুভার বইতে না পেরে মাটিতে শুইয়ে দিলেন, তার কারণ ভগবান জানতেন যে এখন তৃণাবর্ত আসবে। মায়ের যাতে

অনিষ্ট না হয় সেইজন্য মাকে ঐভাবে সরিয়ে দিলেন। অসুর যখন শিশু কৃষ্ণকে প্রলয়ঙ্কর ঝড় হয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই তিনি গুরুভার ছিলেন না। শূন্যে নীত হলে শিশু কৃষ্ণ ভারী হলেন আর তৃণাবর্তের গলা জড়িয়ে ধরলেন। ভার বইতে না পেরে তৃণাবর্ত সেই শিশুকে ফেলে দিতে চাইল। কিন্তু ফেলা গেল না, তখন শিশুর ভারে পাহাড়ের উপর পড়ে তৃণাবর্ত নিজে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। শিশুটি তখনও তার বুকের উপর বসে খেলা করছে। মৃত্যু-কবলিত হয়েও ছোট্ট শ্রীকৃষ্ণ যে সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছে এজন্য নন্দ এবং গোপ-গোপীরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

ঐশ্বর্য-জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তেরা শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য দেখেই মুগ্ধ। সখ্য-বাৎসল্য-মধুরভাবের ভক্তরা ভগবানের মাধুর্যরসেই বিভোর হয়ে থাকেন।

At the age of 2 or 3 months infant Gadadhar inside the fire place for cooking pg. 6

ছেলের বয়স যখন দু-তিন মাস তখন চন্দ্রামণি একদিন ছেলেকে বিছানায় রেখে বাড়ির কাজে বাইরে গেছেন। শিশুর শয্যার কাছেই একটি উনুন ছিল। সেখানে আগুন ছিল না। কিন্তু ছাই ছিল। বিছানা থেকে কখন সে সরে গিয়ে শুয়ে আছে অর্ধেক উনুনের মধ্যে, অর্ধেক বাইরে। চাঁদের মতো উজ্জ্বল শিশু এখন ধুলোয় লুটোচ্ছে। চন্দ্রামণি তাঁর প্রাণের পুতলিকে কোলে তুলে চেঁচিয়ে ওঠেন : বিছানায় ছোট শিশুকে শুইয়ে রেখে গেছি। কে নিয়ে তাকে উনুনে ফেলল আর এত বড়ই বা সে হল কী করে! এই কথা শুনে ধনী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, ‘মা হয়ে কি যে অমঙ্গুলে কথা বলিস তার ঠিক নেই। দে ছেলেকে দে। যদি কিছু হয়ে থাকে মন্ত্র দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দেব। দাঁড়া, গা ঝেড়ে দিচ্ছি—।’ ধনী কামারনী ছেলেকে কোলে নিয়ে মন্ত্র পড়তে থাকে। শিশু আবার আগের মতো হয়ে যায়, খিলখিল করে হেসে সবাইকে আকৃষ্ট করে ভুলিয়ে দেয়।

Pg. 6

> 'গরজিয়া কামারিনী বলিল বচন।
> মা হইয়া অমঙ্গল কহ কি কারণ।।
> দাও দাও ছেলে মোরে গা ঝাড়িয়া দিব।
> যদি কিছু হয়ে থাকে মন্তরে মারিব।।' (পৃঃ ৬)

Five month old infant Gadadhar turned into a big person inside mosquito curtain Pg. 6

সংসারের কাজে গৃহান্তরে গেছেন চন্দ্রামণি। শিশুকে মশার কামড় থেকে রক্ষা করার জন্য মশারি টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন তো আর ছোট মশারি পাওয়া যেত না। যেমনই বড়-বড় খাট সেরকম বড় বড় মশারি। পাঁচ মাসের শিশু ঘুমাচ্ছে বিছানায়। ঘরে ফিরে এসে চন্দ্রামণি দেখেন ছেলে নাই। তার বদলে মশারি-প্রমাণ কে-একজন দীর্ঘকায় মানুষ শুয়ে আছে। স্বামীকে আহ্বান করে চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রামণি : 'ওগো দেখে যাও, বিছানায় ছেলে নেই—।'

Pg.6

> 'ফিরে আসি দেখে আই নিজ ছেলে নাই।
> মশারিপ্রমাণ আর জন তাঁর ঠাঁই।।
> উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আই পতিরে সম্ভাষি।
> বিছানায় ছেলে নাই, দেখ না গো আসি।।' (পৃঃ ৬)

ত্রস্ত পায়ে ছুটে এলেন ক্ষুদিরাম। 'দেখো এসে। বিছানায় বাছার বদলে কে একজন লোক মশারি জুড়ে শুয়ে আছে।' দুজনেই তাকালেন মশারির দিকে। দেখলেন তাঁদের শিশুই তো শান্তিতে শুয়ে আছে। হাত-পা নেড়ে খেলা করছে আপন-মনে। এ কী খেলা! এই যে দেখলাম মহাকায় মানুষ। আবার এই ছোট্ট ছেলে। সব শুনে গম্ভীর হলেন ক্ষুদিরাম। আর কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করলেন।

First solid food on 6th month of infant Gadadhar

ছ-মাসে পা দিল শিশু। ছেলের মুখে-ভাতের জোগাড় করতে হবে এবার। বেশি জাঁকজমক করবার মতো অবস্থা নেই ক্ষুদিরামের। মনে মনে ঠিক করলেন শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী কুলদেবতার বিশেষ পুজো দিয়ে কোনওরকমে রঘুবীরের প্রসাদী অন্ন পুত্রের মুখে দিয়েই নিয়মরক্ষা

করবেন। এই উপলক্ষে দু-একজন নিকট আত্মীয়কেই নেমন্তন্ন করবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু ঘটনা অন্যরকম হয়ে গেল। ক্ষুদিরামের পরম বন্ধু গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার গুপ্ত প্রেরণায় পল্লীর প্রবীণ ব্রাহ্মণগণ ক্ষুদিরামকে এসে ধরে বসলেন, পুত্রের অন্নপ্রাশনের দিনে তাঁদের খাওয়াতে হবে। তাঁদের এইরকম অনুরোধে নিজেকে বিশেষভাবে বিপন্ন বলে বোধ করতে লাগলেন ক্ষুদিরাম। কেননা পল্লীর সকলেই তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন। এখন সমস্যা হল কাকে বাদ দিয়ে কাকে আমন্ত্রণ করবেন! আবার তাঁদের সবাইকে বলবার মতো তাঁর সামর্থ্য কোথায়! তাই, যা করেন 'রঘুবীর'—এই বলে তিনি বন্ধু জমিদার ধর্মদাস লাহার সঙ্গে পরামর্শ করতে তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন। ধর্মদাসবাবু বললেন : 'ভয় কি? রঘুবীর উদ্ধার করে দেবেন।' বন্ধুর ইচ্ছা বুঝে তাঁরই ওপর এই অন্নপ্রাশনের সমস্ত ভার দিয়ে ক্ষুদিরাম নিশ্চিন্ত হলেন। ঈশ্বরই উপায়, আবার ঈশ্বরই উপেয়। যা তাঁর কৃপা, তা-ই তাঁর শক্তি। ধর্মদাসবাবুও অত্যন্ত আনন্দিত মনে, নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে দিলেন। পাড়ার লোককে তিনিই প্ররোচিত করেছিলেন ক্ষুদিরামের কাছ থেকে নেমন্তন্ন আদায় করার জন্যে। আবার তিনিই সব জোগাড়যন্ত্র করলেন। এই অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কেবলমাত্র যে পল্লীর ব্রাহ্মণগণই পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন তা নয়, গ্রামের সবাই এবং বৈষ্ণব ও দরিদ্র ভিক্ষুকগণও রঘুবীরের প্রসাদ ভোজন করে পরম তৃপ্তিলাভ করেছিলেন। প্রিয়দর্শন শিশুর মুখ দেখে সমস্ত লোকের অন্তর এক অভূতপূর্ব আনন্দে ভরে গিয়েছিল।

Dharmadas Laha friend of Gadadhar's father took the responsibility of infant Gadadhar's first solid food partaking ceremony

Pg.6

> 'সমভাবে সকলে উদর পুরি খায়।
> কুলের ঠাকুর রঘুবীরের কৃপায়।।' (পৃঃ ৬)

গয়াধাম থেকে ফিরে গদাধরকে পেয়েছেন। আদর করে গদাই বলে ডাকেন বাবা-মা। ডাকেন ধনী কামারনী। পৃথিবীর লোক জানল গদাধর এবং তাঁর গুরুর দেওয়া জোড়া নাম রামকৃষ্ণ—আধেক রাম, আধো

কৃষ্ণ—মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। দুই দেবতার মিলিত নামের এই মহিমা বেদ-বেদান্তেরও পার।

Pg. 7 'জোড়া নামে গড়া নাম নামের মহিমা।
বেদবিধি নাহি পারে করিবারে সীমা।।' (পৃঃ ৭)

।। শিবের আবেশ ।।

Lord Shiva's influence / Shiber abesh

কুলদেবতা রঘুবীরের কৃপায় ক্ষুদিরাম শিশু গদাইয়ের অন্নপ্রাশন সুন্দরভাবে যথোচিত ধুমধামের সঙ্গেই সম্পন্ন করেছিলেন।

Meaning and derivation of Avesh

আবেশ কথাটির (আ—বিশ্‌+অ) অর্থ হল সম্যকরূপে প্রবিষ্ট হওয়া। শিব ছোট্ট শিশুর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় শ্রীপ্রভুর (গদাধরের) নিজস্ব কোনও সত্তা থাকল না। তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে দেবাদিদেব মহেশ্বর শিবই হয়ে গেছেন।

মাত্র কয়েক মাসের ছোট্ট শিশু গদাধর মাকে কতরকম যে ঐশ্বরীয় লীলা দেখিয়েছিলেন তার ইয়ত্তা হয় না।

তাঁর বাল্যকথা বড়ই মধুর এবং আশ্চর্যজনক। তিনি চন্দ্রামণিকে মাঝে মাঝেই নানারকম ঐশ্বর্য দেখাতেন। কোলের শিশু গদাই মাকে

Shib netra darshan by Chandramani Pg.7

শিবনেত্র দেখাতেন। চোখ দুটি শিবের চোখের মতো ঢুলুঢুলু ও নিশ্চল হয়ে যেত। মনে হত যেন যোগীবর মহেশ্বর যোগাসনে মহাধ্যানে নিমগ্ন রয়েছেন। 'যুগীদের শিবমন্দির' থেকেই মা-চন্দ্রামণির কোলে এসেছিলেন শিশু গদাই।

Pg. 7 'বড়ই মধুর কথা বড়ই আশ্চর্য।
জননীরে দেখাতেন কতই ঐশ্বর্য।।
মাঝে মাঝে শিবনেত্র-সম হত আঁখি।
নিশ্চল সুস্থির প্রায় আই তাহা দেখি।।' (পৃঃ ৭)

যুগী শিবমন্দির (পৃঃ ২৬-২৭)

যুগী শিবমন্দিরের শিবলিঙ্গ (পৃঃ ২৪-২৫)

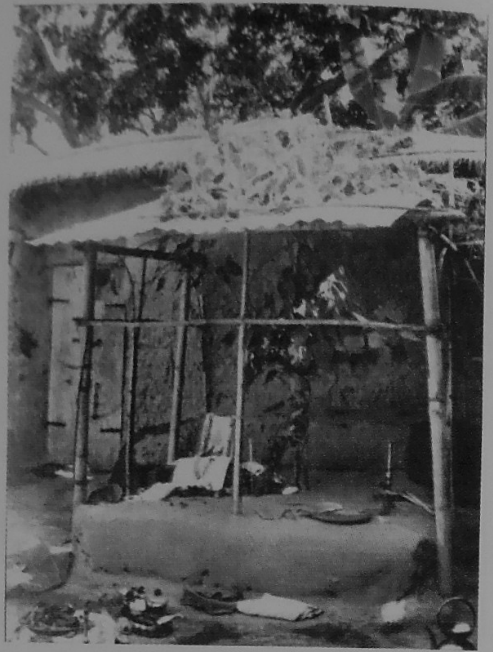

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢেঁকিশালের যে-স্থানটিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন (পৃঃ ৩২-৩৩)

কামারপুকুরে রঘুবীরের মন্দির-সংলগ্ন ঠাকুরের শয়নকক্ষ (পৃঃ ২৮-২৯)

শিশু গদাইয়ের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখলে মা চন্দ্রামণি ভাবতেন ছেলেকে বুঝি ব্রহ্মদৈত্যে ধরেছে। দেবতার কাছে মানসিক করতেন। আবার ভূতপতি শিবের নাম করে গদাইকে স্বাভাবিক দেখতেন। মা ভয় পেলে ছোট্ট গদাই মার মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে কচি কচি হাত দুটি দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতেন এবং মাথাটি মায়ের বুকের মধ্যে চেপে রেখে মাকে আশ্বস্ত করতেন।

Pg.7 'মানসিক' দেবতায় করেন জননী।
দু-নয়নে বারিধারা কতই না জানি।। (পৃঃ ৭)

তবুও কিন্তু মায়ের দুশ্চিন্তা দূর হত না। যে মা এতকাল কুলদেবতা রঘুবীরের কাছে নিজের জন্য কোনও কিছুই চাইতেন না, তিনিই এখন দিনের মধ্যে দশবার রঘুবীরের কাছে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে পুত্রের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করছেন, 'মানসিক' করছেন।

শিশু শ্রীকৃষ্ণের মুখেও মা-যশোদা বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন। এটিই হল ঐশ্বর্য ও মাধুর্যময় বাৎসল্য-লীলা। মা যশোদাও শঙ্কিতা হয়ে বালগোপাল অর্থাৎ বালক কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য দেবতার কাছে 'মানত' করতেন। একদিন মা যশোদা ভাবছেন—'আমি ও আমার'—এই তো মায়া। আমি গোপরাজ নন্দের স্ত্রী, কৃষ্ণ আমার পুত্র—এইসব অভিমানসূচক বিষয়ের চিন্তায় আমি নারায়ণকে ভুলে কষ্ট পাচ্ছি। আমার পুত্র কৃষ্ণের অমঙ্গল আশঙ্কায় সদা উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছি। ফলে আমার ইষ্টদেবতা নারায়ণের কথা প্রায় ভুলেই গেছি। তাইতো আমার এত কষ্ট। স্বরূপের জ্ঞান হলে তো আর এই কষ্ট থাকবে না। এইসব চিন্তা করে যশোদা প্রার্থনা করছেন : 'হে নারায়ণ! তুমি আমার এই মমতার বন্ধন ছিন্ন করে দাও। আমি যেন দেহ, গেহ, পতি ও পুত্রাদিতে মমতাশূন্য হয়ে তোমার পদাশ্রয় লাভ করতে পারি।'

যশোদা চাইলেন স্বরূপের জ্ঞান। এই স্বরূপের জ্ঞান হলে তাঁর সংসার-মমতা দূর হবে ঠিকই, কিন্তু ভগবানের বাৎসল্য-লীলারস আর

আস্বাদন করা যাবে না। তাই কৃষ্ণ, জননীর এইরকম বৈরাগ্য দেখে বৈষ্ণবীমায়া অর্থাৎ তাঁর বাৎসল্য-স্নেহরূপ মায়া যশোদার ওপর বিস্তার করলেন। ভগবানের বৈষ্ণবীশক্তি তাঁর বাৎসল্য-স্নেহরূপ মায়া বিস্তার করলে যশোদা তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রার্থনার কথা ভুলে গিয়ে আগের মতোই স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন।

কৃষ্ণ সমবয়সী বালকদের সাথে খেলা করে। একদিন খেলাতে কৃষ্ণ বারবার হেরে যাচ্ছে দেখে অন্যান্য বালকেরা খুব আনন্দ করতে থাকে। এতে কৃষ্ণ অত্যন্ত রেগে গিয়ে মাটি খেতে লাগল। তখন বালকেরা ছুটে গিয়ে মা যশোদাকে বিষয়টি জানালো। যশোদা তখনই হাতের সব কাজ ফেলে দুষ্টু বালকের কাছে এসে বললেন : তুই মাটি খেয়েছিস কেন? কৃষ্ণ সোজাসুজি মাটি খাওয়ার কথা অস্বীকার করলে মা যশোদা আলতো করে গালদুটি টিপে ধরে বলছেন, ‘ঠিক আছে, তুই হাঁ কর।’ যশোদা তখন ছোট্ট কৃষ্ণের মুখের মধ্যে তাকিয়ে ভয়ে বিস্ময়ে, কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলেন। মুখের মধ্যে দেখছেন সমস্ত বিশ্বচরাচর—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, ভূলোক, দ্যুলোক। অতি অদ্ভুত সব দৃশ্য দর্শন করে যশোদা শঙ্কিতা হয়ে ভাবলেন : এ আমি কী দেখছি? এ কি স্বপ্ন অথবা কোনও দেবমায়া অথবা আমারই বুদ্ধিভ্রম? গর্গাচার্য তো বলেছিলেন যে, কৃষ্ণ পূর্ব পূর্ব জন্মে সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। এ কি কৃষ্ণেরই কোনও সিদ্ধি অথবা ঐশ্বর্যের প্রকাশ? যশোদা এই ভাবে চিন্তা করে কোনও কিছু ঠিক করতে না পেরে পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় মা চন্দ্রামণির মতো সর্বশক্তিমান নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

Vishwarup darshan by Mother Yashoda

সবচেয়ে মজার জিনিস—জ্ঞানীরা জ্ঞানযোগে সিদ্ধ হয়ে যাঁকে—অবাঙ্‌মনসোগোচরম্—বাক্য-মনের অতীত বলে দূরে সরিয়ে রাখেন, মা যশোদা তাঁকেই বাঁ-হাতে ধরে ভর্ৎসনা করে বলছেন—কেন তুই মাটি খেয়েছিস? মা যশোদার বাৎসল্যভাব সর্বশাস্ত্রের ধারণার অতীত। ঠিক তেমনই আমাদের গদাধর-জননী মা চন্দ্রামণি। ভগবান সকলের নিয়ন্তা হলেও মা চন্দ্রামণির অধীন। তিনি জন্মরহিত হয়েও মা চন্দ্রামণির পুত্র। তিনি সর্বব্যাপী হয়েও মা চন্দ্রামণির কোলে আসীন। তিনি সর্বেশ্বর হয়েও মা যশোদা এবং বর্তমানে মা চন্দ্রামণির শাসনাধীন।

এই ভাবে দু-তিন বছর কেটে গেল। এখন ছোট্ট গদাই সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে খেলা করেন। গ্রামেই পিতৃবন্ধু ধর্মদাস লাহার বাড়িতে শিশু গদাধর প্রায়ই যাতায়াত করতেন। শিশু গদাইকে দেখামাত্রই এই ভক্ত-দম্পতি বাৎসল্যরসে আপ্লুত হয়ে যেতেন। ঠিক এমনই বাৎসল্য-রসে আপ্লুত হতেন ধনী-কামারনী এবং গ্রামস্থ পল্লী রমণীরা।

Dharmadas Laha - affluent businessman of Kamarpukur

ধর্মদাস বড় ব্যবসায়ী। বিষয়ী মানুষ। তাই হিসেব-নিকেশের সময় খাতা খতিয়ানেই একমনে ডুবে থাকতেন। কিন্তু তাঁর খাতা লেখার সময় কখনও কখনও গদাধরকে বাড়িতে আসতে দেখলে, তাঁর আর হিসেবে মন বসত না। কী জানি, তিনি গদাইয়ের মধ্যে কী দেখতেন! তবে বহুক্ষণ তন্ময় হয়ে তাঁকে দর্শন করতেন। শিশু গদাইকে দেখলেই তিনি বলতেন, ‘যাও বাপ, খাও গিয়া কি রেখেছে ঘরে।’ লাহাগৃহিণী ছোট্ট গদাইকে সন্তানবৎ ভালবাসতেন। যত্নে পালিত তাঁদের বাড়ির গাভীর দুধ থেকে তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাবার পরম আদরে গদাইকে খাওয়াতেন এবং ছোট্ট গদাই খেতে খেতে তাঁকে কত কী বলতেন! তাতেই তাঁর আনন্দ। গদাইয়ের বয়সী তাঁর নিজের ছেলে, গয়াবিষ্ণু—তার সঙ্গে ছোট্ট গদাইয়ের খুব ভাব। এদের মধ্যে গভীর প্রীতি দেখে অভিভাবকেরা পরস্পরের মধ্যে স্যাঙ্গাত পাতিয়ে দিয়েছিলেন। কী সৌভাগ্য সেই গয়াবিষ্ণুর! যিনি অখিলের নাথ, যিনি জগতের পিতা, তাঁর সঙ্গে তিনি মিত্রতা করেছিলেন। বালক গদাধর তাঁর সঙ্গে নানাপ্রকার খেলাধুলা করতেন। এঁদের খেলাধুলা দেখে মনে হত ঠিক যেন নন্দের অঙ্গনে সখাসঙ্গে কানাই খেলছেন। বৃন্দাবনে বহু গোপের মধ্যে যেমন ধন্য নন্দ, তেমনই ধন্য কামারপুকুরের ধর্মদাস লাহা।

Gayavishnu friend of Gadadhar

শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য ও সখ্যলীলার সঙ্গে গদাধরের বাৎসল্য ও সখ্যলীলার খুব মিল। এই লীলার উপলব্ধির জন্যই পুঁথিকার বলছেন—

P.7

‘শুন মন সুন্দর প্রভুর বাল্যকথা।
সুগুহ্য হইতে গুহ্য এ সব বারতা।।’ (পৃঃ ৭)

যশোদা স্বহস্তে কৃষ্ণের জন্য দধি-মন্থন করছেন। আবার মনে মনে কৃষ্ণের বাল্যলীলা চিন্তা করছেন এবং এতদিন ছোট্ট কৃষ্ণের যে লীলা তিনি দেখেছেন সেগুলিই গান করছেন। অর্থাৎ কায়-মন-বাক্য—সবই কৃষ্ণে নিবদ্ধ হওয়াতে যশোদা এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। কায়-মন-বাক্য ভগবানে এলেই এক দিব্য তন্ময়তারূপ আনন্দ লাভ করা যায়। যাঁদের এটি হয়, তাঁদের কাছে ভগবান কখনও নিদ্রিত থাকেন না। ভক্তের সমস্ত কাজ, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কথা যখন একমাত্র ভগবৎ বিষয়েই নিবদ্ধ থাকে—তখন ভগবান সেই ভক্তের হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠেন। মা যশোদার এবং বর্তমানে কামারপুকুরে মা চন্দ্রামণির সমস্ত মন-প্রাণ, ইন্দ্রিয় কৃষ্ণ বা গদাই অভিমুখী। কৃষ্ণ ঘুম থেকে উঠে নিজেই দধিমন্থন-রত জননীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং দধি-মন্থনের দণ্ডটি ছোট্ট ছোট্ট হাতদুটি দিয়ে চেপে ধরলেন। উদ্দেশ্য, তাঁকে কোলে নিতে হবে। পুত্রের আগ্রহ দেখে যশোদা ছেলেকে সাদরে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন। এতে কৃষ্ণের যেমন আনন্দ, বাৎসল্য-প্রেমময়ী মা যশোদারও তেমনই আনন্দ। একের আনন্দ অপরের আনন্দের পরিপূরক। গদাধর-জননী চন্দ্রামণি যেন মা যশোদা। শিশু গদাধর যেন বালগোপাল।

নন্দভবনের পাশে রাজপথ থেকে ‘ফল কিনবে গো’—এইরকম ডাক শুনে অচ্যুত, যিনি কখনও নিজের ঐশ্বর্য থেকে বিচ্যুত হন না, সেই সর্বফলপ্রদাতা কৃষ্ণ ফল পাবার জন্য তাড়াতাড়ি একমুঠো ধান নিয়ে ফলওয়ালির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

কৃষ্ণের খেলার সাথীরা তখন পর্যন্ত নন্দভবনে এসে পৌঁছায়নি এবং মা যশোদাও গৃহকর্মে অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণ উঠোনে রাখা ধান নিয়ে একা-একাই খেলা করছিলেন। সেই সময় ‘ফল কিনবে গো’—এই আওয়াজ শুনেই কৃষ্ণ ফল কেনার জন্য একমুঠো ধান নিয়ে রাস্তায় গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ফলওয়ালিকে বললেন—আমি তোমার ফল নেব।

কৃষ্ণকে দেখে এবং তাঁর সুমধুর কথা শুনে ফলওয়ালি এক অদ্ভুত আনন্দের আবেশে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল। কৃষ্ণের সামনে ফলের ঝুড়ি নামিয়ে ফলওয়ালি হেসে বলল—ফল তো নেবে; কিন্তু ফলের কি দাম দেবে? কৃষ্ণ হাতের মুঠো খুলে দেখালেন; হাতে করে ধান নিয়ে আসার সময় কৃষ্ণের ছোট ছোট আঙুলের ফাঁক দিয়ে প্রায় সব ধানই পড়ে গেছে; মাত্র দুটি-একটি ধানই হাতে লেগে রয়েছে। এই দেখে ফলওয়ালি বললে—একটা-দুটো ধান দিয়ে তো এই সব ফল কেনা যাবে না; সুতরাং ফলের বদলে তুমি আমায় কি দেবে বল? শিশু কৃষ্ণের সাথে কথা বলে ফলওয়ালি আনন্দে মেতে উঠল! কৃষ্ণ বললেন—আমাকে তো সবাই এমনিতেই সবকিছু দেয়; দামের জন্য তো কেউ কিছু বলে না। আমার মা, আমাদের প্রতিবেশীরা আমাকে কত ক্ষীর ননী মাখন খেতে দেয়; তারা তো এর জন্য কিছু চায় না; তবে তুমি দাম চাইছ কেন? কৃষ্ণের কথা শুনে ও তাঁকে দেখে ফলওয়ালির মনে এক অদ্ভুত ভাবান্তর হল; তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল; তার ভিতরের সুপ্ত বাৎসল্যভাব জেগে উঠল। ফলওয়ালি বলল—তুমি যেমন ক্ষীর ননী খাবার জন্য তোমার মাকে মা বলে ডাক, তাঁর কোলে ওঠ, সেইরকম যদি একবার আমাকেও মা বলে ডাক, একবার আমার কোলে ওঠ, তাহলে আমার সমস্ত ফলই তোমাকে দেব, চিরদিন তোমার মায়ের দাসী হয়ে থাকব। ফলওয়ালির ফলের উপর কৃষ্ণের অত্যন্ত লোভ হয়েছে; তাই ভাবলেন—ওকে একবার মা

Fruit seller and toddler Krishna

বলে ডেকে ওর কোলে উঠলে যদি ও এতগুলি ফল আমায় দেয়, তবে ওকে একবার মা বলতে এবং ওর কোলে উঠতে দোষ কি? ও তো আমাকে আমার মার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে না; তার উপর ও তো আমার মায়ের দাসী হতেই চাইছে; সুতরাং ওকে মা বলে ডেকে ওর কোলে উঠলে কোনও দোষ হবে না। এইভাবে চিন্তা করে কৃষ্ণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন যে, কেউ কোথাও নেই; এই সুযোগে তিনি ফলওয়ালিকে মা বলে ডেকে তার কোলে উঠে তাকে কৃতকৃতার্থ করলেন। এদিকে কৃষ্ণের মুখে মা ডাক শুনে, তাঁকে কোলে পেয়ে ফলওয়ালি আনন্দের আতিশয্যে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল।

ফলওয়ালির সেই উচ্ছ্বাস একটু প্রশমিত হলে কৃষ্ণ তার কোল থেকে নেমে দুটো হাত পেতে বললেন—এবার আমায় ফল দাও। ফলওয়ালি আনন্দে আত্মহারা হয়ে, তার ঝুড়ি উজাড় করে সমস্ত ফল কৃষ্ণের হাতে দিয়ে দিল।

ফল নিয়ে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন আর ফলওয়ালি একদৃষ্টিতে কৃষ্ণের চলার দিকে চেয়ে রইল। কৃষ্ণ তার চোখের আড়াল হতেই ফলওয়ালির সামনে থেকে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যেন লুপ্ত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়ে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠল কৃষ্ণের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি—তাঁর ফল চাওয়া, তাঁর মা বলে ডাকা এবং তাঁর কোলে ওঠা। এই সব চিন্তায় বিভোর হয়ে ফলওয়ালি যেন এক দিব্য বাৎসল্যভাবে দিশেহারা হয়ে চলতে লাগল; কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে—কিছুরই ঠিক নাই। হঠাৎ তার মনে হল, তার শূন্য ঝুড়িটা যেন খুব ভারী হয়ে উঠেছে। ঝুড়ি নামিয়ে দেখল যে, তার শূন্য ঝুড়িটা নানাবিধ মণিমাণিক্যে পূর্ণ হয়ে গেছে! ফলওয়ালি আশ্চর্য হয়ে ভাবল—এ আবার কি! আমি বনবাসিনী; আমার ঝুড়িতে এত ধনরত্ন কোথা থেকে এল? সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের উদয় হল; সে অনুভব করল যে স্বয়ং বালরূপী ভগবানই তার সাথে এইভাবে খেলা করেছেন। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল—হে হৃদয়সুন্দর! আমি গরিব, জ্ঞানহীন; ফল বিক্রি করে জীবন ধারণ করি; তাই মোহের বশে তোমার কাছেও ফলের দাম চেয়েছিলাম; তাই কি তুমি তুচ্ছ মণিরত্ন দিয়ে আমায় ফাঁকি দিতে চাইছ? কিন্তু তা তো আমি আর কিছুতেই হতে দেব না; তুমি যখন একবার আমায় মা বলে ডেকে আমার কোলে উঠেছ, তখন তো আর আমি তোমায় ছাড়তে পারব না—প্রাণ গেলেও না। তুমি যদি আমার কথা না শোন, তবে তোমার মায়ের কাছে গিয়ে তাঁর পা ধরে কাঁদব, যেন তিনি আমায় তাঁর দাসী করে রাখেন। তাহলে তোমাদের অঙ্গনের এক পাশে দাঁড়িয়ে তোমার মধুর বাল্যলীলা দেখে জীবন সার্থক করব। এইভাবে চিন্তা করতে করতে ফলওয়ালির হৃদয় তখন ভক্তি এবং বৈরাগ্যে পূর্ণ হয়ে উঠল। সে তখন রত্নপূর্ণ ঝুড়িটি ফেলে দিয়ে অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ হয়ে, বেহুঁশের মতো কোথায় চলে গেল—তার আর কোনও খবর পাওয়া গেল না।

।। অতিথির বেশধারণ ।।

Atithir besh dharan

দিনে-দিনে বড় হচ্ছে গদাই। চন্দ্রামণি তাকে মাঝে মাঝে গ্রামের ঐতিহ্য অনুযায়ী সুন্দর করে সাজিয়ে দিচ্ছেন। সকাল না হতেই সঙ্গীরা সব এসে হাজির। সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করবার জন্য ছোট্ট গদাই ছটফট করতে থাকে।

ভাগবতেও দেখা যায় গোপবালকেরা ভোর না হতেই দেউড়িতে এসে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। কোথা রে কৃষ্ণ আয় আয়, বেলা যে বয়ে যায়! আর ছেলেটাও তেমনি! বিছানা থেকে ধড়ফড়

করে লাফিয়ে উঠে বলে—মা এক্ষুনি যাব। আরে বাছা থাম, থাম! সারা রাত কিচ্ছু খাসনি। আগে মুখে কিছু দে, সাজগোজ কর, তবে তো যাবি! কিন্তু কে কার কথা শোনে! যশোদা তখন জোর করে তার মুখ ধুইয়ে, ক্ষীর-ননী খাইয়ে দেন। তার পর যত্ন করে সাজাতে বসেন। পীতবসন পরান। গলায় মালা দেন, মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল যেগুলি ঘাড় ছাড়িয়ে পিঠের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেগুলি ঝুঁটি করে মাথার মাঝখানে বেঁধে তাতে শিখিপুচ্ছ গুঁজে দেন, কটিতে কিঙ্কিণী আর পায়ে নূপুর পরিয়ে দেন। সবচেয়ে মুশকিল হয় কাজল পরাতে। ছোট্ট কেষ্ট সমস্ত শরীরটা ধনুকের মতো পেছন দিকে বাঁকিয়ে ছটফট করতে থাকে। জোর করে কাজল পরানোও হয়। তারপর কপালে তিলক আর হাতে ধরিয়ে দেন ছোট একটি মোহন বাঁশি। এই সমস্ত সময়টা কৃষ্ণ একেবারে অস্থির। তেমনি আমাদের ছোট্ট গদাই। সব সেথোরা তাড়া দিতে থাকে। ওরে গদাই আয়রে আয়! বেলা যে বয়ে যায়! মা চন্দ্রামণির সাজানো হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ-ভাঙা স্রোতের মতো বেরিয়ে যায় কচি গোপালেরা। দরজায় হাত রেখে ছোট ছোট গোপালদের পথের দিকে অনিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকেন মা যশোদার মতোই মা চন্দ্রামণি।

লাহাবাবুদের বেশ বড় একটি অতিথিশালা ছিল। সেখানে কতশত সাধু-সন্ন্যাসী আসতেন, যেতেন। সেই অতিথিশালায় যেতে ছোট্ট গদাইয়ের বড় সাধ। সেখানে যেতে খুব ভাল লাগত তার। কখনও একা-একা কখনও বা সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সাধুদের ইষ্টকে নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ, তাঁদের ধুনির সামনে ধ্যান-ভজন ইত্যাদি সবকিছু আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করতেন।

গদাইয়ের মন পড়েই থাকে সেই সন্ন্যাসীদের মাঝে।

মা নতুন ধুতি পরিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রাণের গদাইকে। কিছুক্ষণ পরেই এ তার কী অবস্থা! ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ফেলেছে গদাই।

এক ফালা দিয়ে দিব্যি ডোরকপনি করে পরেছে! একটু পরেই গদাই নাচতে নাচতে মায়ের কাছে এসে বলছে, মা, দেখো দেখো, কী সুন্দর সেজেছি!

P.9 - Wearing of Kaupin loin cloth by boy Gadadhar

‘কহেন মায়ের আগে নাচিয়া নাচিয়া।
অতিথি হয়েছি মাগো দেখ না চাহিয়া।।’ (পৃঃ ৯)

মা চন্দ্রামণি গদাইকে দেখে বলছেন, ‘ও মা, এ কি? এ তুই কী হয়েছিস?’

—‘অতিথি হয়েছি।’

‘অতিথি? সে আবার কী?’

বুঝিয়ে দিল গদাই। লাহাবাবুদের অতিথিশালায় যারা আসে তাদের অতিথি বলে না? চন্দ্রামণি বললেন, তারা তো সব সন্ন্যাসী। সেই সন্ন্যাসীর বেশই তুই পছন্দ করলি? মায়ের মন হুহু করে উঠল। আস্ত কাপড় দিলুম, তা ছিঁড়ে তুই কৌপীন বানালি? গদাই হাসল। ছেলের গায়ে সন্ন্যাসীর বেশ দেখে মায়ের বুক যেন এক অজানা আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। সন্তানকে সন্ন্যাসী হতে দেখলে সাধারণভাবে সব বাবা-মায়েরই দুঃখ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে আমাদের এই ভারতবর্ষে মদালসার মতো মায়েদের এখনও দেখা যায়। মদালসা তাঁর সন্তানের জন্ম-থেকেই দোলায় দোল দিতে দিতে বলতেন : ‘ত্বমসি নিরঞ্জন’—তুমিই সেই নিরঞ্জন নিষ্পাপ শুদ্ধ আত্মা। মা মদালসার কাছে আশৈশব বৈরাগ্যের কথা শুনে, বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সব কটি ছেলেই সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন।

সন্তানের গায়ে সন্ন্যাসীর বেশ দেখে মা চন্দ্রামণির প্রাণে ব্যথা লাগে। তাঁর চোখে নামে শ্রাবণের ধারা। তিনি ছেলেকে কোলে তুলে নেন। অপলক চোখে ছোট্ট গদাইকে দেখতে থাকেন। এমন সময় খেলার সঙ্গীদের ডাক শুনে মায়ের কোল থেকে নামার জন্য ছটফট

করতে থাকে গদাই। কোল থেকে নেমে বাড়ির উঠোনেই নানাভাবে নাচতে এবং খেলতে থাকে। ভগবানের বৈষ্ণবীশক্তি তাঁর বাৎসল্য-স্নেহরূপী মায়া বিস্তার করলে মা চন্দ্রামণি তখনই তাঁর সমস্ত চিন্তা ও দুর্ভাবনার কথা মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গিয়ে আনন্দে বালগোপালদের খেলা দেখতে থাকেন।

P,9 Swajana mohini maya- maya which makes relatives forget

‘খেলিতে দেখিয়া আই ভুলিলা সকল।
মোহ দিয়া ভগবান কি করেছে কল।।’ (পৃঃ ৯)

ক্ষুদিরামের ভিটেতে ছোট ছোট তিনখানি খোড়ো ঘর। তার মধ্যে একখানি আবার ঢেঁকিশাল। আশে-পাশে গাছপালা, ঝোপজঙ্গল। গরিবের সামান্য কুটির। তবু বোঝা যায়, সেই জায়গাটিতে জমাট বাঁধা এমন একটি দৈবী ভাব বিরাজ করে যে সবাই সেখানে আকৃষ্ট হয়। মনে হয় কী যেন এখানে বিরাজ করছে! কত না শান্তি! পথ দিয়ে যেতে যেতেও দাঁড়িয়ে যায় লোকেরা। আবিষ্ট চিত্তে স্তব্ধ হয়ে ভাবে, ওটা কার বাড়ি? ও কি কোনও মুনি-ঋষির আশ্রম?

।। দেহাতীত সত্তায় অবস্থান ।।

Dehatita sattar avasthan

First Mystical experience of Gadadhar at the age of 6yrs approx

একদিন মা চন্দ্রামণি গদাইকে টুকিতে করে গুড় দিয়ে মুড়ি মাখিয়ে খেতে দিয়েছেন। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা খেলতে খেলতে খেতে ভালবাসে। খেতে খেতে গদাইয়ের কী যেন ভাব হয়। বাঁ-হাতে টুকি ধরা আছে কিন্তু তাঁর শরীর স্পন্দনহীন, চোখদুটি পলকশূন্য। ব্রহ্মদৈত্যে ধরেছে মনে করে ছেলে কোলে নিয়ে মা চন্দ্রামণি দুর্গা দুর্গা বলে কাঁদতে থাকেন।

ছয় বছরের ছেলে ধান-খেতের সরু আল-পথ দিয়ে চলেছে নিরুদ্দেশের মতো। কোঁচড়ে মুড়ি। তাই থেকে মাঝে মাঝে চিবুচ্ছে। সবুজ মাঠের আলপথ দিয়ে যেতে যেতে ছোট্ট গদাই দেখল এখানে দিগন্ত যেন এক অখণ্ডে মিশে গেছে। সসীম হয়েছে অসীম। ক্ষুদ্র হয়েছে মহৎ। সুন্দর হয়েছে চিরসুন্দর। বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতের মধ্যে ছোট ছোট গ্রামগুলোকে মনে হচ্ছে যেন সবুজ-সাগরে ভাসমান ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ। হঠাৎ কী মনে হল, আকাশের দিকে তাকালো ছোট্ট গদাই। আকাশ তো আকাশই; শুধু তাকানোর মধ্যেই তাৎপর্য। গদাই দেখল এক বিশালকায় কালো মেঘ আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। ছড়িয়ে পড়ছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। কী দিব্য মহিমা এই মেঘমণ্ডিত আকাশে! মন যেন কোনও এক মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল! চোখ যেন আর ফেরে না গদাইয়ের! হঠাৎ এই সময় এক ঝাঁক সাদা বক সেই কালো মেঘের কোল ঘেঁষে উড়ে গেল দিগন্তের পানে। গদাইয়ের সারা গায়ে শিহরণ জাগল। এই অপূর্ব, অনির্বাচ্য সৌন্দর্য কে পরিবেশন করল? কৃষ্ণিমার সঙ্গে এই শুভ্রতার যোগাযোগ? ‘মহামেঘপ্রভাং শ্যামা’র গলায় যেন সাদা ঝকমকে মুক্তোর মালা! এই চিত্তবিকলকারী দৃশ্যের সঙ্গে হঠাৎই গদাইয়ের মন-প্রাণ উড়ে চলল পাখা মেলে কোনও এক অজানা-অচেনা অতীন্দ্রিয় লোকে! দেহপিঞ্জর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। যখন চোখ মেলল, দেখল বাড়িতে শুয়ে আছে। কে তাকে কখন যে মাঠ থেকে তুলে নিয়ে এসেছে তা কে জানে!

P.9 Mystical experience in the fields

‘নাই কোন অন্তরাল চারিধার খোলা।
নবীন নবীন মেঘ শূন্যে করে খেলা।।

… … …

বাহ্য জ্ঞান নাহি আর অনিমেষ আঁখি।
বেঁকে হাত উপুড় হইয়া গেল টুকি ।।’ (পৃঃ ৯)

প্রায় সব অবতার-পুরুষ বা অবতার-কল্প পুরুষের ক্ষেত্রেই এ-ধরনের কিছু কিছু ঘটনা ঘটে থাকে। স্বামীজীর ছেলেবেলাতেও এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল।

Mystical experience of Narendra in 1877 while travelling to Raipur

সেটা ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ। স্বামীজীর বয়স তখন চোদ্দো বছর। বাবার কাছে রায়পুরে মা এবং ভাইদের সঙ্গে যাচ্ছেন। তখন রায়পুর পর্যন্ত রেলগাড়ি হয়নি। নাগপুর থেকে গরুর গাড়িতে প্রায় পনেরোদিন ধরে একনাগাড়ে চলে রায়পুর পৌঁছাতে হত। গভীর বন এবং পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে নরেন্দ্র হঠাৎ এমন একটি জায়গায় এসে পৌঁছালেন, যেখানে পাশাপাশি পাহাড়ের মাথাদুটি যেন সপ্রেম আলিঙ্গনের জন্য বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে এসে বনপথটাকে ঢেকে ফেলেছে। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন নরেন্দ্রনাথ। দেখলেন পাহাড়ের চূড়া থেকে মাটি পর্যন্ত একটা ফাটলের মধ্যে মৌমাছিদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল হিসেবে একটা বিশাল মৌচাক সৃষ্টি হয়েছে। দেখামাত্রই মৌমাছিদের আদি-অন্তের রহস্যচিন্তায় বিভোর হয়ে নরেন্দ্রের মন অসীমের ভাবে তলিয়ে গেল আর তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। পরে তিনি নিজেই বলেছিলেন : ‘কতক্ষণ যে এভাবে গোযানে পড়িয়া ছিলাম তাহা স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল, দেখিলাম উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া বহুদূর আসিয়াছি। গোযানে একাকী ছিলাম বলিয়া একথা কেহ জানিতে পারে নাই।’

।। রঘুবীরের মালাগ্রহণ ।।

Raghuvirer Mala grahan - wearing the flower garland mean for house dedity Sri Rabhuvir

একদিন সকালবেলা ছোট্ট গদাই দেখল তাঁর পিতৃদেব অত্যন্ত যত্ন ও ভক্তির সঙ্গে ফুল দিয়ে মালা গাঁথছেন। গৃহদেবতা রঘুবীরের পূজার জন্য ফুল, চন্দন প্রভৃতিরও কত যে আয়োজন তিনি করেছেন! ক্ষুদিরাম তাঁর কুলদেবতা এই রঘুবীরকে এক আশ্চর্যজনক দৈবস্বপ্নে দর্শন পেয়ে অলৌকিকভাবে লাভ করেছিলেন।

একদিন ক্ষুদিরাম কোনও কাজে মেদিনীপুরে তাঁর ভাগনে রামচাঁদের কাছে যাচ্ছিলেন। কামারপুকুর থেকে দু-তিনদিনের পথ। দুপুরবেলা। পথের পাশে একটা বড় গাছের তলায় বিশ্রাম করার জন্যে বসেছেন। হাঁটাও হয়েছে অনেকখানি। জনশূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ক্লান্ত ক্ষুদিরামের একটু শুয়ে বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছা হল। গাছের গুঁড়িতে মাথা রেখে শুতে না শুতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন শ্রীরামচন্দ্র বালকের বেশে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সামনে।

Rahuvir in the dream of Kshudiram on the way to meet Ramchand of Midnapur Pg.10

‘দেখেন আশ্চর্য কথা স্বপ্নে দ্বিজবর।
এক নব দুর্বাদল–বর্ণ কলেবর।।’ (পৃঃ ১০)

চন্দ্রের মতো রমণীয় বলেই তো রামচন্দ্র। কিন্তু মুখখানি এত ম্লান কেন? বালকবেশী রামচন্দ্র বললেন : ‘আমি বড় অযত্নে ও অনাহারে বহু দিন এই ধানক্ষেতে মাটির ভেতর পড়ে আছি। আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চলো। তোমার সেবা গ্রহণ করার আমার বড় সাধ, বড় ইচ্ছে।’ ঐকথা শুনে ক্ষুদিরাম একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। বারবার প্রণাম করে বলতে লাগলেন : ‘প্রভু, আমি ভক্তিহীন ও নিতান্ত গরিব। আমার গরিবের কুটিরে আপনার যোগ্য সেবা কখনোই করতে পারব না। আপনার সেবা ঠিকমতো করতে না পেরে আমি সেবা-অপরাধী হয়ে আরও অনেক বেশি কষ্ট পাব। ক্ষুদিরামের এই কথা শুনে প্রসন্ন হাসি হেসে স্বয়ং নবদূর্বাদলশ্যামতনু শ্রীরামচন্দ্র বললেন : ‘ভয় নেই। তুমি আমাকে যা খাওয়াবে তাতেই আমি সুখী হব। আমি প্রতিদিন দুটি দুটি অন্ন পেলেই খুশি। আমি উপচার চাই না, ভক্তি চাই। যার হৃদয়ে ভক্তি আছে তার ত্রুটি আমি কখনও ধরি না।’ ঘুম ভেঙে গেল ক্ষুদিরামের। ভাবতে লাগলেন, আহা! কোনোদিনও কি আমার এই রকম সৌভাগ্য হবে! চার পাশে তাকিয়ে দেখলেন কোথাও কেউ নেই। তিনি ধানক্ষেতে নেমে খুঁজতে লাগলেন। সারাটি ক্ষেত খুঁজেও কিছু পেলেন না। ঠিক করলেন আবার ঘুমিয়ে দেখবেন স্বপ্নটা সত্যি না

মিথ্যে। যদি সত্যি হয়, তবে আবার ঠিক ঐ স্বপ্নই দেখবেন। আবারও সেই একই স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্নে যে ধানক্ষেত দেখেছিলেন ঐ তো সেই ধানক্ষেত এবং ঐ তো সেই মুঠো ধানগাছ।

Raghuvir for the second time in the dream of Kshudiram Pg.10

'কুমার বলেন মুটো-ধান-গাছ-তলে।
নিশ্চয় পাইবে তুমি পুনশ্চ খুঁজিলে।।...
পরম সুন্দর এক শিলা মনোহর।
কিন্তু এক কাল ফণী তাহার উপর।।
স্বপনের বার্তা দ্বিজ স্মরিয়া অন্তরে।
ফণীকে না করি ভয় শালগ্রাম ধরে।।' (পৃঃ ১০)

(মুঠো ধানগাছের অর্থ—দেশাচার অনুযায়ী ধানগাছ রোপণের সময় প্রথমেই একমুঠো বা একগোছা ধানের চারা পুততে হয় এবং ধানগাছগুলি বড় হয়ে গেলেও এই গাছগুলিকে চিহ্নিত করা যায়।) নিশ্চয়ই ঐখানে লুকিয়েছেন! এগিয়ে গেলেন ক্ষুদিরাম। দেখলেন, একটুকরো পাথরের শিলার ওপর একটা বিষধর সাপ ফণা মেলে আছে। ভাল করে দূর থেকে দেখে বুঝলেন এটি সামান্য পাথর নয়। শালগ্রাম শিলা। মনে হল স্বপ্ন মিথ্যা নয় এবং ঐ শিলাই তাঁর অভীষ্টদেব রামচন্দ্র। তা না হলে সহসা ঐ বিষধর সাপ অন্তর্হিত হবে কেন? কিন্তু সাপ তো একেবারে চলে যায়নি। পাথরের মুখে যে গর্ত তারই মধ্যে হয়তো লুকিয়েছে। শিলা তুলে আনবার সময় হাতে যদি কামড়ে দেয়! ইতস্তত করতে লাগলেন ক্ষুদিরাম। কিন্তু যিনি রাম তিনি কি বিষহরণ নন? 'জয় রঘুবীর' বলে ত্বরিতে তুলে নিলেন শিলা। লক্ষণ দেখে বুঝলেন এটি 'রঘুবীর শিলা'। তবে আর সন্দেহ কি ? এই শিলাই তাঁর জাগ্রত গৃহদেবতা। শুধু জাগ্রতই নয়, স্বয়মাগত।

ক্ষুদিরামের ভারী সাধ হয়েছে ফুল দিয়ে রঘুবীরকে সাজাবেন। তাই মনের আনন্দে তাঁকে ফুলের মালা পরাবার আয়োজন করেছেন।

ভক্তিভরে গাঁথা সেই মালা কী সুন্দর হয়েছে! কেননা প্রতিটি ফুলের পাপড়ি যে ভক্তিচন্দন মাখা!

পুজোয় বসেছেন ক্ষুদিরাম। সামনে আনন্দময় ও মঙ্গলময় রঘুবীর। পাশে নানান রকম উপকরণ—তার মধ্যে ক্ষুদিরামের নিজের হাতে গাঁথা একগাছি সুন্দর ফুলের মালা। রঘুবীরকে স্নান করিয়ে চোখ বুজে তাঁর ধ্যান করছেন ক্ষুদিরাম। ধ্যান-তন্ময়তায় ক্রমশই ডুবে যাচ্ছেন। সাড়া নেই। স্পন্দন নেই। সে এক সীমাহীন আনন্দসাগরে যেন ডুব দেওয়া।

Wearing the flower garland meant for Raghuvir by himself Pg. 11

গদাইয়ের বড় সাধ ঐ ফুলের মালাটি গলায় পরার। অমনি তুলে নিয়ে গলায় পরে পালিয়ে গেলে চলবে না। নয়নশোভন রঘুবীর সাজতে হবে। রঘুবীরের পাশে বসে পড়ল গদাই। চন্দনের বাটি থেকে চন্দন নিয়ে মাখলো সারা গায়ে। পুষ্পপাত্র থেকে মালাটি তুলে নিজের গলায় পরে বাবাকে বলল, 'বাবা দেখো দেখো, কেমন সেজেছে রঘুবীর!'

'রঙ্গ করি জনকেরে ডাক দিয়া কন।
দেখ না গো রঘুবীর সেজেছে কেমন।।
আমি সেই রঘুবীর দেখনাগো চেয়ে।
কেমন সেজেছি মালা-চন্দন পরিয়ে।।' (পৃঃ ১১) Pg. 11

শ্রীকৃষ্ণেরও একবার মালা পরবার সাধ হয়েছিল। মথুরা নগরীতে ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষে বিরাট মল্লক্রীড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আর বলরামও আমন্ত্রিত হয়েছেন। মথুরা-নগরীতে দু-ভাই এসে নগর দেখে বেড়াচ্ছেন। কৃষ্ণ বলরামকে বললেন, দাদা কংসের রজকের কাছ থেকে তো পোশাক নিয়ে গোপবালকদের পোশাক পরিবর্তন করলাম। এখন ভাল ফুলের মালা না হলে অসম্পূর্ণতা কাটবে না। ঠিক এই সময় একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি পুষ্পসত্র থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলেন। উন্নত আকার। চোখে-মুখে নিগূঢ়

প্রশান্তি। তিনি কৃষ্ণ ও বলরামকে বললেন—‘ভেতরে এসে এই অধমকে ধন্য করুন, শুধু এই মিনতি।’ দুজনে ভেতরে প্রবেশ করার পর ঐ প্রৌঢ় ব্যক্তির নির্দেশে মহামূল্যবান আসন আনা হল। দু-ভাই বসলেন। প্রথমেই পাদ্য-অর্ঘ্য তারপর তাম্বূল দিয়ে প্রৌঢ় তাঁদের সমাদর করলেন। পরম ভক্তিতে প্রথমে শ্রীপাদপদ্মে, পরে সর্বাঙ্গে চন্দন লেপন করে গলায় দুলিয়ে দিলেন একটি করে অপূর্ব সুন্দর ফুলমালা। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে হাতজোড় করে বললেন : ‘আজ আমি কৃতকৃতার্থ হলাম।’

কৃষ্ণ বললেন, ‘তুমি কে?’

এই অধম আপনার দাসানুদাস সুদামা। ??

কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি জান আমরা কে?’

সুদামা বললেন : না প্রভু। ‘তাহলে এভাবে যে আমাদের অর্চনা করলে?’ সুদামা বললেন, আমি শুধু এইটুকু জানি যে, আপনি আমার ইষ্ট, আমার ভগবান।

কৃষ্ণ বললেন : বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু কীভাবে তা জানলে?

সুদামা কিছুক্ষণ অচঞ্চল নয়নে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর যেন নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন। মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বললেন : কতদিন আমি আপনাকে স্বপ্নে দর্শন করেছি। ঐ নবঘনশ্যাম রূপকে। কতদিন ভেবেছি যদি কোনোদিন এই দীননয়নে সাক্ষাৎ আপনাকে দেখতে পাই তাহলে আমার নিজের হাতে গাঁথা মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করব। আজ আমার সেই মনস্কামনা পূর্ণ হল। আজ আমি ধন্য। জীবনে আর কিছুই আমি চাই না।

কৃষ্ণ বললেন : তোমার মঙ্গল হোক, তোমার শুভ হোক। শোনো, আমি কৃষ্ণ। ইনি আমার দাদা বলরাম। তুমি আমাদের তৃপ্তি দিয়েছ। যখনই স্মরণ করবে তখনই দর্শন পাবে।

পূর্বকথায় ফিরে আসা যাক। গদাইয়ের ডাকে ধ্যান ভেঙে গেল ক্ষুদিরামের। চোখ মেলে দেখলেন রঘুবীরের পুজোর সমস্ত রকম

উপকরণ সামনে নিয়ে চন্দনচর্চিত হয়ে রঘুবীর সেজে বসে আছে তাঁদের প্রাণের গদাই। শিশুপুত্রের মাঝে যে বালগোপাল লুকিয়ে আছেন সেদিন ক্ষুদিরাম কি তাঁরই বন্দনা করেছিলেন? যদিও ক্ষুদিরাম, গদাইয়ের জন্মের আগে থেকেই নিশ্চিত ছিলেন যে গয়াধামের গদাধর বিষ্ণুই তাঁদের সন্তানরূপে আসবেন।

পরবর্তিকালে আমরা দেখতে পাই ভক্তের দেওয়া মালা গ্রহণ করেননি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর পরম গৃহী-ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আষাঢ় মাসের এক সন্ধ্যার কিছু আগে ঠাকুর সুরেন্দ্রনাথের বাড়ির দোতলার বৈঠকখানায় ভক্তদের সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ করছেন। এই সময় সুরেন্দ্র একটি মূল্যবান মালা নিয়ে ঠাকুরকে পরাতে গেলে তিনি হাতে মালাটি নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তখন সুরেন্দ্র বাইরের বারান্দায় গিয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং কাছাকাছি যে-সমস্ত ভক্ত ছিলেন তাঁদের অভিমান করে বলছেন : ‘রাঢ় দেশের বামুন এসব জিনিসের মর্যাদা কি জানে! অনেক টাকা খরচ করে এই মালা! ক্রোধে বললাম, সব মালা আর সব্বাইয়ের গলায় দিয়ে দাও। এখন বুঝতে পারছি আমার অপরাধ। ভগবান পয়সার কেউ নন, অহঙ্কারেরও কেউ নন! আমি অহঙ্কারী, আমার পুজো কেন নেবেন? আমার বাঁচতে ইচ্ছা নাই।’ চোখের জলে তাঁর বুক ভাসতে লাগল। ঠাকুরের কার্যসিদ্ধি হয়েছে। তিনি এখন অনুতপ্ত ভক্তকে কৃপা করার জন্য ঐ মালাটি তুলে নিয়ে গলায় পরে মধুর সঙ্গীত এবং নৃত্যে সকলকে মুগ্ধ করলেন। গান শেষ হলে ভক্তবৎসল কৃপাময় ঠাকুর সুরেন্দ্রকে বললেন : ‘সুরেন্দ্রর আমায় কিছু খাওয়াবে না?’ ঠাকুরের অহেতুকী কৃপা সুরেন্দ্রের ওপর বর্ষিত হওয়ায় সুরেন্দ্রের সমস্ত মন-প্রাণ এক ঐশ্বরীয় আনন্দে ও অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠল এবং তাঁর বুক আনন্দাশ্রুতে ভাসতে লাগল।

1881 Ashadh month - throws away flower garland offered by Surendra in his house

Radh desher bamun

শ্রীচৈতন্যদেব যখন পুরীতে বাস করছিলেন, সেই সময় সেখানকার রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। সেবছর রথযাত্রার সময় মহাপ্রভু যথারীতি রথের সামনে বহুক্ষণ নৃত্য-কীর্তনাদি করে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং শ্রীমতীর ভাবে বিভোর হয়ে পাশের একটি বাগানে গিয়ে অর্ধবাহ্য অবস্থায় শুয়েছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজছিলেন। এই সুযোগে রাজা রাজবেশ ত্যাগ করে বৈষ্ণবের বেশে মহাপ্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর পদসেবা করতে করতে ‘গোপীগীতা’ আবৃত্তি করতে থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব একে গোপীভাবে তন্ময়। তার ওপর ‘গোপীগীতা’ শুনে তিনি আনন্দের আতিশয্যে বারবার বলতে লাগলেন—থেমো না, থেমো না, আরও বলো, আরও বলো।

রাজা তখন ‘গোপীগীতা’ থেকে অত্যন্ত পরিচিত এই শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন :

‘তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।’ Gopi Gita

—এই শ্লোকটি শুনে মহাপ্রভু আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। আনন্দে লাফিয়ে উঠে রাজাকে আলিঙ্গন করে বললেন :

‘তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্যরতন।
মোরে কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন।।’ ??

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ‘ওরে অহঙ্কারকেই শাস্ত্রে চিজ্জড়গ্রন্থি বলেছে; চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা এবং জড় অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি—এই অহংকার। এই দুটিকে একসঙ্গে বেঁধে-রেখে মানুষের মনে দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদিবিশিষ্ট জীব—এই ভ্রম স্থির করে রেখেছে।’ ??

কামারপুকুর গ্রামের সমস্ত লোক গদাইকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। আর তাই তাঁরা প্রায় রোজই গদাইকে দেখার জন্য, তাঁর কথা শোনার জন্য ক্ষুদিরামের বাড়িতে এসে হাজির হতেন। গদাইয়ের গানের গলাটি ছিল সুমিষ্ট। তিনি মিঠে সুরে যখন শিব ও শ্যামা বিষয়ক গান গাইতেন তখন আশপাশের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই সব গান শুনতেন। ছোট্ট গদাইয়ের মিষ্টি গলার গান শুনে সব্বাইয়ের মনপ্রাণ জুড়িয়ে যেত। পল্লীরমণীরা, বিশেষ করে গ্রামস্থ বিধবা রমণীরা প্রায় প্রতিদিনই গদাইকে খাওয়াবার জন্য ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়াতেন এবং তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ ও প্রীতির সঙ্গে খাওয়াতেন। গদাইকে দেখতে না পেলে গ্রামের পল্লীরমণীরা অস্থির হয়ে মা চন্দ্রামণির কাছে ছুটে ছুটে আসতেন। গদাইকে দেখে, তাঁর গান এবং কথা শুনতে শুনতে তাঁরা আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায় গোপরমণীরাও শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেই আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতেন। কৃষ্ণের মনোরম বাল্যক্রীড়াকৌতুক দেখা বা বলার জন্য ব্রজরমণীরা প্রায় প্রত্যেক দিনই মা যশোদার কাছে গিয়ে তাঁর দুষ্টুমির কথা বলতেন। ব্রজরমণীরা যে রাগ করে অথবা যশোদার কাছে নালিশ করবার জন্য ঐসব কথা বলতেন তা নয়। কৃষ্ণ যে তাঁদের ঘরে গিয়ে চুরি করে ক্ষীর-ননী খায় অথবা দুরন্তপনা করে, এতে তাঁরা মোটেই অসন্তুষ্ট নন। গোপীরা কৃষ্ণের কথা বলতে ও শুনতে খুব ভালবাসেন এবং বড় আনন্দ পান। কৃষ্ণের বাল্যলীলার কথা শুনে তাঁদের সখী যশোদাও আনন্দ লাভ করুন—এই তাঁদের উদ্দেশ্য। মা যশোদাও ব্রজরমণীদের এই মনোভাব খুব ভালভাবেই জানতেন।

একদিন গোপীরা বলছেন : হে যশোদে! তোমার পুত্রটি এই ছোট্ট বয়সেই চুরিবিদ্যায় এত পারদর্শী হয়েছে যে, তা আমরা ধারণাও করতে পারি না। তার চুরি করবার কৌশলই বা কত! সে ক্ষীর-ননী চুরি

করার জন্য আমাদের বাড়িতে ঢুকেই একনজরে দেখে নেয় আমরা কে কোথায় আছি। যদি দেখে আমরা ঘরেই আছি তাহলে তখন সে নিঃশব্দে গোশালায় গিয়ে গো-দহনের আগেই বাছুরদের খুলে দেয়। বাছুরগুলি তখন বাইরে এসে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। আমরা তখন বাধ্য হয়ে বাছুরগুলি বাঁধবার জন্য বাইরে আসি। এই সুযোগে সে ঘরে ঢুকে ক্ষীর-ননী যা থাকে সব চুরি করে নিয়ে যায়।

মা যশোদা বলেন : আমার কৃষ্ণ তোমাদের ঘরে গিয়ে উৎপাত করে, তোমরা তাকে তো একটু শাসন করলেই পার। গোপীরা হেসে বললেন—তাকে শাসন করব কি? শাসন করলেই দূরে দাঁড়িয়ে হাসে। তার ঐ চাঁদ-মুখের হাসি দেখে আমরা একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যাই। তাকে আর কিছু বলতে পারি না।

যশোদা বলছেন : সমবয়সীদের সাথে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হয়ে যখন কৃষ্ণ তোমাদের ঘরে যায় তখন যদি তোমরা তাকে একটু খেতে দাও তবে তো আর সে চুরি করবে না। খিদেয় কাতর হয়েই সে তোমাদের জিনিস না-বলে খায়। তোমাদের ঘরে গেলেই বাপু তোমরা তাকে একটু খেতে দিও। তাহলেই তার না-বলে খাওয়ার অভ্যাস চলে যাবে।

গোপীরা তখন বললেন—যশোদা, তুমি তো জান কৃষ্ণ আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাকে খাওয়াবার জন্য আমাদের কত সাধ—ক্ষীর ননী হাতে করে তাকে খাওয়াবার জন্য কত সাধাসাধি করি। কিন্তু সে কিছুতেই খেতে চায় না, বলে—তোমাদের ক্ষীর-ননী ভাল নয়। আমার মায়ের ক্ষীর-ননী খুব ভাল। মা আমাকে পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছে। যদি না বিশ্বাস কর, আমার পেটে হাত দিয়ে দেখনা।

যে ঘরে রাখ—দরজা, জানলা বন্ধ করে অন্ধকারে রাখলেই তো আর কৃষ্ণ ঐসব জিনিসের খোঁজ পাবে না। আর খোঁজ যদি না পায় তবে চুরি করবে কেমন করে!

যশোদার কথা শুনে গোপীরা বললেন—ও হরি! তোমার পুত্র যে-ঘরে যায় সে-ঘর কি আর অন্ধকার থাকতে পারে? তার অঙ্গচ্ছটায় অন্ধকার ঘরও আলোকিত হয়ে ওঠে।

গোপীরা বললেন : হে যশোদে! দেখো, কৃষ্ণ এখন কেমন ভাল-মানুষের মতো তোমার কোলে বসে আছে! গোপরমণীরা এইভাবে যশোদা-নন্দনের বাল্য-চাপল্য বর্ণনা করে শঙ্কিত কৃষ্ণের মুখের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে রইলেন। কৃষ্ণ ভয় পেয়েছে দেখে তাঁরা যশোদাকে আর কিছু বললেন না। গোপীদের কথা শুনে যশোদা হাসলেন বটে, কিন্তু পুত্রকে ভীত দেখে কোনও তিরস্কার করলেন না।

মা যশোদার এবং মা চন্দ্রামণির বাৎসল্যের মাধুর্য জগতে অতুলনীয়। মহাপ্রলয়কালে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করেও যিনি অপরাধী হন না, সেই তিনি একটা সামান্য দইয়ের ভাঁড় ভেঙে মা যশোদার কাছে অপরাধী হয়েছেন। আমরা মানস নয়নে কল্পনা করলে দেখতে পাব ভগবানের মাধুর্যলীলায় তিনি নন্দ-যশোদার কাছে অসহায় শিশুর রূপে ধরা দিয়েছেন। মা যশোদা তাঁকে শাসন করছেন, দড়ি দিয়ে বাঁধছেন, এ কি ভাবা যায়? যাঁর কৃপাকটাক্ষে জীবের ভববন্ধন মুহূর্তের মধ্যে ছিন্ন হয়ে যায়, সেই তাঁকেই মা যশোদা বাঁধছেন! মাতাপিতা ও সন্তানের মধ্যে প্রকাশিত এই ভাবরসে ভগবান ছোট্টটি হয়ে ভক্তের আজ্ঞাবহ হন।

।। হনুমানের সঙ্গে খেলা ।।

Hanumaner sange khela / Playint with monkey

গদাইয়ের বাল্যলীলা সত্যিই অপূর্ব, বড়ই মধুর, বড়ই সুন্দর!

'যেই রাম, যেই কৃষ্ণ—তিনিই এ-দেহে রাম-কৃষ্ণ।' —এটি শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের উক্তি। এইটি তাঁর সমসাময়িককালের এবং

বর্তমানকালেরও ভাগ্যবান ভক্তদের অনুভব। বাল্যকালেই ঠাকুর ‘রাম’ এবং ‘কৃষ্ণের’ ভাবটি প্রকট করেছেন। এর আগে ঠাকুরের বাল্যলীলায় শিবের আবেশ, বালসন্ন্যাসীর বেশধারণ, ঐশ্বর্য-প্রদর্শন, ভাবসমাধি, রঘুবীরের মালাগ্রহণ ইত্যাদি বিচিত্র লীলার রস আলোচিত হয়েছে। হনুমান হচ্ছেন রামময়-জীবিত। তাঁর অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব রামনির্ভর। একবার হনুমান স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর পূর্বপুরুষেরা সব অত্যন্ত শীর্ণ হয়ে গাছের ডালে ঝুলছেন। তিনি অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন : ‘আপনারা এত শীর্ণ হয়ে গেছেন কেন?’ তখন তাঁরা বললেন, ‘দেখো বাবা, তুমি তো বিবাহ করলে না। তুমি যতদিন আছ, পিতৃ-তর্পণাদি করছ। কিন্তু তার পর কি হবে এই দুশ্চিন্তায় আমাদের শরীরের এই অবস্থা হয়েছে।’ ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর মা-জানকীকে হনুমান সব বললেন। মা-সীতা তখন হনুমানকে বিবাহ করার জন্য বললেন। হনুমান তখন নিজের বুক চিরে দেখালেন যে, তাঁর হৃদয়ে কেবলমাত্র পূর্ণব্রহ্ম রাম ও মা-জানকী ছাড়া আর কারও স্থান নেই। মা-সীতা প্রসন্না হয়ে বললেন : ‘কাজ নেই তোমার বিয়ে করে। তুমি বাবা দীর্ঘজীবী হও।’ যাঁরা অমর বলে পরিচিত, তাঁদের মধ্যে হনুমান অন্যতম। [Ashwathama, Vali, Vyasa, Hamuman, Vibhishana,Parashuram, Kripacharya and Markandeya - Eight immortals]

সেই বীর-ভক্ত হনুমানদের সঙ্গে খেলার মধ্যে দিয়ে শিশু গদাইয়ের দিব্য লীলারস আস্বাদন করা যায়। ভক্তিশাস্ত্রে ভগবানের যে লীলা, বহুরূপে তাঁর যে প্রকাশ—তাকে আমরা মিথ্যা বলতে পারি না। লীলা আর মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য আছে। মিথ্যা ?? মানুষকে মোহগ্রস্ত করে, বিভ্রান্ত করে। আর লীলা তাঁর রসকে আস্বাদন করায়। ভক্ত ‘ভগবানকে’ বহুরূপে, বহুভাবে আস্বাদন করতে চান।

যিনি বিশ্বপতি, তিনি যে এখন আমাদের মাঝে শিশুর রূপ ধারণ করে লীলা করছেন সাধারণের পক্ষে এটি বোঝা সম্ভব নয়। ছোট্ট গদাইয়ের মধ্যে গ্রামবাসীরা ভগবানের যতই ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ করুক না

কেন, তিনিই যে স্বয়ং ভগবান এমন কথা তাদের মনে কখনোই উঠত না। প্রাণাধিক গদাইকে নিয়ে সবসময় একটা আনন্দের শিহরণ অনুভব করত। কেননা আনন্দস্বরূপ ভগবান যখন ধরাধামে অবতীর্ণ হন তখন সবকিছুই আনন্দঘন হয়ে ওঠে। ফুল-ফল, গাছ-পালা, লতা-গুল্ম, পশু-পাখি সব্বাই ভগবানকে পেয়ে এক অজানা আনন্দ-সাগরে অবগাহন করে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও দেখা যায় কৃষ্ণের নানা রকম ঐশ্বর্য দেখলেও তিনি যে স্বয়ং ভগবান সেকথা কারও মনে হত না। তাঁর গিরি-গোবর্ধন ধারণ, মা যশোদাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, পুতনা-বধ ইত্যাদি দেখেও গোপবাসীরা কৃষ্ণকে তাঁদের প্রাণের ছোট্ট কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারতেন না।

Sarati Mayapur - 36 km from Kamarpukur - Maternal grand father's home

Events on the way to maternal uncle's house

মায়াপুরের কাছে সরাইঘাটায় (অনেকে সরাটি মায়াপুর বলেও এই জায়গাটিকে জানেন) গদাইয়ের মামার বাড়ি। কামারপুকুর থেকে প্রায় ছত্রিশ কিলোমিটার দূরে। একবার মায়ের সঙ্গে গদাই মামার বাড়ি যাচ্ছিলেন। তখনকার দিনে লোকেরা দূরদূরান্তরে পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতেন। মা চন্দ্রামণি হেঁটেই বাপের বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথে গদাই মাকে বললেন : ‘মা, আমায় তুমি কাপড়ে ঢেকে কোলে করে নিয়ে চলো। পথে যেতে যেতে আমাকে যেন কেউ না দেখে।’ তিনি যেমনটি বললেন, মা-ও সেইমতো গদাইকে নিজের কাপড়ে ঢাকা দিয়ে কোলে করে চলতে লাগলেন।

Mother chandramani covered Gadai with her cloth and carried him - Pg 22

‘বস্ত্রে করি আচ্ছাদন কোলে কর মোরে। Pg 22
পথে যেতে কেহ যেন না দেখে আমারে।।’ (পৃঃ ১২)

প্রশ্ন জাগতে পারে—কেন তিনি মাকে তাঁর আঁচল দিয়ে ঢেকে নিয়ে যেতে বললেন? অবতার-লীলায় দিব্যভাব এবং মানবীয়-ভাবের সমন্বয় থাকবেই। দিব্যভাব দুর্বোধ্য। পথে যেতে যেতে গদাইয়ের দিব্যভাবটি যাতে খুব বেশি প্রকাশিত হয়ে না পড়ে সেই জন্যই এই গোপনীয়তা।

পথের পাশে একটি গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় একটি পীরের স্থান ছিল। কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকলেও গদাই কিন্তু ঠিক ঐ স্থানের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছেন। তখন তিনি নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। পরবর্তী কালেও নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি স্থানে তাঁর ভাবোদ্দীপন হত। মাকে ধীরে ধীরে বললেন : ‘আমায় এখানে নামিয়ে দাও মা।’ সেই গাছের গোড়ায় সত্যপীরের বেদীতে পড়ে রয়েছে কত মাটির হাতি ঘোড়া। গদাই তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন সেখানে। তারপর তিনি সেখানে গিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন। মা কত ডাকাডাকি করছেন—কিন্তু সে ডাক তাঁর কানেই যাচ্ছে না। তিনি তখন স্থানমাহাত্ম্যে বিভোর হয়ে দেহাতীত অবস্থায় বিরাজ করছিলেন। কোনোভাবেই গদাইকে সেখান থেকে তুলতে না পেরে মায়ের মন দুশ্চিন্তা আর ব্যাকুলতায় ভরে উঠল। মা অনেক বুঝিয়ে গদাইকে কোলে তুলে নিলেন। পীরের স্থান মুসলমানদের পবিত্র স্থান। আমাদের মনে হয় পরবর্তী কালে যিনি সর্বধর্মসমন্বয় মন্ত্রের উদ্গাতা হবেন, তারই যেন সূচনা করলেন।

Gadadhar asked his mother to put him down near the holy place of a Muslim saint / Pir Pg 22

‘সন্ধান পাইয়া মায়ে কন ধীরে ধীরে।
দেহ দেহ দেহ গো মা নামাইয়া মোরে।।’ (পৃঃ ১২)

Pg 12 ?? [22]

Monkeys and Gadadhar

এরপর মা চন্দ্রামণি আবার নতুন এক বিপদে পড়লেন। মায়ের কোলে চড়ে তিনি তো মামার-বাড়ি চলেছেন। পথিপার্শ্বে এমন একটি বড় গাছের নীচে এসে উপস্থিত হয়েছেন, যে গাছের ডালে বসে আছে অসংখ্য হনুমান। তাদের দেখে গদাই ভারি খুশি। যেখানে হনুমানগুলি বসে আছে, তিনি ছড়ি হাতে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন।

অতটুকু ছোট্ট গদাই । কিন্তু মনে কোনও ভয়ডর নেই। সেখানে গিয়ে হনুমানদের তাড়া করলেন। কিন্তু বনের সেই হনুমানেরা কেউ গদাইকে আক্রমণ তো করলই না, বরং গাছের ডালে যে-সমস্ত হনুমানেরা বসেছিল তারাও গাছ থেকে নেমে এসে গদাইয়ের সঙ্গে নানারঙ্গে খেলা করতে লাগল। তাদের সঙ্গে গদাই ছুটোছুটি করে খেলছে দেখে মায়ের প্রাণ তো ভয়ে সারা।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও দেখা যায় ছোট্ট কৃষ্ণ ক্ষীর-ননী চুরি করে নিজে খাওয়ার আগে একপাল বানরকে সেগুলো ভাগ করে খাওয়ায়। বানরেরা যেন তার কত পরিচিত! তারাও তাকে দেখে আনন্দে অধীর। বানরদের পেট ভরে খাওয়াবার পর তারা যখন আর খেতে চায় না, তখন কৃষ্ণ রেগে গিয়ে ক্ষীর-ননী, দুধ-দইয়ের ভাঁড়গুলো ভেঙে ফেলে বলে—তোদের জন্য চুরি করলাম, আর তোরা খাবি না! কৃষ্ণের মুখভঙ্গি দেখে বানরেরা একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শুধু কি তাই! একদিন যশোদা দেখলেন উপুড় করা উদূখলের ওপর বসে কৃষ্ণ শিকা থেকে নবনীত নিয়ে বানরদের খাওয়াচ্ছে। আর চুরি করছে বলে সে এদিক-ওদিক ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে—পাছে কেউ দেখে ফেলে। মা যশোদা ভাবছেন, আমি তো আজ নিজের চোখেই কৃষ্ণের সব কীর্তি দেখলাম। আজই ওকে শাসন করব। এই ভেবে যশোদা হাতে একটি লাঠি নিয়ে আস্তে আস্তে কৃষ্ণের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। যশোদাকে আসতে দেখেই বানরেরা সব পালাতে লাগল । বানরদের পালাতে দেখে কৃষ্ণ পেছন ফিরে লাঠি হাতে মাকে আসতে দেখে ভয়ে দৌড়। কৃষ্ণ ছুটে পালাচ্ছেন, আর মা যশোদা তাঁর পেছনে ধাওয়া করছেন—মানসনেত্রে এই দৃশ্য দেখে ব্রহ্মনিষ্ঠ শুকদেব বলে উঠলেন, কী আশ্চর্য! নির্বিকল্প সমাধিবান যোগীরা চিত্তের একাগ্রতা দিয়েও যাঁকে স্পর্শ করতে পারেন না, যশোদা কিনা সেই যোগী-শ্রেষ্ঠদেরও অপ্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণকে ধরবার জন্য তাঁর পেছনে ছুটছেন! ভগবান পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে আছেন ঠিকই কিন্তু কেউই তাঁকে ধরতে পারে না। কিন্তু যশোদার বাৎসল্য-স্নেহে গড়া সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ সদা চঞ্চল। তবুও যশোদার হাত তিনি এড়াতে পারেন না। যোগীরাও যাঁর সন্ধান পান না, সেই লীলা-বিগ্রহধারী কৃষ্ণকে ধরবার জন্য লাঠি হাতে যশোদা তাঁর

পেছনে ছুটছেন—এর চেয়ে মজা, এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে! বাৎসল্য প্রেমের কি অপার মহিমা! চোখ বন্ধ করে মানসনেত্রে এই দৃশ্যটিকে কল্পনা করলে দেখা যাবে—কৃষ্ণ মায়ের ভয়ে পালাচ্ছেন আর মা যশোদা পেছন পেছন তাঁকে ধরবেন বলে ছুটছেন। কৃষ্ণের পায়ের তলাটি তুলোর থেকেও নরম। হঠাৎ বাৎসল্য-প্রেমময়ী মা যশোদার মনে হল কৃষ্ণের পা তুলোর চেয়েও নরম। আমারই ভয়ে সে ছুটছে। কৃষ্ণের পায়ে কতই না ব্যথা লাগছে। আমারই জন্য আমার প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ কষ্ট পাচ্ছে! তিনি কাঁদতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের গতি মন্থর হয়ে এল। কি আশ্চর্য! কৃষ্ণও আর ছুটতে পারলেন না।

মা চন্দ্রামণি ভয় পাচ্ছেন পাছে বনের হনুমান শিশু গদাইয়ের কোনও ক্ষতি করে বসে। তাই গদাইকে বারবার ডাকতে থাকেন তিনি। বনের বানর শিশু-গদাইকে সঙ্গে পেয়ে কেমন প্রাণের আনন্দে খেলা করছে!

।। গোচারণ ।।

Gocharan / herding of cows

গদাইয়ের বাল্যলীলা সত্যিই অতুলনীয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে বর্ণিত গদাইয়ের গোচারণের মধ্যে এমন দু-একটি ঘটনা পাওয়া যায় যেগুলি সম্ভবত অন্য কোনও গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায় না।

গ্রামের যত বালক প্রত্যেকেই গদাইকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। দুদণ্ড না দেখলে তারা গদাইয়ের কাছে ছুটে ছুটে আসে। শুধু খেলাধুলোই নয়, গদাইকে ছাড়া তাদের যেন কোনও কিছুই ভাল লাগে না। আর তাই তারা দিনরাত গদাইয়ের সঙ্গেই খাওয়াদাওয়া, ঘোরাফেরা ও খেলাধুলো করে। ক্ষুদিরাম এবং মা চন্দ্রামণি সব্বাইকে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। তাই তাঁরা প্রত্যেকদিনই গদাইয়ের সঙ্গে

গদাইয়ের সেথো-বালকদের ভোজন করাতেন। মা-চন্দ্রামণির রান্নার কথাও খুব চমৎকার এবং আশ্চর্যজনক। তিনি সামান্য পরিমাণে রান্না করলেও তা যেন ফুরোতে চাইত না। একমুঠো চাল রান্না করলেও তাতে যেন সবার খাওয়া হয়ে যেত। কিন্তু দেখা যেত মা-চন্দ্রামণির খাওয়া হয়ে গেলেই সব পাত্রগুলো খালি হয়ে যেত। তাই প্রায় সারাদিনই মা-চন্দ্রামণিকে রান্নাঘরে থাকতে হত।

Chandramani was able to feed many with little cooking Pg.13

‘সামান্য রাঁধিলে কভু ফুরাতে না চায়।
মুষ্টিক তণ্ডুলে গোটা ত্রিভুবন খায়।।’ (পৃঃ ১৩)

তাঁদের বাড়িটি পুরী অর্থাৎ জগন্নাথধামে যাওয়ার পথের ওপর। তাই রোজই সাধু, অতিথি, ফকিরের সমাগম লেগেই থাকত। একদিন শেষ বিকেলে অসময়ে দশজন সাধু এসে উপস্থিত হয়েছেন। ঘরে ভাত খুব অল্পই আছে দেখে চন্দ্রামণি কেঁদে আকুল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে রঘুবীর এবং মা শীতলাকে ডাকতে লাগলেন। তিনি ভাবছেন, তবে কী সাধুরা আজ অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যাবেন? এখন সাধুদের খাওয়াতে না পারার দুঃখে এবং লজ্জায় তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল।

To fed ten mendicants SChandramani's prayer to Raghuvir and Shitala Pg.14

‘বেশী অন্ন নাই ঘরে দেখি ঠাকুরানী।
অবিরল চোখে জল সভয় পরাণী।।
কম্পমান তনুখানি ভাবেন কি হবে।
না পাইয়া অন্নজল সাধু ফিরে যাবে।।’ (পৃঃ ১৪)

ঘরে চালও নেই যে আবার ভাত রান্না করে খেতে দেবেন। ঠিক এই সময় মা-চন্দ্রামণি অবাক হয়ে দেখলেন একটি আট-নয় বছরের ছোট মেয়ে আদুল গায়ে ডোরা-কাটা লাল শাড়ি পরে, মাথা-ভর্তি এলোমেলো কালো চুলের ঢাল হাঁটু ছাড়িয়ে, তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নিজের হাতদুটি নাড়ছেন আর এদিকে অন্ন-ব্যঞ্জন যা সামান্যমাত্র অবশিষ্ট ছিল, সব বহুগুণ বেড়ে যাচ্ছে। সেদিন থেকে মা চন্দ্রামণি

A nine year old girl waving her hands from behind Chandramani to increase the quantity of food

যতক্ষণ অন্নগ্রহণ না করতেন, ততক্ষণ তাঁর রান্নাঘরের কোনও খাবারই যেন ফুরোতে চাইত না। এরপর থেকে সব অতিথিদের এবং গদাই ও তার সঙ্গী বালকদের মা–চন্দ্রামণি মনের আনন্দে ভোজন করাতেন।

‘হেনকালে দেখিলেন আই ঠাকুরানী।
নবম–বয়সী এক বালিকা–রূপিণী।।

… … …

পাকশালে কোন দ্রব্য ফুরাতে না চায়।
যত আসে সকলেই খাইবারে পায়।।’ (পৃঃ ১৪) Pg.14

Draupadi's utensil for food from Sun God in Mahabharat

মহাভারতে দেখা যায় দ্রৌপদী সূর্যের কাছ থেকে এমন একটি পাত্র পেয়েছিলেন, যতক্ষণ তিনি অভুক্ত থাকতেন, ততক্ষণ ঐ পাত্রের খাবার ফুরোত না। পাণ্ডবদের বনবাসে থাকার সময় একবার দুর্যোধন দুর্বাসা মুনির কাছে প্রার্থনা জানালেন দ্রৌপদীর আহারের পর তাঁর কাছে সশিষ্য উপস্থিত হয়ে ভোজন করার জন্য। মুনি রাজি হলেন। এই মুনি ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী ও ক্রোধী এবং অল্পেই অভিশাপ দেন। দ্রৌপদীর খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর একদিন যথারীতি দুর্বাসা মুনি সব শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠিরাদির কাছে এসে ভোজন করবেন—এই কথা বলে স্নানাদি করতে গেলেন। তখন কাঁদতে কাঁদতে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, ‘হে মধুসূদন, তুমি বস্ত্রহরণের সময় আমার লজ্জা নিবারণ করেছিলে। এখন আমাকে তুমি এই লজ্জা, এই দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করো।’ স্মরণমাত্রই শ্রীকৃষ্ণ এসে উপস্থিত হয়ে বললেন : ‘দেখো দ্রৌপদী, আমার খুব খিদে পেয়েছে, কিছু খাওয়াও।’ দ্রৌপদী বললেন : ‘তুমি তো জান প্রভু, কেন তোমাকে ডাকছি। আজ কি মুনিদের কিছু খাওয়াতে পারব না ঠাকুর?’ শ্রীকৃষ্ণ বললেন : ‘তোমার পাত্রটি নিয়ে এসো।’ ‘হে প্রভু, তাতে কিছুই অবশিষ্ট নেই।’ ‘তুমি দেখই না। নিশ্চয়ই তাতে কিছু না কিছু আছেই।’ দ্রৌপদী দেখলেন পাত্রে খাবারের সামান্য কণামাত্র লেগে আছে। সেইটি এনে শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেইটি মুখে দিয়ে বললেন : ‘যারা ভোজন করার অভিপ্রায় নিয়ে আজ এখানে এসেছে, তাদের সকলের ক্ষুৎপিপাসা তৃপ্ত হোক।’ এরপরে সশিষ্য দুর্বাসা মুনি দ্রৌপদীর কাছে না এসে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে তাঁর নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

গদাধর–জননী মা চন্দ্রামণি সব অতিথিকে এবং গদাইয়ের সঙ্গী বালকদের মনের আনন্দে ভোজন করাতেন। গদাইয়ের সঙ্গী বালকেরা কেউ তেলি, কেউ বেনে, কেউ বা অতি দুঃখী ঘরের ছেলে। তাই রোজই তাদের গরু চরাতে যেতে হত। তারা মাঝে মাঝেই শিশু গদাইকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে গিয়ে মহানন্দে নানারকম খেলা করত। সাধারণ বালকেরা যেসব খেলা খেলে, সেসব খেলা গদাইয়ের ভাল লাগত না। কখনও কখনও তাঁর মনে পড়ত ব্রজলীলার কথা। আর সঙ্গীদের সঙ্গে সেইরকম খেলাই তিনি খেলতেন।

Vraja lila with other cow heard boys Pg. 14

‘সাধারণ বালকের খেলা যেই মত।
সে খেলা খেলিতে তাঁর ভাল না লাগিত।।

… … …

ব্রজ খেলা গদায়ের হয় যেন মনে।
সেই সেই মত খেলা হয় সঙ্গী–সনে।।’ (পৃঃ ১৪) Pg. 14

গোচারণের মাঠে গিয়ে গদাই ব্রজের রাখাল হয়ে যান। সঙ্গে জুটেছে সব সঙ্গী বালকেরা। কেউ হচ্ছে সুবল, কেউ শ্রীদাম, কেউ কেউ বা দাম বসুদাম। আর যে গদাই সেই তো বংশীধর—সেই তো কানাই। চরতে চরতে কাছে আসে গরুর পাল। গদাই নিজের হাতে তাদের নরম ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়ান। কখনও বা লাফিয়ে লাফিয়ে গাছের ঝুরি ধরে দোল খান। কখনও বা পুকুর–পাড়ে কাপড় ছেড়ে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েন পুকুরে। কোঁচড়ে করে মুড়ি খান। খেতে খেতে নাচেন–হাসেন। কখনও বা মুখ দিয়ে নানারকম আনন্দ–প্রকাশক শব্দ

করেন। মা–বাবা গদাইকে দূরের মাঠে বা বনে যেতে মানা করলেও তিনি তা শুনতেন না।

Ecstatic episode in the midst of cow heard boys while eating with them

একদিন রাখাল–বালকেরা গদাইকে নিয়ে একটি গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করে মুড়ি খাচ্ছে। তাই দেখে গদাইয়ের ব্রজভাবের উদ্দীপন হয়ে ভাবসাগর যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ভাবাবেশ সামলাতে না পেরে তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে দেহপিঞ্জর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে । রাখাল–বালকেরা গদাইয়ের এই অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে বারবার নাম ধরে ডাকতে থাকে। তারা জানত গদাইকে মাঝে মাঝে ভূতে পায়। তাই তারা আর অন্য কোনও কিছু উপায় না দেখে জোরে জোরে রাম–নাম করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে গদাইকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে সবাই যেন প্রাণ ফিরে পেল। জন্ম থেকেই গদাইয়ের মধ্যে মাঝে মাঝেই মহাভাবের প্রকাশ ঘটত।

গদাই ছিলেন শ্রুতিধর। গ্রামের যেখানেই ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ বা যাত্রাগান হোক না কেন গদাই তাঁর বালক বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে সেসব জায়গায় অবশ্যই যেতেন। একবারমাত্র শুনেই বড় বড় পালাগান, কীর্তন বা ভাগবত অথবা রামায়ণ সমস্তই আজীবন গদাইয়ের মনে গাঁথা হয়ে থকত।

Mathur song in the mango groove

একদিন বাড়ুজ্যেদের আমবাগানের মাঠে গরু চরাচ্ছে সকলে। হঠাৎ গদাই বললেন, আয় সবাইমিলে আমরা আজ মাথুর গান গাই। সব্বাই এককথায় রাজি। গাছের তলায় যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। আজ কৃষ্ণ নেই। আজ রাধিকা কৃষ্ণবিরহিণী। কৃষ্ণ দেখেছিস এত দিন। আজ দেখ রাই–কমলিনীকে। মাথুর–বিরহের গান ধরল গদাই। সৃষ্টির মহামৌনের মাঝে যে শাশ্বত কান্না লুকিয়ে আছে, গদাই আপন হৃদয়–নিঙড়ে তা উৎসারিত করে দিল। কোথায় তুমি কৃষ্ণ! কোথায় হে প্রাণনাথ! কবে আমার এই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ মিলবে গিয়ে তোমার নির্বিকল্প নির্বাণহীনতায়?

‘বলেন রাখালগণে এস এস ভাই।
মাথুর বিরহ–গান সবে মিলে গাই।।’ (পৃঃ ১৫)

গাইতে গাইতে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল গদাই। চোখের জলে সমস্ত কাপড় ভিজে গেল। বাহ্যচৈতন্য রইল না। সঙ্গীরা অস্থির হয়ে পড়ল। কেউ গায়ে ঠেলা দেয়। কেউ বা চোখে–মুখে জল ছিটায়। কেউ কেউ বা কি করবে বুঝতে না পেরে কাঁদতে থাকে। একজন সঙ্গী–বালক কানের কাছে মুখ এনে বলে ওঠে—কৃষ্ণ কৃষ্ণ! হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ!

যে নামে বাহ্যচৈতন্য লোপ, সেই নামেই আবার প্রাণসঞ্চার। যে নামে বৈরাগ্য, সেই নামেই আবার প্রেম। প্রাণ–সঞ্চারিণী–মন্ত্র কৃষ্ণনাম শুনে গদাই বলে ওঠেন কোথায় কৃষ্ণ! ভাবে বলছেন, ঐ দাঁড়িয়ে আছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ প্রাণনাথ—আবেশে হাত বাড়িয়ে যেন ধরতে চান। কৃষ্ণ–নামে গদাইয়ের চৈতন্য এল দেখে সকলে তাঁকে ঘিরে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে থাকে। গদাইকে একটু সুস্থির হতে দেখে গোধূলিতে তারা সকলে ধেনুর পাল ঘরে ফিরিয়ে আনে।

ছোট্ট কৃষ্ণকেও দেখা যায় গোপবালকদের সঙ্গে গোচারণে যাবার জন্য ছটফট করছেন। মা–যশোদার কৃষ্ণকে গোচারণে পাঠাতে খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কেননা তাঁর প্রাণের গোপাল বড্ড ছোট্ট। তাই যশোদা শ্রীদাম, সুদামকে ডেকে বললেন : ‘তোরা বাবা যশোদা–মায়ের একটা কথা রাখিস। বনের মধ্যে বেশিদূর যাসনি যেন। পথে কত কুশাঙ্কুর আছে। গোপালের রাঙা তুলতুলে পায়ে যেন ফুটে না যায়, দেখিস বাবা। আর বাবা, কৃষ্ণকে বনের মধ্যে যেন একা ছাড়িসনে। তোদের মাঝখানে নিয়ে চলিস।’ গোষ্ঠে গিয়ে গরুগুলোকে নিজেদের মতো চরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিয়ে গোপবালকেরা নিজেরা খেলায় মেতে উঠত।

কৃষ্ণ–বলরাম ও অন্যান্য গোপবালকেরা কখনও বাঁশি বাজান, কখনও বা গুলতি দিয়ে বেল, আমলকী দূরে ছুঁড়ে দেন। কখনও বা

নাচেন। ময়ূর, হাঁস, বানর প্রভৃতির ডাক অনুকরণ করে তাঁরা প্রাকৃত বালকের মতো খেলা করতেন।

কোনও কোনও দিন গোপবালকেরা সবাই মিলে কৃষ্ণকে রাজা সাজাত। ফুলের সিংহাসন তৈরি করে তাতে কৃষ্ণকে বসাত। ফুলের সিংহাসন আলো করে বসে থাকতেন কৃষ্ণ। সর্বাঙ্গে ফুলসাজে তাঁর রূপের সীমা থাকত না। বাঁশি তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াতেন। কচি কিশলয়ের মতো আঙুল—কেঁপে কেঁপে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত বাঁশির ছিদ্রগুলিকে। আর আকাশে-বাতাসে একটি অপূর্ব ঐশ্বরীয় সুরমূর্ছনা ঝঙ্কৃত হয়ে সবাইকে নির্বাক করে দিত। এমনকী মনে হত যেন যমুনা উজানে বইছে। কুঁড়ির পাপড়ি খুলে চারিদিক গন্ধে ম-ম করছে। আর ভ্রমরের দল তারা কি গুঞ্জন ভুলে গেল? এই সময় তারা কোথায়? তাদের যদি খুঁজতে যাই, তাহলে দেখব গানে-গন্ধে ভ্রমরের দল ফুলের বুকে মুখ রেখে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে গোধূলি এসে হাজির। শেষ বিকেলের বিদায়ী সূর্যের নরম উদাস আলোয় চারিদিকে যেন একটা মায়াঘোর। গোচারণের গাছগাছালির মধ্যে কোথাও একটা ক্লান্ত পাখি ভারি চমৎকার ভাবে ডাকছে। ডাকটা যেন একেবারে ‘তেহাইয়ের বোল’ তুলেছে—ধা-ধা-ধিন্-ধা। গাছের পাতার শিরশিরে আওয়াজ আর পাখির কাকলিতে গোধূলি-সঙ্গীতের আসরটা বেশ জমে উঠেছে।

এই সময় কৃষ্ণের হঠাৎ মনে পড়ে যায় মায়ের কথা। মা-যশোদা দু-চোখভরা আকূতি নিয়ে পথপানে চেয়ে বসে আছেন। ছোট্ট কৃষ্ণের মন কেমন করে ওঠে। তখনই বাঁশি তুলে নিয়ে সমস্ত ধেনুর নাম ধরে তাঁর বাঁশি বাজাতে থাকেন। সব গরুগুলি বাঁশিতে তাদের নাম শুনে পিঠের ওপর লেজটি তুলে ছুটে এসে কৃষ্ণের চারপাশে জড়ো হয়। এবার বাড়ি ফেরার পালা। তারা এসে পৌঁছায় নন্দ-ভবনে। মা-

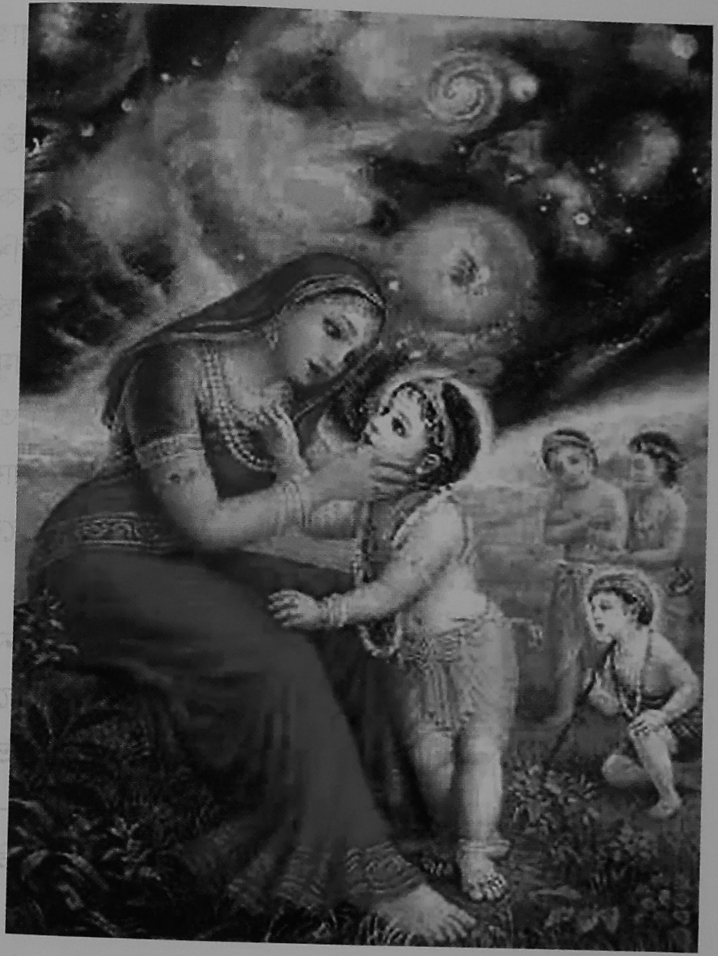

মাটি খাওয়ার ছলে মা যশোদাকে
বালক শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন (পৃঃ ৪২)

স্বামী বিবেকানন্দ (পৃঃ ৫২-৫৩)

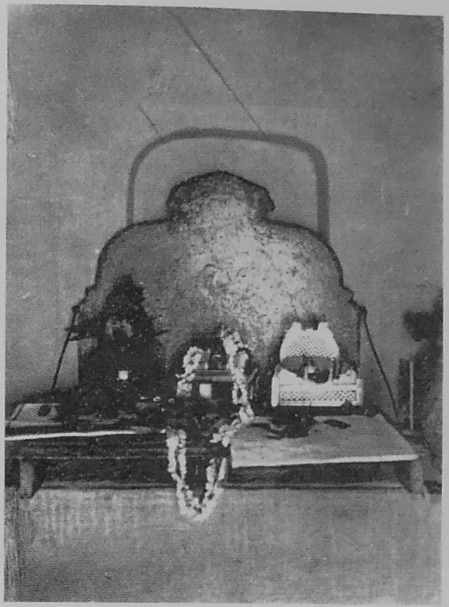

রঘুবীর, মা শীতলা এবং রামেশ্বর শিবলিঙ্গ (পৃঃ ৫৪-৫৫)

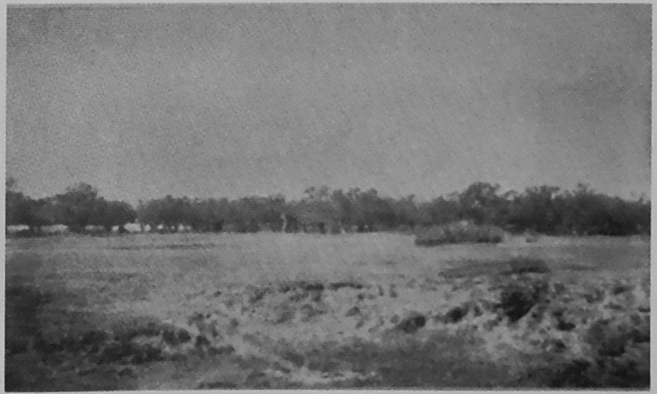

মানিক রাজার আম্রকাননে কে ঐ শিশু খেলে দিব্য আননে? (পৃঃ ৭০-৭১)

মানিক রাজার আমবাগান-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ
ধানক্ষেত (পৃঃ ৭২-৭৩)

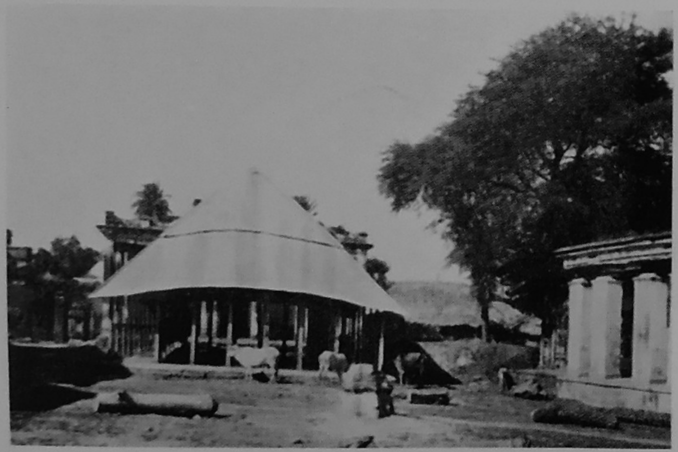

সাধুদের অতিথিশালা এবং বালক গদাধরের পাঠশালা (পৃঃ ৮২-৮৩)

যশোদার হাতে দীপ। কিন্তু সেই দীপের আলোর চেয়েও অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে মা-যশোদার স্নেহভরা চোখ দুটি।

কোনও কোনও দিন গদাই এবং তাঁর সঙ্গীরা মিলে জনশূন্য প্রান্তরে সংকীর্তন করতেন। নামের ধ্বনিতে ভেদ হত অখণ্ড আকাশ।

নাম কি কম? যা নাম তা-ই তো রাম। সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে সোনাদানা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ওজন করছিলেন তখন হল না। কিন্তু রুক্মিণী যখন একদিকে তুলসী আর কৃষ্ণনাম লিখে দিলেন তখন ঠিক ঠিক ওজন হল। নামের এমনই মহিমা। তবু নামের সঙ্গে অনুরাগ চাই। যে প্রিয় তাকে শুধু নাম-ধরে ডাকলেই হয় না, তার সঙ্গে একটু প্রেম চাই। যদি নাম করতে করতে দিন-দিন অনুরাগ বাড়ে, আর অনুরাগের সঙ্গে আনন্দ—তাহলে আর ভয় নাই। বিকার কাটবেই কাটবে। আর তারপরে? তার পরেই তিনি জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আধারিত হবেন।

Samkritan in the open field Pg.15

'কোন কোন দিন মাঠে হত সংকীর্তন।
নাম-নাদে হত ভেদ অখণ্ড গগন।।' (পৃঃ ১৫)

শিশুরূপী ভগবান শিশুদের সঙ্গে কামারপুকুরে কতই যে খেলা করলেন! গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে বাঁড়ুয্যেদের আমবাগানটি ছিল তাঁর গোচারণ স্থান। প্রান্তর-মধ্যে এই জায়গাটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং নির্জন। এই আমবাগানের গাছগুলির ফাঁক দিয়ে দূরে—বহু দূরে তাকালে দেখা যেত বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম। যেগুলিকে হঠাৎ দেখলে মনে হত যেন সবুজ সাগরে ভাসমান ছোট ছোট এক একটি দীপ। বিশুদ্ধ-বাতাস, প্রান্তরের সবুজের সুন্দর ছবি, প্রান্তরের মাথার কাছ দিয়ে ধীরে ধীরে অবিরাম গতিতে বয়ে চলা ভূতির খাল। গাছের মাথায় মাথায় বিচিত্র পাখির কলতানে মুখর হয়ে ওঠা বৃক্ষলতাদি ঘেরা এই জায়গাটি—'মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে, সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।' সেই আকাশ—নীল আকাশ এবং তার

মধ্যে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল মেঘপুঞ্জের মায়ারাজ্য সৃষ্টি—যা মনকে এক অচেনা স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। গ্রামের খুব কাছেই এই নির্জন জায়গাটিতে ছিল ছোট ছোট আমগাছে সাজানো খুব সুন্দর এই আম্রকাননটি। এই গাছগুলির কাণ্ড ও শাখা অর্থাৎ গাছগুলির ডালপালা এমনভাবে বেঁকে ঝুলে রয়েছে যে খুব অল্পবয়সের বালকেরাও ঐসব গাছগুলিতে উঠতে পারে। বালক গদাইয়ের সঙ্গীসাথীরাও তো বালক। বাগানের আমগাছগুলিও যেন তাদেরই মাপমতো ছোট ছোট। মহাভাগ্যবান এই মানিকচন্দ্র। কেননা তাঁর এই বাগানটিই ছিল ভগবানের বাল্যলীলার স্থান। প্রভু এখানে খেলবেন—এটি আগে থেকে জেনেই যেন এই বাগানটি তিনি তৈরি করেছিলেন।

‘গ্রামের অনতিদূর বড়ই নির্জন। Pg. 15
ছোট ছোট আম-গাছে বাগিচা শোভন।।’ (পৃঃ ১৫)

Bhursuvo village / gram - Manik raja's [Manikchandra Bandyopadhyay] mango groove

আগেই ভুরসুবো গ্রামের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সেই গ্রামের উদার প্রকৃতির ধনাঢ্য তালুকদার মানিক রাজার কথাও বলা হয়েছে—যিনি তাঁর দান-ধ্যান এবং গরিব-দুঃখীর সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করে দিয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁর নাম মানিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও, দূরের এবং আশপাশের গ্রামে তিনি মানিক রাজা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। বহুবার তিনি লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়েছেন। বিরাট এক আম্রকানন তিনি যেমন তৈরি করেছিলেন তেমনই সুখসায়ের, হাতিসায়ের নামে বড় বড় দুটি দীঘি আজও তাঁর কীর্তির কথা ঘোষণা করছে। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে অতিথি-সেবা করতেন। তাঁর ভগবানের ওপর গভীর ভক্তি, অনুরাগ ও প্রীতি সাধারণ মানুষকে খুবই আকৃষ্ট করত। তিনি মানুষের দুঃখ-দারিদ্র অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে দূর করতেন। বিষয়-সম্পত্তি থেকে তাঁর যা আয় হত তার প্রায় সবটাই তিনি অতিথি-বৈষ্ণব ও আর্তের সেবায় খরচ করতেন। কামারপুকুরে

যেসময় শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যলীলা করেন, তার কিছু আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন, এইরকম একটা জনশ্রুতি আছে। আবার কেউ কেউ বলেন, তখনও তিনি বেঁচে ছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই শ্রী রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ও দাদার মতোই ধার্মিক। আর তাঁদের বাড়ির প্রত্যেকেই পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।

গদাই যখন নিতান্তই শিশু, তখন একবার বাবার সঙ্গে মানিকরাজার বাড়িতে গিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি বহুবার ঐ বাড়িতে গিয়েছেন। ঐ পরিবারের মায়েরা ও মেয়েরা ছোট্ট গদাইকে পেলে খুবই আনন্দিতা হতেন। স্বয়ং ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করলে ঐশ্বরিক আনন্দে মন-প্রাণ পূর্ণ হয়ে যায়। প্রাণের মধ্যে একটা আনন্দস্রোত বইতে থাকে। আর এখানেও ঠিক সেই রকমটিই হয়েছিল। যখনই ঐ বাড়ির মায়েরা গদাইকে কোলে নিতেন তখনই তাঁদের মনপ্রাণ এক অপার্থিব ঐশ্বরিক আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠত। তাঁদের হৃদয়ে অপার আনন্দের স্রোত বইত। মনে রাখা দরকার যে, কেবলমাত্র শুদ্ধ প্রেমবান ভক্তেরাই শ্রীভগবানের মাধুর্য পূর্ণভাবে আস্বাদন করতে সমর্থ হন। একবার মানিকরাজার স্ত্রী নানারকম স্বর্ণালঙ্কার তৈরি করিয়ে বাড়ির মেয়েদের দিয়ে গদাইকে মনের মতো করে সাজিয়েছিলেন। এই ছোট্ট গদাইয়ের দুটি আয়ত-উজ্জ্বল চোখ—যে চোখে শাশ্বত শান্তি আর অসীম সরলতা। মাথাভরা এলোমেলো চুল। মুখে অমিয় মধুর হাসি। কণ্ঠস্বর যেন মধুমাখা। যেই গদাইকে দেখে সেই তাকে ভালবাসে। কেননা তার মধ্যে এমন একটি আকর্ষক শক্তি ছিল, যেটিকে কেউই উপেক্ষা করতে পারত না। একবার তার দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানোর উপায় থাকত না। ভাল কিছু খাবার পেলে সকলের ইচ্ছে হয় গদাইকে সেটি খাওয়াবার। শুধু কি তাই! ইচ্ছে করে সবসময় গদাইয়ের কাছে বসে তার দুটি কথা শুনতে। তাঁর কথাগুলি আধো-আধো ভাবে উচ্চারিত হত বলে অত্যন্ত সুন্দর শোনাত। বিস্তীর্ণ সবুজ

মাঠে ঘুরে বেড়াতে পেলে ছোট্ট গদাই মহা খুশি। যা কিছু সুন্দর তারই ওপর তাঁর টান। মানিকরাজার ভাই রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুদিরামকে বলতেন : ‘সখা, তোমার পুত্রটি সামান্য নহে, ইহাতে দেব-অংশ বিশেষভাবে বিদ্যমান বলিয়া জ্ঞান হয়! তুমি যখন এদিকে আসিবে, বালককে সঙ্গে লইয়া আসিও। উহাকে দেখিলে পরম আনন্দ হয়।’

Brother of Manikraja's has very high spiritual opinion on Gadahar

‘পরে তাঁর সহোদর উত্তরাধিকারী।
যেমন অগ্রজ তাঁর ধর্মে মন ভারী।।’ (পৃঃ ১৬)

Pg. 16

কিছুদিন গদাইকে না দেখতে পেলে লোক-পাঠিয়ে গদাইকে তাঁদের বাড়িতে আনাতেন। মাঝে মাঝেই ঐ বাড়ির মহিলারা প্রত্যেকে হাতে কিছু মিষ্টি নিয়ে বলতেন : ‘বলো, তুমি কারটি নেবে?’ গদাইও লাফ দিয়ে দিয়ে সবারই হাত থেকে মিষ্টি কেড়ে খেতেন।

‘নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া।
প্রভুর বদনে দিত গদ্‌গদ হৈয়া।।
কখন মিষ্টান্ন হাতে প্রত্যেক রমণী।
গদাধরে বলিতেন কার লবে তুমি।।
শিশুমতি গদাধর করি লম্ফ দান।
হাতে করি সকলের মিষ্টি কাড়ি খান।।’ (পৃঃ ১৬)

Pg. 16

ঠিক এইরকম ঘটনা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরও কাড়াকাড়ি করে খাওয়ার ঘটনা আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতেও পাই। একদিন গোপবালকেরা গোচারণে গিয়ে খুবই ক্ষুধার্ত হয়ে কৃষ্ণকে বললেন : ‘দেখো, তুমি আমাদের রাখাল-রাজা। তুমি তো অনেক অসুর বধ করে আমাদের রক্ষা করেছ। এখন খিদেয় আমাদের প্রাণ যায়। এখন আমাদের এই ক্ষুধাসুরকে বধ করে আমাদের প্রাণে শান্তি এনে দাও।’ আজ কৃষ্ণ ঠিক করেছেন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীদের বিশেষ কৃপা করবেন। তাই বললেন : ‘শোনো সখাগণ, ঐ যে অদূরে ব্রাহ্মণেরা আঙ্গিরস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন, ওখানে আমার নাম করে অন্ন চাইবে।’ মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ-বুদ্ধি করে গোপবালকগণকে তুচ্ছ করলেন। অন্ন দিলেন না।

এই প্রসঙ্গে মহাভারতের একটি কাহিনী উল্লেখ করা যায়। ভগবানের অচিন্ত্যলীলা। অমঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তিনি পরম মঙ্গলের সূচনা করে থাকেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডব বংশ সমূলে ধ্বংস করার জন্য অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের একমাত্র সন্তান পরীক্ষিতের ওপর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন। পরীক্ষিত তখন মাতৃগর্ভে ছিলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দৈবীশক্তির প্রভাবে সেই ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যর্থ করেছিলেন। সেই-সময় মাতৃগর্ভেই পরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন হয়। মানুষ দেখলেই অভিমন্যু-পুত্র ‘এই কি সেই মাতৃগর্ভে দৃষ্ট-পুরুষ’—মনে করে পরীক্ষা করতেন। তাই তিনি পরীক্ষিৎ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অশেষ গুণসম্পন্ন, পরম ভাগবত, মহারাজ বলির মতো ধৈর্যশালী, প্রহ্লাদের মতো কৃষ্ণ-ভক্ত। মুনি-ঋষি এবং গুরুজনদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন প্রজাবৎসল। এমন যে সর্বগুণান্বিত মহারাজ পরীক্ষিৎ, তিনিও জীবনে ঐ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের মতো একটি ভুল করে বসলেন। আর সেই ভুলই হল তাঁর জীবনের কাল। একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ বনে মৃগয়া করতে গিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে শমীক মুনির আশ্রমে গিয়ে জল চাইলেন। শমীক মুনি তখন ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। তাই মহারাজের আগমন তিনি বুঝতে পারেননি। কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল! মহারাজ ভাবলেন মুনি তাঁকে অবজ্ঞা করছেন। তাই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর মহারাজ অত্যন্ত রেগে গিয়ে একটা মরা সাপ মুনির গলায় জড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন। শমীক মুনির বালক-পুত্র শৃঙ্গী বন্ধুদের কাছে তাঁর পিতার প্রতি মহারাজ পরীক্ষিতের দুর্ব্যবহারের কথা শুনে খুব রেগে গিয়ে রাজাকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন। বললেন : ‘সাত দিনের মধ্যে রাজা তক্ষকের দংশনে দেহত্যাগ করবেন।’ ধ্যান থেকে উঠে শমীক মুনি যখন শুনলেন যে

তাঁরই পুত্র শৃঙ্গী, মহারাজকে অভিশাপ দিয়েছে, তখন তিনি হায় হায় করে উঠলেন। পুত্রকে বললেন : ‘করেছ কি? মহারাজ প্রজাপালক, ধর্মের রক্ষক, ভক্তচূড়ামণি, সর্বোপরি তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়। মহারাজকে অভিশাপ দিয়ে তুমি অত্যন্ত অন্যায় করেছ।’ এদিকে মুনির গলায় মরা সাপ জড়িয়ে দেওয়ার ঠিক পরেই মহারাজ পরীক্ষিতের তৃষ্ণা একেবারে চলে গিয়েছিল। তখন তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করতে লাগলেন। বারবার ভাবতে লাগলেন আমি অত্যন্ত মূর্খের মতো পাপাচরণ করেছি। আমার শাস্তি হওয়া বিধেয়। এই যে একটা মস্ত বড় বিপর্যয় পরীক্ষিতের জীবনে ঘটে গেল, এরকম হওয়ার তো কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। একে পরীক্ষিৎ পরম ভক্ত এবং মুনি-ঋষি ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাবান। ভগবান—তাঁর কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য পরম ভক্ত পরীক্ষিৎকে দিয়ে এই অন্যায়ের অভিনয় করালেন এবং তার ফলে জগৎ ভাগবতরূপ এক অমূল্য সম্পদ লাভ করে ধন্য হল।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও দেখা যায়—মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণকে মানুষবুদ্ধিতে গোপবালকগণকে তুচ্ছ করলেন। খাবার দিলেন না। সব শুনে রাখালরাজা গোপাল, মুচকি হেসে গোপবালকদের বললেন : ‘তোমরা ব্রাহ্মণ-পত্নীদের কাছে গিয়ে বলো যে, দাদা ও আমি এখানে আছি। তাঁরা সবসময় আমার কথা চিন্তা করেন। কাজেই তোমাদের আর কিছু চাইতে হবে না। ওঁরা আমার কথা শুনেই তোমাদের প্রচুর খাবার দেবে। গোপবালকেরা ব্রাহ্মণদের বাড়ির অন্তঃপুরে গিয়ে দেখল যে ব্রাহ্মণীরা কৃষ্ণের কথাই আলোচনা করছেন। ঐ আলোচনার সময় ব্রাহ্মণীদের অশ্রুবিসর্জন, পুলক ইত্যাদি সাত্ত্বিক বিকারগুলি দেখা যাচ্ছিল। ক্ষুধিত কৃষ্ণ এত কাছে আছেন শুনে তাঁরা আর দেরি না করে সবরকম বাধা উপেক্ষা করে থালায় থালায় বিভিন্ন রকম খাবার নিয়ে আসামাত্রই, কৃষ্ণ গোপবালকদের বললেন : ‘এসো ভাই, এই খাবার আমরা সবাই মিলে খাই’—বলেই থালাগুলি কেড়ে কেড়ে নিয়ে আনন্দের সঙ্গে খেতে লাগলেন। ব্রাহ্মণীরা অত্যন্ত পুলকিত হয়ে তাঁদের খাওয়া দেখতে লাগলেন। এবারে শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে দেখে মনে হচ্ছে যেন মানিক রাজার বাড়ির রমণীরা নিশ্চয়ই সেই সব যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীই, যাঁরা আবার প্রভুর সঙ্গে লীলা করবার জন্য এসেছেন।

জীবনে কখনও কখনও এমন সময় আসে, এমন মুহূর্তের সন্ধান মেলে, যখন কথা মুখ থেকে বেরোলেই মনে হয়, এই অপরূপ মুহূর্তটির যাদু বোধহয় কেটে যাবে—এর পবিত্রতায় ব্যাঘাত ঘটবে। হৃদয়ের মণিকোঠায় এক ঐশ্বরীয় আনন্দের প্রবাহ যেন ওপরের দিকে ধাক্কা দেয়। সেটাকে একটু প্রশ্রয় দিলেই প্রেমাশ্রু হয়ে চোখ দিয়ে গড়িয়ে সব ভাসিয়ে দেবে। ঠিক যেমন হয়েছিল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীদের অথবা মানিক রাজার বাড়ির রমণীদের।

ভগবান তাঁর কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরম ভক্ত পরীক্ষিৎকে দিয়ে শমীক মুনির মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়েছিলেন। কোথা থেকে যেন পরীক্ষিতের মধ্যে একটা কাল-পিপাসা এসে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তুলেছিল।এই পিপাসা কিন্তু সাধারণ নয় এবং ঋষির মর্যাদা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিও পরীক্ষিতের নিজের নয়। মরা সাপ মুনির গলায় জড়িয়ে দেওয়ার পরই তাঁর এই কাল-তৃষ্ণা একেবারে চলে গিয়েছিল। তাঁর পাপ আচরণের জন্য তিনি অনুতাপ করছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন গিরিশবাবুর থিয়েটারে গেছেন; সেদিন গিরিশবাবু নেশার ঝোঁকে ঠাকুরকে অনুচিতভাবে গালাগালি করে একরকম তাড়িয়েই দিলেন। যাঁরা সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা গিরিশবাবুর ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ঠাকুরকে বললেন—আপনি আর কখনও ঐ মাতালটার কাছে যাবেন না। পরদিনও দক্ষিণেশ্বরে ঐ কথাই হচ্ছিল। এমন সময় রামবাবু দক্ষিণেশ্বরে আসতেই ঠাকুর

পূর্বদিনের ঘটনা বিবৃত করে বললেন—রাম, তুমি কি বল? রামবাবু বললেন—দেখুন, কালিয় নাগ শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিল—প্রভু তুমি আমায় বিষ দিয়েছ, এখন আমি অমৃত কোথায় পাব? তুমি যা দিয়েছ তাই দিয়েই তো তোমার অভ্যর্থনা করেছি। রামবাবুর কথা শুনে ঠাকুর বললেন—তবে চলো তোমার গাড়িতেই একবার গিরিশের কাছে যাই। এদিকে গিরিশবাবুর নেশা কাটতেই তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে আহারাদি ত্যাগ করে কাঁদছিলেন। ঠাকুরকে হঠাৎ অযাচিতভাবে আসতে দেখে গিরিশ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাতরস্বরে বললেন—আজ যদি তুমি না আসতে তাহলে বুঝতাম যে, নিন্দা ও স্তুতিতে তোমার এখনও সমজ্ঞান হয়নি, তুমি এখনও পরমহংস নামের যোগ্য নও। এখন বুঝেছি তুমি সেই, তুমি সেই; আর আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না! এবার আমি তোমায় ছাড়ছি না। বলো, তুমি আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে। কৃষ্ণ-অবতারে যা ঘটেছিল, ভিন্ন পরিস্থিতিতে রামকৃষ্ণ-অবতারে তা-ই ঘটল! গিরিশবাবু সেদিন ঠাকুরকে কালিয়নাগের মনের ভাবই ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন।

পরীক্ষিৎ যখন শুনলেন যে তাঁর আর মাত্র সাতদিন আয়ু আছে, তখন তিনি তাঁর পুত্র জন্মেজয়ের ওপর রাজ্যভার দিয়ে গঙ্গার তীরে গিয়ে প্রায়োপবেশনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করতে লাগলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ রাজ্য ত্যাগ করে চলে যাওয়াতে চারিদিকে মহা হৈচৈ পড়ে গেল। প্রজাবৃন্দ মহারাজের প্রশংসা করতে লাগলেন। চারিদিক থেকে ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি সব দলে দলে গঙ্গার তীরে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা ভাবছেন, মুনি-বালকের কৃপায় আজ কত শত মুনি-ঋষিরা এখানে উপস্থিত হয়ে অযাচিতভাবে আমাকে পবিত্র করছেন। আজ আমার মতো ভাগ্যবান জগতে আর কে আছে? রাজা পরীক্ষিৎ মুনি-ঋষিদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনাদি করে তাঁদের বসতে অনুরোধ করলেন। সমাগত ঋষিরা ভাবলেন যে, পরীক্ষিৎ হচ্ছেন কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি। তাঁর জন্মের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ করেছিলেন। মৃত্যুর সময় কি শ্রীভগবান তাঁর একান্ত ভক্তকে ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত করতে আসবেন না? ঋষিরা মনে করছেন—আজীবন কঠোর সাধনা করেও যাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ভাগ্যে ঘটেনি, মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে থেকে আমরাও অনায়াসে তাঁর দর্শন হয়তো পাব। তাঁরা ঠিক করলেন, যতদিন পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশন করবেন, তাঁরাও ততদিন পরীক্ষিতের সঙ্গে গঙ্গাতীরে অবস্থান করবেন।

সেই সময় আজন্ম সংসারমুক্ত পরমহংসচূড়ামণি শুকদেব নিজের ইচ্ছায় ঘুরতে ঘুরতে সেই গঙ্গাতীরে এসে উপস্থিত হলেন। ছাইচাপা আগুনের মতো গুপ্ততেজসম্পন্ন শুকদেবকে চিনতে পেরে নিজেদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঋষিরা তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। আর রাজা পরীক্ষিৎ নিজে মাথায় করে পুজোর সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে শুকদেবকে আসনে বসিয়ে পুজো করে বললেন : ‘আমার মৃত্যু আসন্ন। এই সময় আমার কি করা উচিত ও আমার কি শোনা উচিত যাতে এই সাত দিনের মধ্যেই আমি কৃতকৃত্য হতে পারি, সে-সম্বন্ধে কৃপা করে আমাকে বলুন।’ পড়ন্ত বিকেলের অস্তমিত সূর্যের শেষ রশ্মি গঙ্গার জলকে রক্তিম করে তুলেছে। গঙ্গাতীরের গাছগুলির মাথায় মাথায় সোনালী আবির ছড়ানো। সেই সময় ব্রহ্মানন্দে বিভোর মৌনি শুকদেব তাঁর মৌনতা ভেঙে বললেন : ‘হে রাজন! তুমি যে প্রশ্ন করলে সেটি খুবই ভাল প্রশ্ন, কেননা, তোমার প্রপিতামহ অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তা জগৎ সম্বন্ধে। কিন্তু তুমি যে প্রশ্ন করলে, সেটি জগৎপতির সম্বন্ধে। সেদিক থেকে তোমার প্রশ্নটিই শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন।’

একদিন পাণ্ডব-জননী কুন্তি শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন : ‘দেবকী মহাভাগ্যবতী—কেননা তিনি তোমাকে পুত্ররূপে পেয়েছেন। তা ছাড়া বিপদের সময় তাঁর স্বামী বসুদেব সবসময় তাঁর পাশেই ছিলেন। কথায়

বলে—যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন। এই প্রবাদবাক্যটি তুমি আমার জীবনে বারবার প্রমাণ করেছ।'

এখন প্রশ্ন দেবকী এবং বসুদেব এঁরা কারা? নন্দ এবং যশোদা—কোন পুণ্যকর্মে কৃষ্ণের বাৎসল্যপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলেন? এঁরাই বা কে? কৃষ্ণ যখন চতুর্ভুজ-মূর্তিতে কংসের কারাগারে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন দেবকী ও বসুদেবের মধ্যে ভগবানের ঐশ্বর্য-জ্ঞান এবং বাৎসল্যপ্রেম দুটিই একসঙ্গে দেখা দিয়েছিল। আর তাই দেবকী কৃষ্ণকে বলেছিলেন : 'হে বিশ্বাত্মা! তুমি এই অলৌকিক রূপ সংগোপন করো। অলৌকিক রূপ কেন? কেননা এই রকম সর্বালঙ্কারভূষিত হয়ে চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী হয়ে কোনও সন্তান মায়ের গর্ভ থেকে প্রসূত হয় না।' তখন কৃষ্ণ দেবকীকে বললেন : 'মাগো, আমার জন্মকথা তোমাদের খুলে বলি। পূর্বজন্মে তুমি ছিলে পৃশ্নি-নামে এক নারী, আর বসুদেব ছিলেন নিষ্পাপ প্রজাপতি সুতপা। সেই জন্মে তোমরা কঠোর তপস্যা করে আমার মতো পুত্র চেয়েছিলে। তখন তোমাদের তপস্যা এবং অবিচল ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে বর দেবার জন্য এই রূপেই তোমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলাম। সেটি তোমাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই আবারও সেই রূপেই তোমাদের সামনে এসেছি।'

শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা, বসুদেব এবং দেবকীও যা লাভ করতে পারেননি, কৃষ্ণের অনুপম সেই বাল্যলীলা নন্দ-যশোদা দেখতে পেলেন—কী এমন পুণ্যকর্ম তাঁরা করেছিলেন? ব্রহ্মনিষ্ঠ শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে ভাগবত বর্ণনা করছেন। ভগবানের লীলাকথায় তাঁর মন এত তন্ময় হয়ে গেছে যে, তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে। সেই সময় পরীক্ষিৎ যখন প্রশ্ন করছেন তখন সেই প্রশ্ন যেন ক্ষীণ ধ্বনির মতো তাঁর কানে এল। এর ফলে অত্যন্ত কষ্ট করে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে এনে তিনি ধীরে ধীরে উত্তর দিচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য, ঘটনাটি পৌরাণিক নয়, সাম্প্রতিককালের ঘটনা। ঠাকুরের মনের স্বাভাবিক প্রবণতা সমাধির দিকে। মন সেদিকে বারবার চলে যাচ্ছে। তিনি বলছেন : মা আমায় বেহুঁশ করে রাখিস-নে। আমি ভক্তদের সঙ্গে কথা বলব।—শুকদেবের মতো তাঁকেও কষ্ট করে মনকে বাহ্যজগতে নামিয়ে আনতে হচ্ছে।

শুকদেব বলছেন : 'বসুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে দ্রোণ (ইনি দ্রোণাচার্য নন) এবং তাঁর স্ত্রী ধরাদেবীকে ব্রহ্মা মানুষ হয়ে জন্মানোর আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা সেই আদেশ মেনে নিয়ে বলেছিলেন—''মানবজন্ম নিতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই যদি শ্রীকৃষ্ণে পরমা ভক্তি থাকে।'' ব্রহ্মা বললেন, ''তাই হবে''—অর্থাৎ ভগবান তাঁদের সন্তানরূপে আবির্ভূত হবেন। তখন মহাতপা দ্রোণ, নন্দরূপে এবং ধরা যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।' দেখা যায়, পুত্ররূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ওপর গোপগোপীদের মধ্যে নন্দ-যশোদার সবচেয়ে বেশি ভক্তি হয়েছিল।

।। পাঠশালে অধ্যয়ন ।।

Pathshale adhyayan / study in village school

একদিন ক্ষুদিরাম বসে বসে ভাবছেন যে গাঁয়ের যত ছেলেদের নিয়ে খেলাধূলা করে আর ঘুরে বেড়িয়েই গদাইয়ের দিন কাটছে। এবার তার হাতে-খড়ি দেওয়া দরকার। একে মা-বাবার অত্যন্ত আদরের গদাই, তার ওপর আবার সে সংসারে সবচেয়ে ছোট ছেলে। গদাইয়েরও আর পাঁচটা শিশুর মতো পড়াশুনা একটুও ভাল লাগে না। পড়াশুনার কথা বললেই তার মন ভারী হয়ে ওঠে। মা-বাবা তাকে বুঝিয়ে হাতে-খড়ি দেওয়ালেন।

Start of formal education Pg.17

84

‘একদিন চাটুয্যে মহাশয় বসি ভাবে।
গদায়ের হাতে খড়ি এবে দিতে হবে।।’ (পৃঃ ১৭)

গদাইয়ের জন্মের আগে তার ঐশ্বরিক জীবনের জ্ঞাপক হিসেবে ক্ষুদিরাম যেসব অলৌকিক স্বপ্ন ও দর্শনাদি লাভ করেছিলেন, সেগুলি সব তাঁর মনে চিরকালের মতো গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তাই গদাই কোনোরকম অন্যায় কিছু করছে দেখলেও তিনি তাকে মিষ্টি কথায় মানা করা ছাড়া কখনোই শক্ত কথা বলতে পারতেন না। ক্ষুদিরাম লক্ষ্য করেছিলেন যে, যত অন্যায়ই গদাই করুক না কেন মিথ্যে দিয়ে কখনোই সেটি সে গোপন করত না। শুধু তা-ই নয়। তিনি দেখতেন তার মিষ্ট স্বভাব এবং প্রেমিক হৃদয় কখনও কারও কোনও ক্ষতি করত না। তবে একটা ব্যাপার নিয়ে ক্ষুদিরাম বেশ চিন্তিত ছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, কোনও বিধিনিষেধের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করে গদাইকে না বোঝাতে পারলে গদাই তা মানত না। বরং সবসময় তার বিপরীত আচরণ করত।

লাহাবাবুদের বাড়ির সামনে ঢালাও নাটমন্দিরে পাঠশালা। পাঁচ বছরের গদাই, পাততাড়ি বগলে করে পাঠশালায় এসে উপস্থিত হল। সকালে-বিকেলে দুবার করে পাঠশালা বসে। সকালে দু-তিন ঘণ্টা পড়াশুনার পর স্নান করবার ও খাওয়ার ছুটি। বিকেলে এসে আবার সন্ধ্যে পর্যন্ত পড়াশুনা। পাঠশালায় এসে সমবয়সী আরও অনেক বালকের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে গদাই খুব খুশি। কেননা যেখানে যত বেশি বালক, যেখানে যত বেশি প্রাণোচ্ছলতা সেখানেই তত বেশি লীলা।

লেখাপড়ায় একটুও মন নেই গদাইয়ের। রাতদিন শুধু সঙ্গীদের নিয়ে খেলা করে বা ঘুরে বেড়ায়। পাঠশালার গুরুমশাই গদাইকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসতেন। রূঢ় ব্যবহারে গদাই মনে ব্যথা

পায়। তাই তিনিও তাকে বকাবকি করতে পারেন না। পাঠশালায় গদাইয়ের যাতায়াতই হচ্ছে। শুধুই কি যাতায়াত? বহু ছেলেকে পেয়ে তার খেলা বহুগুণ বেড়ে গেল। আর পাঠশালার ছেলেরা? সবাই গদাইকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। ছুটি হয়ে গেলেও তারা গদাইয়ের সঙ্গে তাদের বাড়িতে এসে মিলিত হত। তাদের অপেক্ষাকৃত একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে যাত্রার নকল করে গদাই ভারি সুন্দর গান গাইত। অপরকে সাজাত ও নিজে সাজত তারপর অবিকল যাত্রাই করত। আসল-নকল সব এক হয়ে যেত। খোল-করতালের শব্দ অথবা শিঙার নিনাদ সবই সে মুখে শব্দ করে শুনিয়ে দিত। দিনে পাঠশালায় যেত আর রাতে যাত্রা করত।

activities with other children Pg.17

‘বিদ্যা অধ্যয়নে বড় নাহি হয় মন।
দিবানিশি নানা রঙ্গ লয়ে সঙ্গিগণ।।
শিশুগণ ফুল্লমন সুখসীমা নাই।
ছুটি পেলে খেলে বুলে লইয়া গদাই।।’ (পৃঃ ১৭)

গদাইয়ের মতোই শ্রীরামচন্দ্রও ছিলেন মিষ্টভাষী এবং তাঁর প্রেমিক হৃদয় কখনও কারও ক্ষতি করত না। তিনি ছিলেন সত্যবাদী এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আর তাই প্রজারা তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। গদাইয়ের মতোই তিনিও ছিলেন প্রজাদের যেন বাইরের প্রাণ—‘বহিশ্চর ইব প্রাণো’। কামারপুকুরবাসীরা গদাইকে না দেখে থাকতে পারতেন না, এবং সে ছিল কামারপুকুরবাসীদের যেন বাইরের প্রাণ। গদাই ছিল পরম পবিত্র, ক্রোধশূন্য এবং ধর্মপরায়ণ। শ্রীরামচন্দ্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন মহামুনি বশিষ্ঠ। তাঁর কাছে শ্রীরামচন্দ্র বেদ, বেদাঙ্গ ইত্যাদি খুব ভালভাবে পড়েছিলেন। গদাই ছিল শ্রুতিধর। পরবর্তী কালে বলতেন, ‘ছেলেবেলায় আমি কত শুনেছি।’

রামায়ণ রচনার আগে বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘হে মহামুনি নারদ! আমাকে বলুন বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কে আছেন,

যিনি সর্বগুণান্বিত, সত্যাশ্রয়ী, অপরের উপকারে সবসময় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন, যিনি রেগে গেলে দেবতারা পর্যন্ত ভয়বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং উজ্জ্বল কান্তিময় যাঁর শরীর—আমি তাঁর কথা শুনতে বিশেষ আগ্রহী। ত্রিভুবনে সবকিছুই তো আপনার নখদর্পণে।'

বাল্মীকির কথা শুনে নারদ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন : 'হে মুনিবর! তুমি যেসব সদ্‌গুণের কথা বললে, সেই সব গুণ একই মানুষের মধ্যে থাকা একরকম অসম্ভব বলেই জানবে। তবুও আমি সর্বগুণান্বিত ঐরকম পুরুষের কথা জানি। তোমাকে বলছি।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্মীকির এই সব প্রশ্ন খুব সুন্দর করে কবিতার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন :

'কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত।
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম—
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।
নারদ কহিলা ধীরে ''অযোধ্যার রঘুপতি রাম''।'

ভগবান যখন লোককল্যাণের জন্য মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি এমন ব্যবহার করেন যে, সাধারণ মানুষ তাঁকে পুরোপুরি মানুষরূপেই দেখে থাকে, ভগবান বলে জানতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—অবতার যখন আসেন, সাধারণ লোকে জানতে পারে না।—গোপনে আসেন। দুই-চারজন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে। রাম পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, একথা বারো জন ঋষি কেবল জানতেন। অন্য

ঋষিরা বলেছিলেন—'হে রাম, আমরা তোমাকে দশরথের ব্যাটা বলেই জানি।'

একসময় দেবর্ষি নারদ হিমালয়ের এক অত্যন্ত মনোরম প্রদেশে ভগবান বিষ্ণুর চিন্তায় বিভোর হয়ে সমাধিস্থ ছিলেন। নারদের সমাধি অবস্থা দেখে ইন্দ্রের ভয় হল—নারদ কি তাঁর ইন্দ্রত্ব কেড়ে নেবার জন্য এই রকম কঠোর তপস্যা করছেন? আর তাই ইন্দ্র মদনদেবকে পাঠিয়ে নারদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্বয়ং বিষ্ণু যাঁকে রক্ষা করেন, তাঁকে কি কেউ প্রলোভিত করতে পারে? মদনদেব বিফল হয়ে মুনির পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাঁর এই ব্যবহারে নারদের মনে তো কোনও চাঞ্চল্য হলই না এবং মদনদেবের ওপরও তাঁর কোনও রাগ হল না। নারদ সমাধি থেকে উঠে শিবের কাছে নিজের কামনা-জয়ের কথা বললেন। শিব নারদকে খুব ভালবাসেন। তাই নারদের মনে অহংকার হয়েছে দেখে তাঁর কল্যাণের জন্য বললেন : 'নারদ! তুমি আমাকে যা বললে ভুলেও সেটি কখনও ভগবান বিষ্ণুকে বোলো না।' কিন্তু শিবের কথা নারদের একটুও ভাল লাগল না। নারদ বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ভগবানের কাছে গর্বের সঙ্গে মদনদেবের ঘটনা বললেন। নারদের বলার ভঙ্গি দেখে ভগবান নারায়ণ বুঝলেন নারদের মনে অহংকার হয়েছে। এখনই এর মূলোৎপাটন করতে না পারলে নারদের মহা অকল্যাণ হবে। এমন কিছু করতে হবে যাতে নারদের মঙ্গল হয়। নারদের কল্যাণ ও জগতের শিক্ষার জন্য ভগবান নারদের ওপর মায়া বিস্তার করলেন। বীণা বাজিয়ে যেতে যেতে নারদ বৈকুণ্ঠপুরীর থেকেও সুন্দর ও বিরাট একটি নগর দেখতে পেলেন। সেই নগরের রাজার ঐশ্বর্য ইন্দ্রের ঐশ্বর্যকেও যেন হার মানায়। সেই রাজার পরমা রূপবতী কন্যার আজ স্বয়ম্বর হবে। ভগবানের মায়ায় নারদ রাজপুরীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজা নারদকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা করলেন। কন্যার অপার্থিব রূপ দেখে দেবর্ষি নারদ নিজে যে ব্রহ্মচারী

সেকথা ভুলে গেলেন। শ্রীহরির কাছে গিয়ে বললেন, 'প্রভু! কৃপা করে তোমার নিজের রূপ আমায় দাও।' ভগবান নিজের মায়ার প্রভাব দেখে কৌতুক বোধ করে বললেন, 'তোমার যাতে মঙ্গল হয়, আমি তা-ই করব।'

কৃপাময় ভগবান নারদের কল্যাণের জন্য তাঁকে বানরের মুখ দিলেন। হরি অর্থে বানরও হয়। শিবের দুই অনুচর, ব্রাহ্মণ-বেশে সভার কাজ পরিচালনা করছিলেন। তাঁরা নারদের বানর-মুখ দেখে কৌতুক বোধ করলেন। তাঁরা নারদকে শুনিয়ে ঠাট্টা করে বললেন, শ্রীহরি কেমন রূপ দিয়েছেন! রাজকুমারী নির্ঘাত এঁরই গলায় বরমাল্য দেবেন! নারদের বানর-মুখ একমাত্র রাজকন্যা এবং শিবের দুই অনুচর ছাড়া আর কেউই দেখতে পায়নি। নারদের বানর-মুখ দেখে রাজকন্যা বিরক্ত হয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। নারদ কিছু বুঝতে না পেরে, মোহের বশে আবার রাজকুমারীর দিকে মুখ করে বসলেন যাতে রাজকুমারী তাঁকে দেখতে পান। এমন সময় পরম দয়াল এবং কৌতুকী ভগবান শ্রীবিষ্ণু, রাজার বেশে সভায় এলেন। তাঁকে দেখেই রাজকন্যা তাঁকে বরণ করলেন। নারদের মনে তখন কী ভয়ঙ্কর অবস্থা! শিবের অনুচর দুজন হাসতে হাসতে নারদকে ব্যঙ্গ করে বললেন—জলের মধ্যে নিজের মুখের ছায়া একবার দেখোনা। এই বলেই তাঁরা পালিয়ে গেলেন। নিজের মুখের ছায়া জলের মধ্যে দেখে, নারদ অত্যন্ত রেগে গিয়ে শিবানুচরদের অভিশাপ দিলেন। তোমরা রাক্ষস হয়ে জন্মাবে। কিন্তু তাতেও কি নারদের রাগ কমে? সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ভগবান বিষ্ণুর ওপর। তিনি তখন বিষ্ণুলোকে যাচ্ছিলেন। পথেই বিষ্ণুর সাথে দেখা—তাঁর সঙ্গে আছেন লক্ষ্মীদেবী এবং রাজকুমারী। লীলাময় বিষ্ণু অতি মধুরস্বরে নারদকে বললেন : 'বিহ্বলের মতো কোথায় চলেছ।' —মায়ার প্রভাবে নারদের তখন কোনও হিতাহিতজ্ঞান না থাকায় ভগবানকে বলতে লাগলেন, তুমি অপরের ভাল দেখতে পার না। তুমি

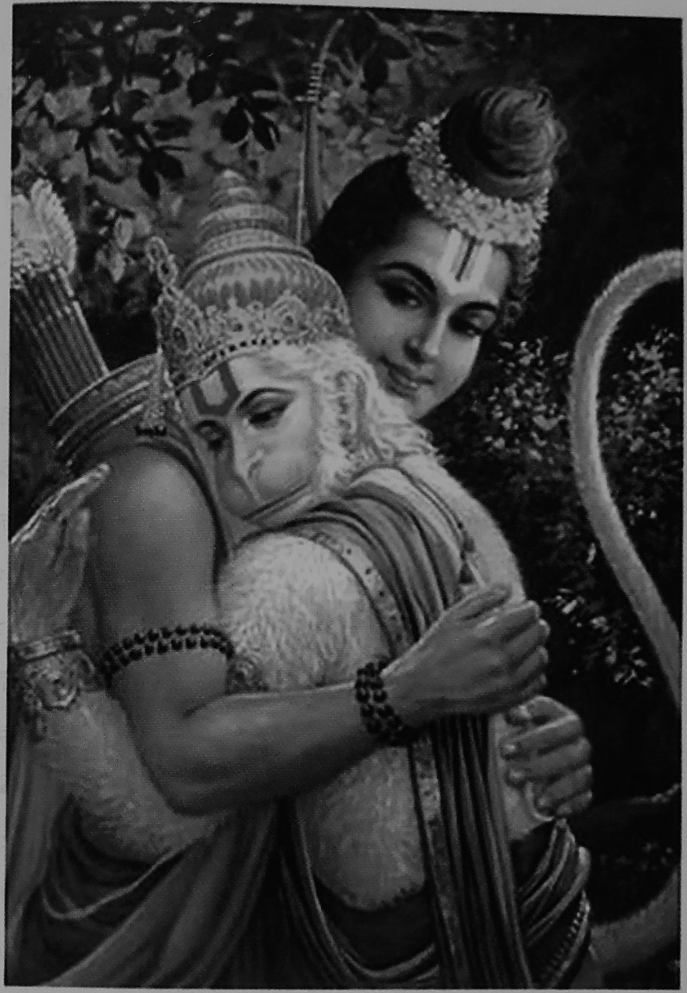

ভগবান শ্রীবিষ্ণু হাসিমুখে নারদের অভিশাপ মেনে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র-অবতারে বানরদের সাহচর্য গ্রহণ করেছিলেন (পৃঃ ৮৯)

ধনী কামারনীর বাস্তুভিটা (পৃঃ ৯৪-৯৫)

চিনু শাঁখারির বাস্তুভিটা (পৃঃ ১০০-১০১)

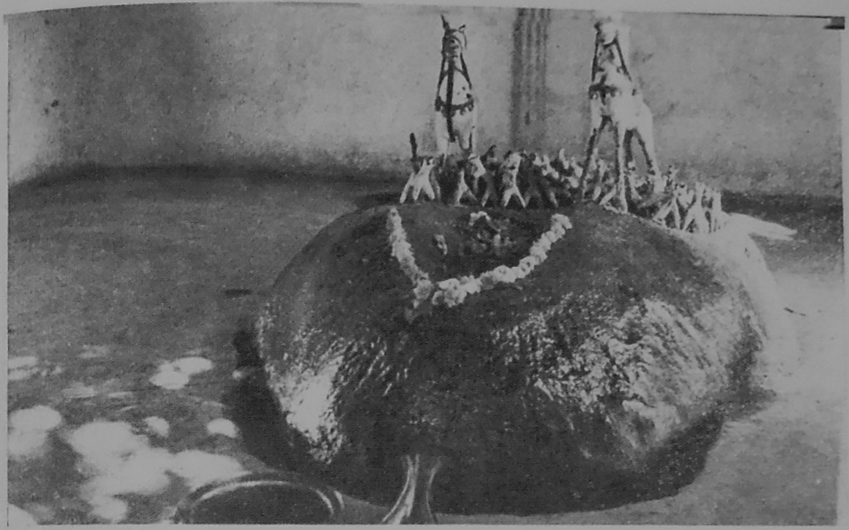

মা বিশালাক্ষী (পৃঃ ১০২-১০৩)

মা বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাওয়ার মেঠো পথ (পৃঃ ১০২-১০৩)

সীতানাথ পাইনের বাড়ি (পৃঃ ১০৪-০৫)

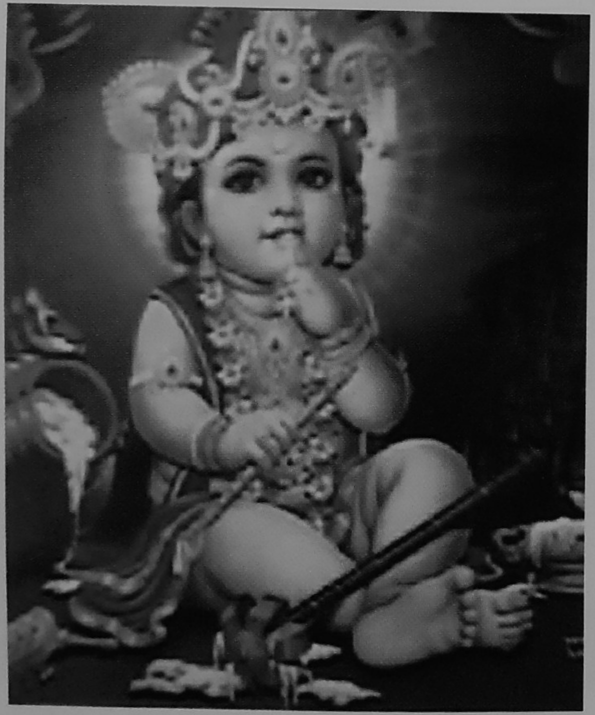

বালগোপালের ননী চুরি করে খাওয়া (পৃঃ ৬০-৬১)

সমুদ্র-মন্থন করিয়ে শিবকে দিয়ে হলাহল পান করিয়ে তাঁকে পাগল করে দিলে! আর নিজে নিলে পরমাসুন্দরী লক্ষ্মীদেবীকে। শুভ অশুভ কর্ম করতে তোমার কখনও বাধে না। কিন্তু এবার তুমি আমার হাতে পড়েছ। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি মানুষরূপ ধরে তুমি আমায় ঠকিয়েছ। তুমি সেই মানুষ-শরীরই লাভ করবে। আর বানরেরা সেই সময় তোমাকে সাহায্য করবে। তুমি আমায় বড় কষ্ট দিয়েছ। তুমিও সেই রকম স্ত্রীর বিরহে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করবে।

ভগবান হাসিমুখেই নারদের অভিশাপ মেনে নিয়ে নারদের ওপর থেকে বিষ্ণুমায়া প্রত্যাহার করে নিলেন। মায়ামুক্ত নারদ তখন ভীত হয়ে শ্রীহরির পাদপদ্ম ধরে বললেন : 'হে প্রণতজনের আর্তিহারি! আমায় রক্ষা করো।' শিবের গণদের প্রার্থনায় নারদ বললেন : তোমরা রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে রাক্ষস হবে এবং ভগবান বিষ্ণু শ্রীরামচন্দ্ররূপে যখন ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে তোমাদের বধ করবেন, তখন তোমরা শাপমুক্ত হবে।—এই হল শ্রীরামচন্দ্র অবতারের নেপথ্য কাহিনী।

অবতারের বাল্যলীলার মধ্যেই তাঁর ভাবী দিব্যভাবের সূচনা হয়। গদাধর ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের যুগ্ম অবতার। ঠাকুরের জীবনকে ঠিক ঠিক ভাবে বুঝতে হলে তাঁর বাল্যলীলাকে গভীরভাবেই বুঝতে হবে। পুঁথিকার বারবার আমাদের নানা ঘটনা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, বালক গদাই স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ। তাই তিনি গদাইয়ের বাল্যলীলার সঙ্গে কৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রের সাদৃশ্য দেখিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর দৃষ্টিতে কামারপুকুর আর ব্রজের গোপগ্রাম—এক। এখানে পুঁথিকারকে অনুসরণ করেই শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা আস্বাদন করার চেষ্টা।

একদিন গুরুমশাই শুনলেন যে, পাঠশালার ছুটি হয়ে যাওয়ার পর গদাই অন্যান্য পড়ুয়া বালকদের নিয়ে খুব সুন্দর যাত্রা করে। গদাই তাঁর পুত্রপ্রতিম। গুরুমশাই তাঁকে খুবই স্নেহ করেন।

‘একদিন পাঠশালে শিক্ষাগুরু বলে।
শুনাও কেমন যাত্রা কর সবে মিলে।।’ (পৃঃ ১৮)

তাই তিনি একদিন গদাইকে বললেন : ‘তোমরা কেমন যাত্রা কর, আমাকে শোনাও দেখি।’ এই কথা শুনে গদাই যাত্রা আরম্ভ করে দিলেন। নিজে গান করছেন। বাজনাও মুখে-মুখে। দু-হাতে তালি দিয়ে খুব ভাবের সঙ্গে সুন্দর করে নাচতে থাকেন।

‘গীত-বাদ্য-নৃত্য তাঁর অতি পরিপাটি।
মাঝে মাঝে সং দেওয়া কিছু নাহি ত্রুটি।।’ (পৃঃ ১৮)

কালিয় নাগের মাথার ওপর উঠে গোপালও ঠিক সেইরকম নাচ নেচেছিলেন। কৃষ্ণ যখন কালিয়র শতফণাবিশিষ্ট মাথার ওপর উঠে নাচছিলেন, তখন ফণাগুলির মণির প্রভায় গোপালের কচি পা-দুখানি আরও রক্তিম হয়ে উঠেছিল। মণির প্রভায় যেমন কৃষ্ণের চরণযুগল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেইরকম কৃষ্ণের পায়ের রক্তিম দ্যুতিতে কালিয়নাগের মাথার মণিগুলিও আরও অনেক বেশি সুন্দর হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় কৃষ্ণ উদ্ধত কালিয়নাগের মাথার ওপর অতি মনোহর নৃত্য করতে লাগলেন।

সেদিন গদাই গুরুমশাইয়ের আগ্রহে ভাবে তন্ময় হয়ে নাচতে থাকেন। অন্যান্য পড়ুয়া বালকদের সঙ্গে গুরুমশাইও হেসে আকুল। যেন আনন্দের হাটবাজার। কাছেপিঠের লোকেরাও এমন মনোরম দৃশ্য দেখবার জন্য হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসে ঐ আনন্দযজ্ঞে যোগ দিয়ে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তখন পাঠশালাটি যেন রঙ্গশালায় পরিণত হয়ে গেল। গুরুমশাই এবং অন্যান্য সঙ্গী পড়ুয়ারা এখন থেকে গদাইয়ের প্রতীক্ষায় থাকতেন—কখন গদাই পাঠশালায় আসবেন! যাঁকে সুকঠোর তপস্যা করেও লাভ করা যায় না—সেই পরম দুর্লভ রত্নটিকে নিয়েই খেলা করেছিলেন কামারপুকুরবাসিগণ।

এখন মনে হচ্ছে সমস্ত কামারপুকুরটিই যেন ব্রজভূমির নন্দগ্রাম, ব্রজভূমির গোপপল্লী।

পাঠশালে এসে গদাইও খুব খুশি। কেননা যেখানে যত বেশি বালক—যেখানে যত বেশি সহজ-সরল ভাব সেখানেই তত বেশি লীলা।

‘পাঠশালে যত ছেলে সবে ভালবাসে।
ছুটি পেলে গদায়ের সঙ্গে ঘরে মিশে।।’ (পৃঃ ১৮)

শুধু যদি ঐ শুভঙ্করীটা না থাকত! ওটি দেখলেই কেমন যেন ধাঁধা লেগে যায় গদাইয়ের। যোগ যদি বা হয়, বিয়োগটি আর কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারলেন না। আর কী করেই বা পারবেন? যোগে আছেন সর্বক্ষণ, তাই যোগ তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু বিয়োগ আবার কি? কোথাও লয় নেই, কোথাও ক্ষয় নেই, কোথাও বিচ্ছেদ নেই। এখানে আছে শুধু পূর্ণতা। পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ গেলেও হাতে সেই পূর্ণই থেকে যায়।

‘জমা রূপে পূর্ণ-ব্রহ্ম বিভু সনাতন।
ব্যয়রূপে বিরাট মূরতি অগণন।।’ (পৃঃ ১৯)

মুশকিল হয় পড়া বলতে বললেই! কিন্তু তার চেয়ে দেবদেবীর স্তব-স্তোত্র বলতে বললে গদাই নিমেষের মধ্যেই সবাইকে ব্যাকুল করে ছাড়বে। শুধু অঙ্ক দেখলেই আতঙ্ক। অঙ্ক ফেলে তালপাতায় দেবদেবীর নাম লেখা অনেক সোজা, অনেক আনন্দের।

তখনকার দিনে পল্লীগ্রামের পাঠশালায় প্রহ্লাদচরিত ও দাতা কর্ণের কথা পড়ানো হত। বর্ণপরিচয় করাবার জন্যই গুরুমশাই রোজ সকালে প্রহ্লাদচরিত পড়াতেন। গদাই এমনিতেই শ্রুতিধর। তারপর বারবার পড়তে পড়তে গদাইয়ের এটি মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ভক্ত প্রহ্লাদের কাহিনী তাঁর মনের মতো হওয়ায় সেটি তাঁর খুব ভাল লাগত।

একদিন গদাই মধু যুগীর মাটির বাড়ির দাওয়ায় তালপাতার চাটাইয়ে (আসনে) বসে প্রহ্লাদচরিত পড়ছেন। গ্রামের বহু লোক গদাইকে ঘিরে বসে পরম আনন্দে এই পাঠ শুনছেন। এমন শিশুর মুখে এই রকম মনোহরণ পাঠ কেউ কোনোদিনও শোনেনি। কাছাকাছি আমগাছের ডালে বসে একটি হনুমানও মন-মাতানো সেই পাঠ, সেই স্বরলহরী শুনছে। হঠাৎ ভাবের উচ্ছ্বাসে সেই হনুমানটি একলাফে নেমে এল গাছ থেকে। গদাইয়ের কাছে এসে তার পা-দুটি ধরে বসে রইল। গদাই বিন্দুমাত্র ভয় পেল না। পাঠ শেষ হয়ে গেলে গদাই সেই হনুমানের মাথায় বইটি স্পর্শ করিয়ে এবং তার ছোট্ট হাত দু-খানি হনুমানের মাথায় রেখে আশীর্বাদ করল। প্রণামের বিনিময়ে আশীর্বাদ নিয়ে মহাভক্ত মহবীর হনুমান আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

'পাঠান্তে উঠায়ে পুঁথি শিশু গদাধরে।
পরশ করিয়া দিলা হনু-শিরোপরে।।' (পৃঃ ১৯)

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে কে যে কীভাবে আছে তা আমরা জানি না। তাই কেউ হীন, অধম বা তুচ্ছ নয়। কামারপুকুরের গাছপালা, জীবজন্তু, লতাগুল্ম সবাই দেবদেবী। ঠাকুরের লীলা-পোষ্টাইয়ের জন্য তাঁরই নির্দেশে সবাই তাঁরই সঙ্গে এসেছেন। এ যেন 'কলমীর দল'। কলমীর দল পুকুরে অনেকখানি জায়গা-জুড়ে গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে এবং একটি লতা ধরে টানলেই সমস্ত ঝাড়টিই হুড়হুড় করে এসে হাজির হয়। ঠাকুর তাঁর লীলাসঙ্গীদেরও ঠিক ঐরকমভাবেই নিয়ে এসেছেন।

'প্রভু অবতারে তাঁরা দেব-দেবী যত।
প্রভুর আজ্ঞায় সব সঙ্গে সমাগত।।
দেখ দেখ সাবধান সাবধান মন।
প্রাণান্তেও অন্য বুদ্ধি কর না কখন।।' (পৃঃ ২০)

।। গদাধরের উপনয়ন ও ধনী কামারনীর ভিক্ষাগ্রহণ ।।

এখন গদাইয়ের বয়স মাত্র সাত বছর। এই সময় হঠাৎ ক্ষুদিরাম দেহত্যাগ করলেন। দুর্গাপুজো উপলক্ষে গিয়েছিলেন ভাগনে রামচাঁদের বাড়ি সিলামপুর বা ছিলিমপুরে। সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন ক্ষুদিরাম। বাড়াবাড়ি অসুখ। তবুও পুজোর আনন্দ ম্লান হতে দেবেন না। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমীও গেল—কিন্তু মনে হচ্ছে নবমী বুঝি আর কিছুতেই কাটবে না। কাতর চোখে তাকালেন একবার জগন্মাতার কৃপাপূর্ণ নয়নের দিকে। নবমীও কেটে গেল নির্বিঘ্নে। দশমীর সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জনের পর রামচাঁদ দেখলেন ক্ষুদিরামের দৃষ্টিও যেন অন্তিম যাত্রার পথে।

রামচাঁদ ডাকলেন, মামা! সাড়া নেই, শব্দ নেই—যেন নিথর। আবারও ডাকলেন। মামা! মৃত্যুর সময় নাম করবেন না? এতদিনের অভ্যাসযোগ শেষ সময় কি কোনও কাজেই আসবে না মামা! সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হল জপ-যজ্ঞ। কি হবে মামা? যাঁকে নিয়ে এতদিন বিভোর হয়ে থাকতেন, এই সময় কি তাঁকে ভুলে যাবেন? অত্যন্ত ধীরে ধীরে ক্ষুদিরাম রামচাঁদকে বললেন : বিসর্জন কি হয়ে গেছে? তাহলে আমাকে ধরাধরি করে একবার বসিয়ে দাও। রঘুবীরের নাম করতে করতেই চলে গেলেন ক্ষুদিরাম। তাই ঠাকুর বলতেন : দিনরাত তাঁর নাম জপ করবি। তাহলেই অভ্যাসের ফলে মৃত্যুর সময় ঈশ্বরচিন্তা আসবে। মরার সময় যা ভাববি তা-ই হবি। ভরত রাজা, হরিণ হরিণ করে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তাকে হরিণ হয়ে জন্মাতে হল।

গদাই এখন সাত বছর পেরিয়ে আটে পড়েছে। দাদারা পৈতে দেওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। হঠাৎ গদাই গোঁ-ধরে বসল, ধনী কামারনী ছাড়া অন্য কারও হাত থেকে সে ভিক্ষে নেবে না। দাদারা

বললেন : সেকি রে! সে কি কথা? ধনী যে নিম্ন জাতের মহিলা! ব্রাহ্মণ-কন্যা নয়। কুলপ্রথা লঙ্ঘন করে সে কী করে ভিক্ষে দেবে? ছোট্ট গদাই ফুঁসে উঠল : কিসের কুলাচার? কিসের জাত-বেজাত? তোমরা তোমাদের ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে থাকো। আমি কোনও বিধিনিষেধ মানব না। ধনী কামারনী ছাড়া আর কাউকেই আমি ভিক্ষে-মা করব না। কেননা আমি তাঁকে কথা দিয়েছি। আমি সত্য ভঙ্গ করতে পারব না। তাতে যদি পৈতে না হয়, না হবে।

বিদ্রোহী গদাই দরজায় খিল এঁটে বসে থাকলেন। গ্রামের সমস্ত মানুষের প্রাণাধিক গদাই উপোসী থাকবেন, এটা গ্রামের কেউই মেনে নিতে পারছেন না। তাই প্রয়াত ক্ষুদিরামের বহুদিনের বন্ধু ধর্মদাস লাহার পরামর্শে ধনীর কাছ থেকেই ভিক্ষা গ্রহণ ঠিক হল। তখন দাদা রামেশ্বর বললেন : 'খোল দরজা। কুলাচার নষ্ট হয় হোক, কিন্তু তোকে উপোসী দেখতে পারব না।'

'যবে ভাই রামেশ্বর যাইয়া আপনি।
বলিলেন দিবে ভিক্ষা ধনী কামারিনী।।' (পৃঃ ২০)

গদাই প্রসন্ন মুখে খুলে দিলেন দরজা। কামারদের বালবিধবা, ধনী ভিক্ষে দিলেন। মহাভাগ্যবতী! যিনি ত্রিভুবনে ভিক্ষে দিয়ে বেড়ান, তাঁকেই কিনা ধনী কামারনী ভিক্ষে দিলেন! ধন্য বাৎসল্যপ্রেমময়ী মা ধনী। বালবিধবা, অপুত্রক হয়েও এবার হলেন রামচন্দ্রের জননী! ভগবান ভক্তবৎসল। ভক্তরাই তাঁর প্রাণপ্রিয়। ভক্তির জোরে ভক্তই তাঁকে সন্তানরূপে লাভ করে থাকেন। এ জগতে তাঁর খেলা, তাঁর লীলা তিনি কৃপা করে না বোঝালে কে বুঝবে!

'কড়ে রাঁড়ী অপুত্রক ধনী কামারিনী।
না বিইয়ে হৈল এবে রামের জননী।।' (পৃঃ ২১)

ভাগবতকার, কৃষ্ণের ঠিক এই বয়সের অর্থাৎ গদাইয়ের মতো বয়সের একটি ঘটনা খুব মনোরমভাবে তুলে ধরেছেন। একদিন গোপবালকেরা গরুগুলোকে নিজেদের মতো চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়ে খেলায় মেতে উঠেছিল। সেই সময় গরুগুলি নিজেদের মতো চরতে চরতে কচি ঘাসের লোভে এখানে-সেখানে ঘুরতে ঘুরতে গ্রীষ্মের প্রখর সূর্যতাপে তৃষ্ণার্ত হয়ে একটি শরবনে পথ হারিয়ে ঢুকে পড়ল। কৃষ্ণের সঙ্গী গোপবালকেরা গরুগুলিকে খুঁজে না পেয়ে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। কৃষ্ণ তখন জলদগম্ভীর স্বরে তাদের নাম ধরে-ধরে ডাকতে লাগলেন। শ্রীভগবানের কণ্ঠস্বর শুনে গরুগুলোও অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে প্রতিধ্বনি তুলে এসে হাজির হল। কিন্তু সবাই একসঙ্গে বন থেকে বের হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে চারিদিকে ভীষণভাবে আগুন জ্বলে উঠল। তখন গোপবালক এবং পশুরা অত্যন্ত ভীত হয়ে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে বলতে লাগল : 'হে কৃষ্ণ! আমরা আগুনে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। তুমি আমাদের ত্রাণকর্তা। তুমি কৃপা করে আমাদের রক্ষা করো।' সঙ্গীদের ঐরকম ব্যাকুল আর্তনাদ শুনে কৃষ্ণ বললেন : 'কোনও ভয় নেই। তোমরা সবাই চোখ বন্ধ করো।' গোপবালকগণ চোখ বন্ধ করার পর যোগাধীশ্বর কৃষ্ণ মুখ দিয়ে সেই ভীষণ অগ্নি পান করে সকলকে দাবাগ্নি থেকে রক্ষা করলেন এবং আবার সবাইকে ভাণ্ডী বনের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ায় নিয়ে এসে হাজির করলেন। সঙ্গী গোপবালকেরা তখন কৃষ্ণের গুণগান করতে করতে বাড়ির পথ ধরলেন।

।। পণ্ডিতগণের পরাভব ।।

নিজের সাধনা দিয়ে যিনি পরবর্তী কালে সমস্ত সংশয় দূর করে সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন—তিনিই বাল্যলীলায় তথাকথিত পণ্ডিতদের সংশয় দূর করলেন ও তাঁদের অহংকার চূর্ণ করলেন। এটিই ঠাকুরের ঐশ্বর্যশক্তি ও বাল্যলীলা-মাধুরী।

উপনয়ন হয়ে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে গদাইয়ের জীবনে একটি অসাধারণ দিব্য প্রতিভার পরিচয় পেয়ে কামারপুকুর এবং তার আশপাশের গ্রামের মানুষেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তখন গদাইয়ের বয়স মাত্র ন-দশ বছর।

গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাড়িতে কোনও এক বিশেষ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে কাছের এবং দূরদূরান্তের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সভা বসেছিল। পণ্ডিতদের সভা মানেই তর্কের হুড়োহুড়ি আরম্ভ হয়ে যাওয়া। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই সভার কথা আগেই চারিদিকে প্রচার হয়ে গিয়েছিল। তাই এটি দেখার জন্য বহু মানুষও এসে হাজির হয়েছেন। পণ্ডিতদের এই তর্কের উচ্চ শোরগোল শুনে মাঠে-ঘাটে, কাজে-কর্মে, যে-যেখানে ছিলেন সবাই এসে ভিড় জমিয়েছেন। সঙ্গীদের নিয়ে শিশু গদাইও সেখানে সকৌতুকে উপস্থিত হয়ে যোগ দিলেন পণ্ডিতদের মধ্যে তত্ত্ববিচারে।

'সঙ্গী সনে রঙ্গ করি শিশু-গদাধর।
উপনীত হইলেন সভার ভিতর।।' (পৃঃ ২২)

এই সভায় নানা জটিল সব প্রশ্নের আলোচনা হচ্ছিল। শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব অত্যন্ত কঠিন হলেও, বালক গদাই সেগুলির অতি সহজ সমাধান করে দিচ্ছিলেন। এই সব দেখে পণ্ডিতগণ শিশু গদাইকে ঘিরে বসলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন রণক্ষেত্রে সপ্তরথীর মধ্যে অভিমন্যু বিরাজ করছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, যত সব জটিল শাস্ত্রীয় প্রশ্নের সহজ সরল ব্যাখ্যায় এই শিশুর কাছেই পণ্ডিতগণ পরাভূত হলেন। সবাই আরও অবাক হলেন এই ভেবে, যে-শিশুটি শুধু খেলে আর ঘুরে বেড়িয়েই দিন কাটায় সে কেমন করে শাস্ত্রের মর্মকথা সব বুঝতে পারছে! আর কেমন করেই বা সে পণ্ডিতদের সব মত, অকাট্য যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে নিজের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করছে?

'অল্প বয়স শিশু বুলে খেলে খেলে।
শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম কেমনে বুঝিলে।।' (পৃঃ ২২)

শিশু গদাইয়ের বিস্ময়কর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে নানা জনে নানা কথা বলাবলি করতে লাগলেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে : ভগবান যখন ধরাধামে আসেন তখন অনেক সময়েই 'কোটি-সূর্য প্রতীকাশ' ও 'চন্দ্র-কোটি সুশীতল' তাঁদের মধ্যে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ তাঁদের অঙ্গজ্যোতিতে কোটি সূর্যের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পেলেও সেটি কোটি চন্দ্রের প্রভার মতোই স্নিগ্ধ, সুশীতল। ছোট্ট গদাইয়ের মধ্যে এই দৈবশক্তির প্রকাশ খুবই দেখা যেত। শান্ত, সৌম্য কান্তিযুক্ত বালক গদাই যখন পণ্ডিতদের মধ্যে বসে কথা বলছে, তখন তার সুধামাখা কথা এবং অসাধারণ যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় পণ্ডিতগণ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। নিমেষের মধ্যেই পণ্ডিতদের সমস্ত কোলাহল সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে গেল।

'অবাক হইয়া দেখে মহা অসম্ভব।
নিরক্ষর সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ শৈশব।।' (পৃঃ ২২)

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ তখন বললেন : এই বালকটি নিশ্চয়ই দৈবশক্তিসম্পন্ন। বালক গদাইয়ের পরিচয় জেনে পণ্ডিতগণ তাঁকে আনন্দের সঙ্গে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করলেন। গদাইয়ের কাছে পণ্ডিতদের পরাজয়ের কথা, সমস্ত গ্রামের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল। গদাই একেই সমগ্র গ্রামবাসীদের নয়নের মণি তাই আজকের এই খবরে কামারপুকুরবাসী সমস্ত নরনারী আনন্দে যেন উদ্বেল হয়ে উঠেছেন। তাঁদের উল্লাস, তাঁদের আনন্দ যেন পূর্ণিমা রাতের বাঁধ-ভাঙা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মতোই উছলে পড়ছে। পল্লীর নারী-পুরুষ যে যেখানে ছিলেন তাঁদের প্রাণাধিক গদাইকে দেখবার জন্য ছুটে ছুটে আসছেন। তাঁরা গদাধরের চাঁদের মতো সুন্দর মিষ্টি মুখখানি দর্শন করে ভগবানের

ঐশ্বর্যের কথা ভুলে গিয়েছেন। তাঁরা শুধু চান তাঁদের প্রাণের গদাইকে সমস্ত ভালবাসা, স্নেহ-মমতা উজাড় করে দিতে। অজান্তে তাঁরা তাঁদের প্রীতিপূর্ণ ভক্তিনম্র-প্রণতি গদাইকে নিবেদন করে বসেন।

'গ্রামবাসিমধ্যে কথা রাষ্ট্র হয় পরে।
পণ্ডিতমণ্ডলী আজি পরাস্ত বিচারে।।

... ...

আনন্দে উথলে হৃদি ছাড়িয়া আধার।
প্রাণের স্বরূপ গদাধর সবাকার।।' (পৃঃ ২২)

ব্রজভূমিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছিল এখানেও ঠিক সেই রকম। এটিও যেন সেই ব্রজধামের মধুর লীলা-খেলায় ভরা শৈশবকথা।

।। চিনু শাঁখারির মিষ্টান্ন ও মালাগ্রহণ ।।

অবতারের বাল্যলীলার মধ্যেই তাঁর ভাবী দিব্যভাবের সূচনা হয়। গদাধর ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের যুগ্ম অবতার। ঠাকুরের জীবনকে ঠিক ঠিক ভাবে বুঝতে হলে তাঁর বাল্যলীলাকে গভীরভাবে বুঝতে হবে। পুঁথিকার বারবার আমাদের নানা ঘটনার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, বালক গদাই স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ। তাই তিনি গদাইয়ের বাল্যলীলার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রের সাদৃশ্য দেখিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর দৃষ্টিতে কামারপুকুর আর ব্রজের গোপগ্রাম—এক। চিনু শাঁখারির সঙ্গে ঠাকুরের যে মধুর সম্পর্ক, যে মধুর দিব্যলীলা, সেটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। ঠাকুরকে দেখলেই কামারপুকুরবাসীরা আনন্দে বিভোর হয়ে যেতেন। চিনুর মধ্যে ভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞান এবং

বাৎসল্য-প্রেম দুটিই একসঙ্গে এসে মিলিত হয়েছিল। চিনু শাঁখারির আসল নাম শ্রীনিবাস।

কামারপুকুরে অনেকগুলি পোষ্য নিয়ে চিনু শাঁখারি সংসারের দিন গুজরান করেন। ছোট্ট একটি দোকান। তাই দিয়েই কোনোরকমে সংসার চালাতে হয়। খুবই গরিব। বয়সও হয়েছে। ছোট্ট গদাইয়ের সাথে তাঁর খুবই সুমধুর সম্পর্ক। তাঁকে দেখলেই ভক্ত বিদুরের কথাই মনে পড়ে। গদাধরের উপর তাঁর অপার স্নেহ। আর তাই গদাইকেও রোজ রোজ চিনু শাঁখারির কাছে যেতে হত। গদাই যখনই তাঁর দোকানে এসে বসত তখনই চিনু অনুভব করতেন তাঁর আর কোনও দুঃখ নেই, কোনও কষ্ট নেই। তখন তাঁর মনে বয়ে যেত শুধু এক অপরিসীম আনন্দের প্রবাহ। গদাইকে দেখলেই তাকে মিষ্টি খাওয়ানো চাই-ই চাই। এদিকে খদ্দের এসেছে দোকানে, সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। গদাধর খায় আর চিনু আনন্দে বিহ্বল হয়ে দেখেন। এই সময় গদাইকে নিয়ে আনন্দে একেবারে বিভোর হয়ে যান চিনু।

'কিবা বলে কিবা করে কোন বোধ নাই।
না পাল্‌টি আঁখি দুটি দেখেন গদাই।।' (পৃঃ ২৩)

একদিন চিনু ফুল তুলে খুব পরিপাটি করে একখানি সুন্দর মালা গাঁথলেন। বাজার থেকে মিষ্টি কিনে আনলেন। তারপর সেই মালা আর মিষ্টি কাপড়ের কোঁচড়ে লুকিয়ে গদাইকে নিয়ে মাঠের মধ্যে এসে হাজির। যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর কোথাও কোনও লোকজনের চিহ্ন মাত্রও নেই। আছে শুধু চারিদিকে সবুজের শান্ত সমারোহ। আর মাথার উপরে আছে অনন্ত আকাশ। চিনিবাস—গদাইয়ের চিনিবাসদাদা, মালা ও মিষ্টি পাশে রেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে হাত জোড় করে ছলছল চোখে গদাইকে দেখতে লাগলেন।

তারপর আস্তে আস্তে গদাইয়ের কণ্ঠে মালাটি পরিয়ে দিলেন। গলায় মালা পরানোর পর মনে হল কৃষ্ণের গলায় যেন অতসী ফুলের মালা।

ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে গদাইকে। তারপরে নিজ হাতে খাওয়াতে লাগলেন গদাইকে—ব্রজের রাখালকে, ব্রজের ননীচোরা গোপালকে। ভক্তি ও ভালবাসায় চিনুর চোখ বারবার ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। চোখের জল গাল বেয়ে টপটপ করে মাটিতে, কখনও বা গদাইয়ের পায়ে পড়তে লাগল। গদাই আপ্লুত হৃদয়ে চিনিবাসদাদাকে দেখছে আর খাচ্ছে।

চিনিবাসদাদার মতোই একবার ভক্তিমতী নিস্তারিণী দেবীর অন্তরে ঠাকুরকে নিজের হাতে মিষ্টান্ন খাওয়াবার বাসনা জাগে। ঠাকুরকে প্রণাম করবার পর তিনি মনে মনে প্রার্থনা জানান ঠাকুরকে আজ নিজের হাতে খাওয়াবেন। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরে তাঁকে প্রশ্ন করলেন : ‘কি, তুই আমাকে হাতে করে খাওয়াবি?’ —এই বলে ঠাকুর একটু চুপ করে বসে থেকে বললেন : ‘আচ্ছা দে।’ নিস্তারিণী দেবী ঠাকুরের শ্রীমুখকমলে মিষ্টান্ন দিতে গিয়ে দেখেন কি একটা বস্তু ‘আঁক’ করে ঠোঁটের সামনে পর্যন্ত এসে তাঁর মিষ্টান্ন গ্রহণ করছে। দেখে তিনি কম্পিতকলেবরে ঠাকুরকে খাওয়ানো বন্ধ করে দিলেন।

চিনিবাসদাদাই গদাইকে ভগবান বলে ঠিক ঠিক চিনতে পেরেছেন। তাই খাওয়ানোর পর চিনু স্তব করতে আরম্ভ করলেন। তবে তার একটাই ভয়, একটাই দুঃখ, মর্তধামে গদাইয়ের ভবিষ্যতের লীলা, বয়স হয়ে যাওয়ার জন্য আর দেখা হবে না।

রাবণবধের পর রাম ও লক্ষ্মণ যখন লঙ্কার রাজপ্রাসাদে গিয়ে ঢুকলেন, দেখলেন রাবণের বৃদ্ধা মা নিকষা পালিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্মণ বিদ্রূপ করে বললেন, যার ছেলে, নাতি-পুতি সব গেল, বংশে যার বাতি দেবারও কেউ নেই, তার কিনা নিজের প্রাণের উপর এত টান!

লক্ষ্মণের কথা শুনে রাম স্মিত হেসে নিকষাকে কাছে ডাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন কেন মা? আপনার কিসের ভয়?

চিনুর মতোই নিকষা বললেন, আমার আর কিছু ভয় নেই। ভয়—যদি মরে গিয়ে তোমার এত লীলা আর দেখতে না পাই। বেঁচে আছি বলেই তো তোমাকে প্রাণভরে দেখতে পাচ্ছি! তাই এখনও বাঁচবার সাধ। আমি আর কিছুই চাই না। শুধু তোমার লীলা দেখে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেওয়ার সাধ!

চিনুর বয়স হলেও তাঁর চেহারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তাই অনেক সময় তিনি ভাবে বিভোর হয়ে গদাইকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতেন। ভক্ত চিনিবাস বলরামের অবতার। তাই গদাই যখন তাঁকে দাদা বলে ডাকত, তখন ভক্তিমান চিনিবাসের মন আনন্দে ডগমগ করে উঠত।

ভাগবত এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত চিনুর সঙ্গে গদাইয়ের মাঝে মাঝেই তর্কবিতর্কও হত। এই তর্কে চিনু যেমন কখনও কখনও চটে যেতেন, তেমনই বেশির ভাগ সময়ই খুব আনন্দ পেত। এই তর্কযুদ্ধের ফল হিসেবে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত করবেন না বলে চিনু পণ করতেন।

‘পুনশ্চ সাক্ষাৎ নহে শপথ করিয়া।
পলাইত নিজ ঘরে দুরু দুরু হিয়া।।’ (পৃঃ ২৪)

গদাইও বলত : ‘আমারও সংকল্প রইল আর দেখা নয়।’ এত সব হয়ে যাওয়ার পরমুহূর্তেই আবার দেখা যেত দুজনেই একসঙ্গে আনন্দে মেতে আছেন। চিনু দিনরাত ভক্তিগদ্‌গদ হয়ে গদাইয়ের কথা চিন্তা করতেন। আর গদাই? সেও চিনুকে ঠিক ঠিক বুঝত বলে তার ভক্তকে সে প্রাণাধিক ভালবাসত।

।। বিশালাক্ষীর আবেশ ।।

মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের অতীত, অখিলের নাথ, সর্বশক্তিমান, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, পূর্ণ-ব্রহ্ম-সনাতন, যাঁর কটাক্ষে সৃষ্টি-স্থিতি হয় আবার প্রলয়ও ঘটে—তিনি কেমন করে কামারপুকুরে বালক গদাধররূপে তাঁর

বাল্যলীলা করেছিলেন, সেই সুমধুর কথাই আলোচ্য বিষয়। গ্রামের সব মানুষের প্রাণাধিক গদাই।

'সর্বশক্তিমান বিভু অখিলেন পতি।
কটাক্ষে প্রলয় হয় কটাক্ষেতে স্থিতি' (পৃঃ ২৫)

মাঝে মাঝে তার অতি উন্নত ভাব দেখে অনেকে তাকে ভূতে পেয়েছে মনে করতেন। এখন সে ভুল তাঁদের ভেঙে গিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে এখানে দুটো কাহিনীর কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি এই দুটি গ্রন্থকে অনুসরণ করা হল।

'উপমায় কহি শুন দুই বিবরণ।
প্রভু গদাইর লীলা অপূর্ব কথন।।' (পৃঃ ২৫)

কামারপুকুরের কাছেই আনুড় গ্রাম। সেখানে আছে মা-বিশালাক্ষীর থান। এই বিশালাক্ষী অত্যন্ত জাগ্রতা দেবী বলে বিশেষ খ্যাতি আছে। সেইজন্য দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে ভক্তরা নানারকম প্রার্থনা নিয়ে দেবীকে পুজো দেওয়ার জন্য এখানে আসেন। ভক্তদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি।

এখানকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য গ্রামের রাখাল-বালকেরা মা-বিশালাক্ষীর খুবই প্রিয়। সকালে রাখাল-বালকেরা মায়ের থানে এসে, মাকে প্রণাম করে, গরু ছেড়ে দিয়ে গল্পগুজব, গান, খেলা, বনফুল তুলে মাকে সাজানো ইত্যাদি করে থাকে। যাত্রীরা মাকে যে-সমস্ত মিষ্টি, পয়সা ইত্যাদি দিয়ে থাকেন—রাখাল-বালকেরা ঐগুলি নিয়ে আনন্দ করে খাওয়াদাওয়া করে এটি দেবীর বিশেষ পছন্দের, বিশেষ তৃপ্তির, বিশেষ আনন্দের। এই রকম মিষ্টি উপদ্রব না হলে তিনি থাকতে পারেন না।

কামারপুকুর থেকে মাত্র দু-মাইল উত্তরে মা-বিশালাক্ষীর থান। মাঝখানে খোলা মাঠ। ধর্মদাস লাহার ভক্তিমতী বিধবা কন্যা প্রসন্নময়ী, কামারপুকুর গ্রামের অন্য সব মেয়েদের নিয়ে বিশালাক্ষীর থানে পুজো দিতে চলেছেন। হঠাৎ গদাইও এসে ধরে বসল, 'আমিও যাব।' 'তুই যাবি কিরে! এতটা মাঠভাঙা পথ! হাঁটবি কী করে?' কিন্তু গদাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, তাকে আর মানা করতে পারলেন না। ভাবছেন, মন্দ কি, চলুক না সঙ্গে। ফেরবার সময় যদি খিদে পায়, সঙ্গে তো মায়ের প্রসাদ থাকবে। তাই না হয় খাবে। তা ছাড়া গদাই সঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই দু-চারটে গান গাইবে। এই সব চিন্তা করে প্রসন্নময়ী বললেন, 'বেশ চল'।

পরবর্তী কালে প্রসন্নময়ীকে বলতে শোনা যেত : 'সত্যি, গদাইয়ের গান শোনার পর আর কারও গানই ভাল লাগে না, কানে লাগে না। গদাই আমাদের কানই খারাপ করে দিয়েছে।' মায়েরা ও মেয়েরা দেবীর মহিমা গুণগান করতে করতে মা-বিশালাক্ষীর থানে চলেছেন। ঠিক এই সময়ে, ফাঁকা মাঠের মধ্যে গদাই বেশ গলা ছেড়ে গান ধরল। দেবী বিশালাক্ষীর মহিমা-বিষয়ক গান। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে যেতে যেতে এই গান বড় ভাল লাগছে। আশপাশের সমস্ত পরিবেশটাই যেন পালটে গিয়েছে। গান গাইতে গাইতে হঠাৎই থেমে গেল গদাই। মেয়েরা সব দেখল গদাই নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে আছে—আর চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় জল ঝরছে। 'কী হল তোর?' কিন্তু গদাইয়ের কোনও হুঁশই নেই। মেয়েরা সবাই গদাইকে ঘিরে দুশ্চিন্তায় একেবারে অধীর হয়ে ওঠে। 'গদাই—ও গদাই!' ব্যাকুল হয়ে সবাই ডাকছেন। পল্লীর রমণীরা ভাবছেন এই অবস্থায় কী করে এখন মা চন্দ্রামণির কাছে ফিরিয়ে দেব গদাইকে! ধর্মদাস লাহার ভক্তিমতী কন্যা প্রসন্ন, একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গী মেয়েদের হৈচৈ শুনে পা-চালিয়ে তাড়াতাড়ি এসে সব শুনে বললেন : 'যে মায়ের কাছে যাচ্ছি, সেই মা বিশালাক্ষীই শুদ্ধ আধার পেয়ে আনন্দে ভর করেনি তো গদাইয়ের ওপর! ওগো, শুধু শুধু গদাইকে না-ডেকে মা

বিশালাক্ষীর নাম-গান করো। তখন সবাই দেবীর মহিমা-বিষয়ক গান ও স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। একটু পরেই চেতনা ফিরে এল গদাইয়ের। ‘ভাবরাজ্যের-রাজার’ মুখ দিব্যোজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল।

‘যেই বিশালাক্ষী যাইতেছি দেখিবারে।
সেই দেবী এসেছেন শিশুর ভিতরে।।’ (পৃঃ ২৬)

সবুজ বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের আলপথ দিয়ে যেতে যেতে গদাই দেখেছিল বিশালকায় কালো মেঘ সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ে দিব্য পরিবেশের সৃষ্টি করেছে—সেই কালো মেঘের কোল ঘেঁষে একঝাঁক সাদা বক উড়ে যাচ্ছিল। এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার ফলে গদাইয়ের প্রথম ভাবাবেশ হয়। শুভ্র বলাকার যে রূপ, মা বিশালাক্ষীরও সেই রূপ। দুইয়ের একই উদ্ভাস, একই সৌন্দর্য, একই তাৎপর্য। এ যেন একই কাব্যের দুটি শ্লোক।

গদাইয়ের দ্বিতীয় ভাবাবেশ। দ্বিতীয় কাহিনীটি এরকম :

বেশ স্বচ্ছল অবস্থা সীতানাথ পাইনের। তাঁর হৃদয়ও খুব উদার। তা ছাড়াও তিনি খুবই ভক্তিমান। শিবরাত্রিতে সারাদিন উপবাসী থেকে রাত-জাগার একটি রীতি প্রচলিত আছে। তাই এই উপলক্ষে সীতানাথ পাইনের বাড়িতে শিব-বিষয়ক যাত্রার ব্যবস্থা হয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকেই নারী-পুরুষ দলে-দলে মহা উল্লাসে যাত্রার আসরে আসতে শুরু করেছেন।

যাত্রার আসরের একটু দূরেই সাজঘর। ধুন্বুল পড়েছে। কিন্তু শিবের যে অভিনয় করবে সেই ছেলেটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় যাত্রা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। এই সময় সকলেই গদাইকে শিব সাজানোর জন্য ধরে বসলেন। আর তা ছাড়া সে শিব-বিষয়ক গানও জানে অনেক। গদাইয়ের গানের গলাটি বড় মধুর। তার গান দিয়েই মাতিয়ে দেবে সবাইকে।

আজকের যাত্রার বেশকার গয়াবিষ্ণু। গদাইয়ের স্যাঙাৎ গয়াবিষ্ণু জানে তার এই প্রাণপ্রিয় স্যাঙাৎটিকে কীভাবে দেবাদিদেব মহাদেবের সাজে সজ্জিত করতে হবে। শিবসাজে সজ্জিত গদাই, শিবভাবে তন্ময় হয়ে সাজঘরে বসেছিলেন। এমন সময়ে তাঁর ডাক পড়ল আসরে।

‘সাজঘর আসরের কিঞ্চিৎ তফাত।
বেশকারী গয়াবিষ্ণু প্রভুর সেঙ্গাত।।’ (পৃঃ ২৬)

গদাই শিবের বেশবাসে ভূষিত হয়ে আসরে এসে উপস্থিত। তিনি এখন একেবারে সেই সচ্চিদানন্দ শিব! মাথায় রুক্ষবর্ণ জটাভার, ভাস্বর ভস্মভূষণ। এক হাতে শিঙ্গা, অন্য হাতে ত্রিশূল। কণ্ঠে ও বাহুতে সর্পভূষণ। চোখে অনিমেষ দৃষ্টি, যেখানে আছে তৃতীয় নয়নের দীপ্ততা। মনে হচ্ছে যেন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব নেমে এসেছেন কৈলাস শিখর থেকে। ঠোঁটের কোণে মধুর হাসির রেখা। এই সব দেখে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

‘দর্শকেরা দেখে তাঁরে নহে গদাধর।
আগত কৈলাস ছাড়ি কৈলাস ঈশ্বর।।’ (পৃঃ ২৭)

বিস্ময়ের ভাবটা কাটার সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয় আনন্দের ঢেউ খেলে গেল চারিদিকে। মহিলাগণ—যাঁরা আসরে ছিলেন, উলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন। কেউ কেউ শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন। আবার কেউ কেউ বা নিজেদের জায়গা থেকেই তাঁদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাতে লাগলেন।

‘নমো হে নমো হে, হে মহাদেবতা
নমো নমো শিব সুন্দর, নম নম শিব সুন্দর।।
হসতি হসতি হা-হা কোরে ওই
নাচে তা-থা-থৈ নাচে তা-থা-থৈ,
তালে তালে ঐ দিয়ে করতালি শঙ্কা হরণ শঙ্কর
নম নম শিব সুন্দর।।’

মনে মনে ভাবলেন, আজ শিবরাত্রিব্রত-পালন সার্থক। কেননা দেবাদিদেব মহাদেব আজ স্বয়ং আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। আর পুরুষেরা কী করলেন? পুরুষদের মধ্যে অনেকেই ভক্তি-আপ্লুত হয়ে হরিধ্বনি দিয়ে উঠলেন। মুহূর্তের মধ্যেই সমস্ত আসরটিতে স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হল। যাত্রাদলের অধিকারী স্বয়ং ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে শিবস্তুতি করতে লাগলেন।

‘শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে
গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেকস্ত্বং
হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি।।’ ১০।।

—বেদসারশিবস্তোত্র, স্তবকুসুমাঞ্জলি, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৬

হে শম্ভু, হে মহেশ, হে করুণাময়, হে শূলপাণি, হে গৌরীপতি, হে পশুপতি, হে জীববন্ধননাশি, হে কাশীপতি, একমাত্র তুমিই করুণাবশতঃ এই জগতের ধ্বংস, পালন ও সৃজন করিতেছ। তুমিই মহেশ্বর।

কিন্তু ওকি! শিব-সাজে সজ্জিত গদাই কিছু বলছে না, নড়ছে না! কী হল গদাইয়ের? শিবের মহাভাব গরগর করে সপ্তমে উঠে পড়ায় তিনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল পড়তে লাগল। চিনু প্রভৃতি, যাঁরা গদাইকে ঠিক ঠিক বুঝেছিলেন, তাঁরা ফুল ও বেলপাতা তুলে এনে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গদাইয়ের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে দেখে মনে হচ্ছে যেন মা-জাহ্নবী শিবরূপ গদাইয়ের জটাজালের মধ্যে আবদ্ধা হয়ে থাকতে না পেরে শিবভাবে আবিষ্ট প্রভুর চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছেন।

‘শঙ্কায় মাথায় নাহি পারে বসিবারে।
শিবভাব প্রভু-অঙ্গে তাই চক্ষে ঝরে।।’ (পৃঃ ২৭)

বালক গদাইয়ের শ্রীঅঙ্গে শিবের আবির্ভাব দেখে দর্শকেরা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। এই অবস্থায় সে রাতে আর যাত্রা হল না। শোনা যায়, গদাইয়ের এই ভাব কাটতে তিনদিন লেগে গিয়েছিল।

।। পুঁথি-লিখন : কালীপূজা ও রমণীর বেশধারণ এবং খেলাচ্ছলে আসন-প্রদর্শন ।।

অনেকেরই ধারণা ঠাকুর একেবারে নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ পাঠশালা ছাড়ার পর রামায়ণ-মহাভারতের পুঁথি লেখায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ দেখা দিয়েছিল। এই লেখা শেষ করেছিলেন ১২৫৬ সালের ১৯শে আষাঢ়। ‘সুবাহু’ ও ‘যোগদ্যার পালা’ দুটির কথা বিশেষভাবে বলা যেতে পারে। তাঁর হাতের লেখা ছিল খুবই সুন্দর। অল্পদিন পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে প্রকাশিত পূজ্যপাদ স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ-সম্পাদিত ‘পুঁথি’ গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য ও প্রমাণ উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থ পাঠে ঠাকুরের হাতের লেখা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর হাতের লেখা বেশ গোটা গোটা, দীর্ঘাকার এবং অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। এক কথায় চমৎকার। এই সময় গদাধরের বয়স ছিল মাত্র বারো বছর। তাঁর কাছে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনে ভক্তবৃন্দ যেমন মহানন্দে মেতে উঠতেন, তেমনই নির্মল সংযত হাস্যরসে তাঁদের প্রাণ নেচে উঠত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রঘুবীরের জন্য সুন্দর করে মালা গেঁথে পুজো করতেন। কখনওবা খুব জোরে জোরে অবিরাম রামনাম করতেন। সেই সময় থেকেই তাঁর সাধনার অঙ্কুরোদ্গম। পরবর্তিকালে ঠাকুরকে বলতে শোনা যেত, ‘নাম কি কম গা? যা নাম তা-ই তো রাম। তবু নামের সঙ্গে অনুরাগ চাই। যে প্রিয় তাকে শুধু নাম-ধরে ডাকলেই হয় না, তার সঙ্গে একটু প্রেম চাই। যদি নাম করতে করতে দিন-দিন অনুরাগ বাড়ে, আর অনুরাগের সঙ্গে আনন্দ—তাহলে আর ভয় নাই। বিকার কাটবেই কাটবে। আর তারপরে? তার পরেই তিনি জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আধারিত হবেন।’

সূর্যোদয়ের আগে যেমন পূর্বাকাশ নানা রঙে রক্তিম হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনই প্রভুর রূপও দিনে দিনে ভোরের প্রথম সূর্যের সোনালী নরম আলোর মতোই সুন্দর হয়ে উঠতে লাগল। পুঁথিকার গদাইয়ের রূপের অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন :

'একে বয়ঃ সুকুমার, রূপ-লাবণ্য-আগার,
দীপ্তিমান বয়ান সুন্দর।
গুণটানা শরাসন, অল্প বাঁকা দুনয়ন,
ত্রিভুবন-জন-মনোহর।।
… … …
সৌন্দর্যের ছবিখানি, কণ্ঠে ফুটে মিঠা বাণী
মোহনত্ব নহে বলিবার।।' (পৃঃ ২৮)

এই মনোহর রূপ, সকল ভক্তদের ধ্যানের বিষয়। গদাইকে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা ভালবাসতেন। বিশেষ করে গ্রামের মায়েরা খুবই ভালবাসতেন এবং আদর-যত্ন করতেন। সমবয়সী বন্ধুদেরও তিনি প্রাণাধিক এবং সকলের নেতা। এই সময় বন্ধুদের মধ্যে শ্রীরাম মল্লিকের সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল সবচেয়ে বেশি।

যা কিছু সুন্দর, তারই উপর গদাইয়ের অন্তরের টান। মনে করতেন কী করে এই সুন্দরকে নিজের সৃষ্টির মধ্যে উদ্ঘাটিত করা যায়! আর তাই তিনি এখন মাটি দিয়ে মূর্তি গড়েন অথবা ছবি আঁকেন। যখন মূর্তিগুলিতে চোখ আঁকতেন, তখন মনে হত যেন জীবন্ত।

মা-কালীর মূর্তি গড়ে তিনি পুজো পুজো খেলতেন। বালক গদাধর শিল্পে, সঙ্গীতে ও নৃত্যে এক অনির্বচনীয়কে সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন। আর তাঁর কথা অনুপম সাহিত্য। পরবর্তিকালে তিনি বলতেন : 'মা, আমাকে রসে-বশে রাখিস। আমাকে শুকনো সাধু করিস নে।' একটু চিন্তা করে দেখলে বোঝা যায়—কথাটি সাহিত্যের সার। কেননা তিনি বলছেন, আমাকে 'রস' দিস মা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটিও বলতে ভোলেননি, 'মাগো আমাকে বশে রাখিস।' অর্থাৎ আমাকে উচ্ছ্বাস দিস, আর সেই সঙ্গে 'সংযমও দিস মা।'

সীতানাথ পাইন পল্লীর একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁর নিজের ছেলেমেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বেশ বড় সংসার। তাঁর চোদ্দোটি বোন। সকলেই সুরূপা। তাঁর বাড়িতে দশ-বারোটা শিলে রোজ বাটনা বাটতে হত। তখনকার দিনে এত লোকের বিরাট সংসার খুব একটা দেখা যেত না। তখনকার সমাজ-ব্যবস্থায় মায়েরা ছিলেন কঠোরভাবে পর্দানশিন, বিশেষ করে সীতানাথ পাইনের বাড়ির মায়েরা। সীতানাথ গদাইকে নিজের ইষ্ট-জ্ঞান করতেন। তাই তিনি তাঁর বাড়িতে গদাইকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন। দেখা যেত সীতানাথ পাইনের কন্যারা, বাড়ির বধূরা ও অন্যান্য যারা, মা চন্দ্রামণির সামনেও বের হন না, তাঁদের কিন্তু গদাইয়ের কাছে কোনও সংকোচ নাই, কোনও দ্বিধা নাই। গদাই যেন তাঁদের একান্ত আপনার—তাঁদেরই একজন। গদাইকে একটিবার দেখার জন্য তাঁদের মন এতই ব্যাকুল হয়ে থাকত যে গ্রাম ছেড়ে বা গদাইকে ছেড়ে, দূরে চলে যাওয়ার চেয়ে মৃত্যুও তাঁদের কাছে অনেক বেশি কাম্য ছিল। তাই গদাইকে ছেড়ে তাঁদের আর শ্বশুর বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠেনি। দেখা যেত যতক্ষণ গদাই সীতানাথের বাড়িতে অবস্থান করতেন ততক্ষণ সকলের মন আনন্দ-কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

'প্রভু-দরশন হেতু এত লুব্ধ মন।
গ্রামত্যাগাপেক্ষা ভাল বুঝিত মরণ।।' (পৃঃ ৩০)

এই সব দেখে গ্রামের কয়েকজন বর্ষীয়ান ব্যক্তি সীতানাথের কাছে গদাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। তাঁদের বক্তব্য : যে পরিবারে অতগুলি তরুণী কন্যা রয়েছে, সেই বাড়ির অন্দরমহলে গদাই কেন যাতায়াত করে! সীতানাথ গদাধরের শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ চরিত্র-মাধুর্যের কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করায়, পল্লীর অন্য লোকেরাও সীতানাথের কথাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সমর্থন করেন। ফলে জটিলা-কুটিলার দল নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য বলতে বাধ্য হন যে পরিহাস-ছলেই তাঁরা ঐসব কথা বলেছেন।

'গালে হাত সীতানাথ কয় হাসি হাসি।
জান না কি গদাধর অকলঙ্ক শশী।।

... ...

দ্বেষিগণে কথা শুনে মহা লজ্জা পায়।
উক্ত কথা পরিহাস বলিয়া উড়ায়।।' (পৃঃ ৩১)

গদাই অন্যের অনুকরণেও অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। কখনও কখনও মেয়েদের সাজে সজ্জিত হয়ে কাঁখে কলসী নিয়ে পল্লীর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকতেন,

'দরজায় নারীগণে ডাকিতেন এঁটে।
আয় কে লো যাবি জলে সূর্য যায় পাটে।।' (পৃঃ ৩১)

তাঁর হাবভাব এতটাই নিখুঁত যে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে পুরুষদের সামনে দিয়ে পুকুরঘাটে চলে গেলেও কেউই তাঁকে চিনতে পারত না।

'পুরুষেরা যত সব বসিয়া সদরে।
জলে যেতে যেই পথ, তার দুই ধারে।।
কেহ না চিনিতে পারে প্রভু গদাধর।
জল-হেতু কাঁখে কুম্ভ যান সরোবর।।' (পৃঃ ৩১-৩২)

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : 'আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করলে কামাদি-রিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মতন হাবভাব হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমি অনেকদিন মেয়েদের মতো কাপড়-গয়না পরে, ওড়না গায়ে দিয়ে সখীভাবে ছিলুম।'

'পরিধানে পাছাপেড়ে বসন সুন্দর।
কাঁখেতে কলসী গতি বেনেদের ঘর।।' (পৃঃ ৩১)

ঠাকুরের যে বাল্য অথবা কৈশোর-লীলা তা সবসময় শ্রীকৃষ্ণের বাল্য এবং কৈশোর লীলাকেই মনে করিয়ে দেয়। শ্রীকৃষ্ণের মতো

গদাইকেও নিজেদের মধ্যে পেয়ে পল্লীবাসীদের মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠত। তাঁরা গদাইকে তাঁদের 'প্রাণের প্রাণ' বলেই মনে করতেন।

বৃন্দার মা জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাই গদাইকে নিজের হাতে প্রায়ই রান্না করে খাওয়াতে পারেন। কিন্তু যারা অব্রাহ্মণ তারা গদাইকে রান্না করে খাওয়াতে পারে না বলে তাদের মনে বড় দুঃখ। যেমন খেতির মায়ের জন্ম ছুতোরের ঘরে। তাই ইচ্ছে থাকলেও রান্না করে খাওয়াতে পারে না। গদাইকে ঘরে ডেকে এনে খাওয়াবার মনে বড় সাধ। এই বাসনা বা সাধ তার মনকে আকুল করে তুললেও, প্রাণের অপূর্ণ বাসনার কথা কারও কাছেই প্রকাশ করতে পারে না।

ধনী কামারনীর বোন শঙ্করী কাছেই থাকে। গদাই তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বলতে পার, খেতির-মা, আমাকে কি যেন বলি বলি করেও বলতে পারছে না?'

শঙ্করী গদাইয়ের প্রশ্ন শুনে তো একেবারে থ! বলছে : তাহলে বলো কি খাবে? গদাই বলছে : ঘরে যাব। ঘরে গিয়ে মেঝের ওপর বসে পাত পেড়ে আনন্দ করে খাব। যা তুমি নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে সবই খাব।

'ভক্তবৎসলতা-ভাব মরি কি সুন্দর।
অনায়াসে যান খেতে ছুতারের ঘর।।' (পৃঃ ৩২)

শেষপর্যন্ত গদাই গেল ছুতোরদের বাড়ি। তখনকার দিনে শূদ্রের হাতে রান্না করা খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা যে কত বড় দুঃসাহসের ব্যাপার আজকের দিনে তা কল্পনাও করা যায় না। খেতির-মায়ের বাড়িতে তৃপ্তি করে খেয়ে গদাই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

'জাতির খাতির মনে কিছুমাত্র নাই।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ঠাকুর গদাই।।' (পৃঃ ৩২)

বালক গদায়ের লীলার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারতেন চিনু শাঁখারি এবং আর মাত্র দু-একজন গ্রামবাসী। এই সময় থেকে গদাই যেন একাকী থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন। কোনও সঙ্গীসাথীকেই তাঁর আর পছন্দ হত না। বারবার জিজ্ঞাসা করলে বলতেন :

'বৃথা কাজে অনর্থক এতদিন গেল
সুন্দর সে হরি তাঁর তত্ত্ব না হইল।।
… … …
মরি কি মধুর নর-লীলা ধরাধামে।
নরদেহে নিজে হরি মায়া-আবরণে ।।' (পৃঃ ৩৩)

এই তাঁর সাধনপর্বের ব্যাকুলতার শুরু।

গদাইয়ের সাথীরা তাঁর সঙ্গে খেলতে চায়। গদাইও নানা রকম নতুন খেলা সৃষ্টি করে সঙ্গীদের সঙ্গে আনন্দ করে খেলেন। খেলাচ্ছলে বিভিন্ন রকমের যোগাসন দেখান। তা দেখে সঙ্গীরা একেবারে অবাক! গ্রামের লোকেরা বিস্ময়ে হতবাক! গ্রামে তো সেরকম কেউ নেই, যিনি এই আসনের তত্ত্ব বুঝবেন! ব্যাপারটি চিনুই ঠিক ঠিক বুঝেছিলেন। আত্মকাম চিনিবাস ছিলেন দূরদর্শী। কামারপুকুরে গদাই যেসব লীলা দেখিয়েছিলেন, অন্যেরা সেগুলি খেলাধূলা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারেননি। আর যাঁরা বোঝার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তাঁরাও গদাধরের মুখমণ্ডল দেখে সব ভুলে যেতেন। গদাইয়ের দৈবীসত্তার প্রকাশে মোহিত গ্রামের অন্যেরা ধরতেও পারেননি যে কামারপুকুরে গদাইয়ের বাস সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। কৃষ্ণেরও বৃন্দাবন ছেড়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ব্রজবাসীরা কল্পনাও করতে পারেননি যে কৃষ্ণ তাঁদের ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

।। প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ।।

দ্বিতীয় খণ্ড

।। কলিকাতায় শ্রীশ্রীপ্রভুর আগমন।।

গরিব ব্রাহ্মণের ঘরে জগৎপতি এবার গুপ্তভাবে নিরক্ষর ব্রাহ্মণের রূপ ধরে দুর্গম পল্লী কামারপুকুরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শুদ্ধ-মুক্ত-নিরাকার-নির্গুণ পরমব্রহ্ম যখন মানুষের রূপ ধরে আসেন, তখন তিনি একেবারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষই হয়ে যান। দীনের চেয়েও অতি দীন হয়ে যান। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবকে শিক্ষা' দেবার জন্য একেবারে সাধারণ মানুষের মতো ব্যবহার করেন।

শঙ্করাচার্যও অবতার-পুরুষের লীলাকে পরমব্রহ্মের নাটক বলে অভিহিত করেছেন। তবে এ নাটক কৃত্রিম নয়। আমাদের অভিনয়ের নট-নটীরা কৃত্রিম পোশাক পরে অভিনয় করেন। এটা তাঁদের প্রকৃত রূপ নয়। কিন্তু অবতারলীলার মধ্যে মানুষরূপী ভগবানের কপটতা নেই, কোনও ছলনা নেই। যখন মানুষের রূপ ধরেন, তখন একেবারে মানুষ।

এবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁর মানবীয় লীলার দিব্যমাধুর্য ক্রমে ক্রমে বিকাশলাভ করতে দেখা যাবে। মানবলীলায় দেবভাবটি গোপন রাখাই অবতারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য—বিশেষ শক্তি। মায়ায় মুগ্ধ বিষয়াসক্ত মানুষ সহজে তাঁর স্বরূপ ধরতে পারে না। তিনি কৃপা করলে তবেই 'কোনও কোনও ভাগ্যবান'—সেটি দেখতে পান ও বুঝতে পারেন।

পুঁথিকার এখানে পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে বহু মুনি-ঋষি এবং দেবগণের উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে, ব্যাস-বাল্মিকীর মতো মুনি-ঋষিরাও অবতাররূপী ভগবানকে জানতে বহু সাধনা করেছেন। খনিতে মাটিমাখা গুপ্ত মণিমাণিক্য যেমন সাধারণ মানুষ চিনতে পারে না—

তেমনি গুপ্ত সপার্ষদ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকেও সাধারণ মানুষ চিনতে পারেনি।

তবে কৃপাময় ঠাকুর কৃপা করে কারও কারও কাছে ধরা দিয়েছেন। ভগবান ভক্তবৎসল। ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। গীতাতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, ‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্’—যে আমাকে যেভাবে চায়, আমি সেইভাবেই তার মনোবাসনা পূর্ণ করি। এটিই তো তাঁর পরম করুণা! আমরা ভাগবতে দেখেছি, নন্দ-যশোদা যাঁকে পুত্ররূপে পেয়েছেন, তিনিই স্বয়ং ভগবান—যাঁর গুণকীর্তন করে মানুষ মুক্তি লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এই জ্ঞান, নন্দ-যশোদার বাৎসল্যপ্রেমের আতিশয্যে প্রকাশ পায়নি এবং সেই জন্যই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতিও সাধারণ শিশুরূপে সেই পরম বাৎসল্য-প্রেমরস আস্বাদন করেছেন। প্রেমের জন্যই নন্দ ঘোষ, জগৎপিতারও পিতা হয়েছেন। আর জগৎপিতাও নিজের পিতৃত্ব ভুলে নন্দের পুত্রত্ব স্বীকার করে ঈশ্বরের বাল্যলীলারসে জগৎকে ভাসিয়েছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে গিয়ে বলেছেন, ‘আপনি ত্রিজগতে কারও বশীভূত না হলেও আপনার ভক্তেরা তাঁদের বাৎসল্যপ্রেম দিয়ে আপনাকে বশীভূত করে থাকেন।’ ভক্তের ভাব ও প্রার্থনা অনুসারে ভগবানের শ্রীমূর্তির আবির্ভাব হয়ে থাকে। একই ভগবান বসুদেব-দেবকীর প্রার্থনানুযায়ী চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং নন্দ-যশোদার ঐকান্তিক প্রার্থনায় দ্বিভুজ বালগোপালরূপে তাঁদের কাছে এসেছেন।

ব্রহ্মা ভাবছেন, ভগবান যখন বৈকুণ্ঠের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বিষ্ণু-মহেশ্বরের স্তবস্তুতিতে খুশি হন, তখন তাঁর মধ্যে অসীম ঐশ্বর্যের স্ফুরণ হয়। সেখানে কিন্তু ভগবানের মাধুর্যের প্রকাশ হয় না। ব্রহ্মা ঠিক করলেন, শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে গোবৎস ও গোপবালকদের সরিয়ে নিলে তিনি কীরকম মুগ্ধবৎ ব্যবহার করেন—তাঁর সেই মাধুর্যলীলা প্রাণভরে একবার দেখতে হবে। তাই তিনি ব্রজধামে এসে যখন কৃষ্ণ

এবং গোপবালকেরা আহার করছিলেন, সেই সময় কৃষ্ণের অন্যমনস্কতার সুযোগে তাঁর ওপর মায়া বিস্তার করে গোবৎস এবং গোপবালকদের স্থানান্তরিত করলেন।

ব্রজের গোপীরা এবং গাভীরা কৃষ্ণকে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি ভালবাসেন। কিন্তু তাতে তাঁদের মন ভরে না, আনন্দ হয় না। তাঁদের মনোগত বাসনা ছিল কৃষ্ণকে তাঁদের গর্ভজাত সন্তান হিসেবে লাভ করা। শ্রীকৃষ্ণ ঠিক করলেন যে, ব্রহ্মার মনোবাসনা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রজের গোপী এবং গাভীদের সন্তান হয়ে তাদের মনোবাসনা পূরণ করবেন। আর তাই তিনি নিজেই গোপবালক এবং গোবৎস সেজে, নিজের সঙ্গেই নিজে একবছর খেলা করলেন।

ভগবান সকলের দৃষ্টির সামনে লীলা করলেও কেউই তাঁর মহিমা জানতে পারে না। দেবকীনন্দন ও যশোদানন্দন স্বরূপত এক এবং অভিন্ন। কেবলমাত্র ভাবের পার্থক্যের জন্যই ভগবানের প্রকাশের তারতম্য হয়ে থাকে।এখানেও ভগবান ঠিক সেরকমভাবেই ক্ষুদিরাম-চন্দ্রামণির তনয়রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। পুঁথিকার বলছেন, আমরা যদি তাঁর শরণ নিই, তাহলেই তিনি ধরা দেবেন। হে মন! তুমি তাঁর লীলাকথা শোনো।

আমাদের মনে রাখা দরকার, ভগবান দেখেন মন, আর মানুষ দেখে কাজ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি ঘটনা। ঠাকুর একদিন গিরিশবাবুর থিয়েটারে গেছেন। গিরিশবাবু সেদিন নেশার ঝোঁকে ঠাকুরকে অকথ্য কথাবার্তা বলে একরকম প্রায় তাড়িয়েই দিলেন। যাঁরা সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা গিরিশবাবুর ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ঠাকুরকে বললেন—তিনি যেন আর কখনও ঐ মাতালটার কাছে না যান। পরদিনও দক্ষিণেশ্বরে ঐ কথাই হচ্ছিল। ঠিক এই সময়ে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করতেই ঠাকুর আগের দিনের ঘটনা আনুপূর্বিক শুনিয়ে বললেন—রাম তুমি কি বল ? রামবাবু বললেন—

দেখুন, কালীয় নাগ শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিল : প্রভু, তুমি আমায় বিষ দিয়েছ, এখন আমি অমৃত কোথায় পাব? তুমি যা দিয়েছ তাই দিয়েই তো তোমার অভ্যর্থনা করেছি! —রামবাবুর কথা শুনে ঠাকুর বললেন, তবে চলো তোমার গাড়িতেই একবার গিরিশের কাছে যাই। এদিকে নেশা কেটে যেতেই গিরিশবাবু তাঁর কৃতকর্মের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে, খাওয়াদাওয়া ছেড়ে কান্নাকাটি করছিলেন।

ঠাকুরকে হঠাৎ অযাচিতভাবে আসতে দেখেই কাঁদতে কাঁদতে গিরিশ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললেন, আজ যদি তুমি না আসতে তাহলে বুঝতাম যে, নিন্দা-স্তুতিতে তোমার এখনও সমজ্ঞান হয়নি, তুমি এখনও পরমহংস নামের যোগ্য নও। এখন বুঝেছি—তুমি সেই, তুমি সেই। আর আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না। এবার আর আমি তোমায় ছাড়ছি না। বলো ঠাকুর, তুমি আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে? —বলছেন আর অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জন করছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অবতারে যা ঘটেছিল, ভিন্ন পরিস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারেও তা-ই ঘটল! গিরিশবাবু সেদিন ঠাকুরকে কালীয় নাগের মনের ভাবই ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। তাই দেখা যাচ্ছে, ভগবান দেখেন মন, আর মানুষ দেখে কাজ।

‘শ্রীরামকুমার তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
ভক্তিমান শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতপ্রবর।।
… … …
মনমত পেয়ে কর্ম অনুজ তখন।
অগ্রজের অনুমতি করেন পালন।।’ (পৃঃ ৪০)

গ্রামে কিছুই হচ্ছে না গদাইয়ের। তাই ভক্তিমান, বাক্‌সিদ্ধ, শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিত দাদা রামকুমার গদাইকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। গদাইয়ের কলকাতায় আসাটা বড্ড যেন তড়িঘড়ি করে হয়ে গেল! কামারপুকুর-বাসীরা গদাইকে এত শীঘ্র ছাড়তে হবে, ভাবতেই পারেনি। কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটিই ঘটেছিল। ব্রজবাসীরা কল্পনাও করতে পারেনি যে, তাদের গোপালকে কখনও কাছ-ছাড়া করতে হতে পারে!

কলকাতায় আসলেও গদাইয়ের মন, ঘুরে বেড়ায় গ্রামের মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে। মনের মুকুরে ভেসে ওঠে কত ভালবাসা-ভরা চেনা মুখ—যাদের অকৃত্রিম আন্তরিকতার কথা মনে পড়ে। এই ইট-কাঠের জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যাবে কি সেই সরলতা-মাখা আন্তরিকতা? সেই নিঃসঙ্গ থাকার শান্তি? সেই অকৃত্রিম হৃদয়-নিংড়ানো ভালবাসা?

গদাইয়ের মনে প্রশ্ন জাগে—নির্জন না হলে, জনশূন্য না হলে ভক্তি লাভ হবে কি করে? তাঁকে ভাবব কী করে?

একদিন দাদা রামকুমার গদাইকে বললেন, ‘এবার একটু মন দিয়ে লেখাপড়া কর। কামারপুকুরে পাড়ার সব ছেলেদের নিয়ে গাঁ-ময় তো অনেক ঘুরে বেড়ালি! ষোলো-সতেরো বছর বয়স হল, কিছুই শিখলি না!’

লেখাপড়া? —গদাই তার আয়ত-উজ্জ্বল সরলতাপূর্ণ চোখ দুটি তুলে তাকিয়ে রইল দাদার মুখের দিকে। রামকুমার বললেন, ‘হ্যাঁ। শাস্ত্র, ব্যাকরণ ইত্যাদি একটু মন দিয়ে পড়ে নিজেকে তৈরি করে নে।’

গদাই স্পষ্ট করে জানালো—চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যে? অর্থকরী বিদ্যে? ও শিখে আমি কি করব, দাদা? আমি চাই আসল জ্ঞান। লেখাপড়া শিখে তথাকথিত পণ্ডিতের তকমা গায়ে লাগিয়ে নিজেকে জাহির করতে চাই না। রামকুমার বিরক্ত হলেন। গদাইয়ের কথা ধরতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—এ জ্ঞানের অর্থ কি? গদাই বললে—নেতি নেতি করে করে একেবারে শেষে যা বাকি থাকে, তা-ই। দাদা রামকুমার গদাইয়ের কথা বুঝতে না পেরে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন। কিন্তু গদাই একেবারে চুপ।

যখন সত্যিকারের জ্ঞান হয়, মানুষ তখন একেবারে চুপ হয়ে যায়, স্তব্ধ হয়ে যায়। সত্যিকারের জ্ঞান মানেই ব্রহ্মজ্ঞান। ঠাকুর মাঝে মাঝে একটি গল্প বলতেন : একটি মেয়ের স্বামী এসেছে—সঙ্গে সব বন্ধুরা আছে। তারা মেয়েটির স্বামীকে চেনে না। বন্ধুরা জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে আর মেয়েটিকে একজনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করছে, ঐটি তার বর কি না? মেয়েটি অল্প হেসে বলছে, না। —ঐ-টি? —উঁ হুঁ। —ঐ-টি? তাও না। এমনই চলছে নেতি নেতি। শেষকালে যখন ঠিক ঠিক স্বামীকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, তবে ঐটিই তোর বর? তখন সে মেয়ে হ্যাঁ-ও করে না, না-ও করেনা। শুধু একটু হেসে চুপ করে থাকে। তখন মেয়েটির বন্ধুরা বুঝতে পারে, কে তার বর। ঠিক তেমনই যেখানেই ব্রহ্মের অনুভূতি, সেখানেই পূর্ণকুম্ভের মতো শব্দহীন। সেখানেই সম্পূর্ণ স্তব্ধতা। সেখানেই মৌনতা।

রামকুমার ঠিক করলেন, গদাই যখন লেখাপড়া করবেই না, তখন পুজো-অর্চা তো জানে; তাই করুক। দেবতার সেবা-পুজোই করুক।

ঝামাপুকুরে দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে গৃহদেবতার নিত্যপুজো। রামকুমার সেখানে গদাইকে ঠাকুরের সেবা-পুজো করার জন্য নিয়োজিত করলেন। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে গদাইও মহাখুশি। কেননা এবার তার ঠিক ঠিক মনের মতো কাজ মিলেছে। দেবপূজার মতো আনন্দের কাজ আর আছে নাকি?

গদাই দেখতে যেমন সুদর্শন, তার গানের গলাটিও তেমন সুরেলা, মধুঢালা। গদাইয়ের গান যেই শোনে—সেই তন্ময় হয়ে যায়। তার শ্রীমুখের সুধাময় গান শুনে সকলের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে যেত। তার গানের মধ্যে মহাশক্তি লুকিয়ে থাকত। তাই সেই গান শুনে পাষাণহৃদয়-মানুষকেও অশ্রুবিসর্জন করতে হত। যাঁরা ঠাকুরের গান শুনেছেন তাঁরা মহা ভাগ্যবান। কামারপুকুরে প্রসন্নময়ীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হত, কেন আজকাল কীর্তন, যাত্রা, কথকতা ইত্যাদি শোনেন না। তখন তিনি বলতেন, ‘গদাইয়ের গান শোনার পর আর কারও গানই ভাল লাগে না, কানে লাগে না। গদাই আমাদের কানটাই খারাপ করে দিয়েছে।’

‘শ্রীপ্রভুর স্বভাবেতে বহে অবিকল।
কুসুমের পরিমল কোমল শীতল।।
… … …
যে বারেক দেখিয়াছে শুনিয়াছে গান।
তার ঘরে আর নাহি থাকে মন-প্রাণ।।’ (পৃঃ ৪০-৪১)

দেখা যেত কামারপুকুরের মতোই গদাইয়ের কাছে ঝামাপুকুরের সম্ভ্রান্ত বাড়ির মহিলাদেরও একটুও সংকোচ নেই। যজমান বাড়ির মহিলা ও পুরুষ সকলেই গদাধরকে কাছে পেয়ে মহা খুশি। কেননা আনন্দস্বরূপ ভগবান যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তাঁর উপস্থিতিতে আশপাশের সমস্ত কিছুই আনন্দময় হয়ে ওঠে। ঠাকুর কথামৃতে বলেছেন, ‘রামচন্দ্র যখন সভাতে এলেন, তখন সভায় শত সূর্য যেন উদিত হল। …সভাস্থ সকলের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হল।’

এখানেও ভক্তদের সেই একই অবস্থা! ভক্ত ভগবানকে পেয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন। আর ভগবান নিজেকে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করে আনন্দ পান। তাই যজমান-বাড়ির রমণীরা প্রায়ই যত্ন করে, মনের মতো করে, গদাইকে ফল-মিষ্টি খাইয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করতেন। একদিন তাকে না দেখতে পেলেই অত্যন্ত ব্যাকুলা হয়ে, যে-কোনও উপায়ে গদাধরের খবর সংগ্রহ করাতেন। এই কলকাতাও হয়ে উঠল তার কাছে দ্বিতীয় কামারপুকুর। কিছুদিন যেতে না যেতেই ঝামাপুকুরের যজমান-বাড়ির প্রত্যেকেই লক্ষ্য করলেন, এই নবীন পূজারি, সৃষ্টিছাড়া ঔদাসীন্য নিয়েও অসীম আনন্দের প্রতিমূর্তি। তিনি তো জাগতিক জিনিস নিয়ে ভেসে বেড়াবার জন্য আসেননি। তিনি যে অমৃত সাগরের ডুবুরি।

উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর প্রসঙ্গে আছে—ব্রহ্মবাদিনী-মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য পৃথিবীর যাবতীয় দুর্লভ সব ধনদৌলত উপহার দিলেন। অত্যন্ত অনাসক্ত হয়ে মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন : ‘যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?’ —যা দিয়ে আমি অমৃত হতে পারব না—তা নিয়ে আমি কি করব?

গদাইয়েরও তো সেই একই প্রশ্ন : ‘লেখাপড়া দিয়ে আমাদের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা চৈতন্যের জাগরণ ঘটানো যাবে কি? যে বিদ্যে দিয়ে আমাদের অন্তরের চৈতন্যকে জাগানো যাবে না, তা শিখে আমি কি করব? এই দুর্লভ জিনিসটি যে একমাত্র যোগের মধ্যে দিয়েই লাভ করতে হয়। যোগের সহজ অর্থ হল—যুক্ত হয়ে থাকা। যেমন বাতাসহীন জায়গায় নিষ্কম্প প্রদীপের শিখা। যার অস্তিত্ব, যার অধিষ্ঠান, স্থির স্থিতিতে—ঊর্ধ্বের সঙ্গে সুন্দর স্পর্শে।

।। পুরী প্রতিষ্ঠা ।।

রানি রাসমণি কাশী যাবেন। রাসমণি কলকাতার জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী। তিনি মহা-ভক্তিমতী। মা কালীর রাঙা পা-দুখানিই তাঁর ঐকান্তিক কামনার বস্তু। আর তাই তিনি ডাকসাইটে জমিদার গৃহিণী হয়েও অন্তরে ভিখারিনি। তেজস্বিনী হয়েও যেন মমতার জাহ্নবী-যমুনা। তিনি রাজরাজেশ্বরী হয়েও তাঁর বহু অভিলষিত কাম্যবস্তু মহাযোগেশ্বরী মহাকালীর করুণা। সেটি লাভ করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তিনি তাঁর মনের মণিকোঠায় পাঁচমিশালি ফুলের ডালি সাজিয়ে রেখেছেন। ভক্তি আপ্লুত হয়ে সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করছেন। এবার রামকৃষ্ণ অবতারে বিশেষ কার্যসাধনের উদ্দেশ্যেই তাঁর জন্মগ্রহণ।

রানি কাশী যাবেন ঠিক করেছেন। দর্শন করবেন মা অন্নপূর্ণাকে ও চৈতন্যময় দেবাদিদেব মহাভিক্ষুক বাবা বিশ্বনাথকে। বহু ধনদৌলত এই উদ্দেশ্যে আলাদা করে রেখেছেন। ঠিক করেছেন দরাজ হাতেই তা খরচ করবেন। বাড়ির কাছেই গঙ্গায় বাবুঘাট। সেখানে বাঁধা হয়েছে সারি সারি প্রায় একশোখানি নৌকো। থরে থরে নৌকোতে সম্ভার সাজানো হয়েছে। মাঝিমাল্লা, দাসদাসী, আত্মীয়পরিজনে গঙ্গার ঘাট গমগম করছে।

নৌকোর বহর ছেড়ে দিয়েছে। রাতে রানি ঘুমিয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ বলেন যাত্রা করার পূর্বরাত্রে তিনি মা কালীর নির্দেশ পেয়েছিলেন। আবার কারও কারও মতে তিনি উত্তরে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত এসেছিলেন। রাসমণি এই সময়ে একটি দিব্য-স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবী মা কালী, মা-ভবতারিণী সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, ‘কাশী যাবার কোনও প্রয়োজন নেই। এই ভাগীরথীর তীরেই এক মনোরম স্থানে তুমি পুরী নির্মাণ করে আমাকে প্রতিষ্ঠা করো। আমাকে অন্নভোগ দেবার ব্যবস্থা করো। তোমার প্রতিষ্ঠিত মূর্তিতেই অধিষ্ঠিত হয়ে তোমার পূজা গ্রহণ করব। এ-বিষয়ে মনে কোনও সংশয় রেখো না।’ আনন্দে বিহ্বল হয়ে রানি কাশী যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

রানি রাসমণি হালিশহরের কোণা গ্রামে বাংলা ১২০০ সালের আশ্বিন মাসে দরিদ্র পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। কিন্তু ভক্তিমান পিতার স্নেহ-ভালবাসায় বড় হয়ে ওঠেন। শোনা যায়, ছোটবেলায় তাঁর ডাকনাম ছিল ‘রানি’। বাবা হরেকৃষ্ণ দাসের কাছে তিনি কিছু কিছু লেখাপড়াও শিখেছিলেন। মুখে মুখে শুনেছিলেন রামায়ণ এবং মহাভারতের কাহিনী। এগারো বছর বয়সে সুন্দরী এবং সুলক্ষণা দেখে, তৎকালীন কলকাতার বিশিষ্ট ধনী প্রীতিরাম দাস নিজপুত্র রাজচন্দ্র দাসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীরূপে রাসমণিকে বরণ করে নেন।

শ্বশুর-শাশুড়ির ওপর তাঁর অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকায় তাঁরা এই পুত্রবধূটিকে নিজের মেয়ের মতোই স্নেহ করতেন। রাসমণি শুধুমাত্র তাঁর মধুর ব্যবহারের জন্যই যে সকলের খুব প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছিলেন তা নয়, বাড়ির সকলেই মনে করতেন, রাসমণি তাঁদের বাড়ির লক্ষ্মী। কেননা দেখা গেল তাঁকে পুত্রবধূরূপে লাভ করার পর থেকে প্রীতিরাম দাসের প্রভূত অর্থাগম হতে থাকে। রাসমণি নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বলে ধীরে ধীরে স্বামীর ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনি বিশেষ কতকগুলি গুণের অধিকারিণী ছিলেন। পরের দুঃখে কাতর হয়ে যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের দুঃখ দূর করতে পারছেন, ততক্ষণ তিনি মনে শান্তি পেতেন না। এ ছাড়াও বন্যায় ও দুর্বিপাকে আর্ত মানুষের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা, গঙ্গার ঘাট নির্মাণ করা, গঙ্গাযাত্রীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি করে দিয়ে তিনি বহু মানুষের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠেছিলেন।

কলকাতার বুকে তাঁর অক্ষয়কীর্তি রাজচন্দ্র দাসের নামে বাবুঘাট ও বাবুরোড। তিনি চার কন্যার জননী ছিলেন। রাজচন্দ্রবাবু স্বল্পায়ু হওয়ায় তাঁকেই শক্ত হাতে স্বামীর ব্যবসা ও জমিদারির হাল ধরতে হয়েছিল। এসব সত্ত্বেও তিনি কঠোর ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় তিনি জপ, পুজো ও পাঠাদিতে বহু সময় কাটাতেন। পূজ্যপাদ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজ, যিনি 'লাটু' মহারাজ নামেই বেশি পরিচিত, তিনি এই জপ সম্বন্ধে বলতেন : পৃথিবীতে যত কিছু আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার 'জপ'।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' রানি রাসমণির তেজস্বিতার বহু কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি ছোট্ট ঘটনা এরকম :

রানি রাসমণির বাড়ির পাশেই গোরা পল্টনদের ছাউনি বা ব্যারাক। যখনকার কথা বলা হচ্ছে, তখন রাজচন্দ্রবাবু আর ইহলোকে নেই। একদিন নেশাগ্রস্ত একদল সৈন্য, রানির বাড়ির মধ্যে ঢুকে দারোয়ানদের আহত করে বাড়ি লুঠপাট করতে শুরু করল। সে-সময় বাড়িতে কোনও পুরুষ-মানুষ ছিলেন না। শেষপর্যন্ত রাসমণি নির্ভয়ে মত্ত সেনাদের সামনে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। রানির ব্যক্তিত্ব, প্রতাপ ও হৃদয়বত্তার জন্য কলকাতাবাসী ও প্রজাগণ রাসমণিকে 'রানি' বলে সম্বোধন করতেন। রানি রাসমণি ছিলেন উচ্চ আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্না ঠাকুর বলতেন : 'রাসমণি ছিলেন মা জগদম্বার অষ্টসখীর এক সখী।'

একটি কথা প্রচলিত আছে—'গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল'। আর তাই রানিও মা-কালীর মন্দির নির্মাণের জন্য ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে জমির খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু গঙ্গার পশ্চিমকূলে কোনও উপযুক্ত জমি পাওয়া গেল না। জমি পাওয়া গেল পূর্বকূলে দক্ষিণেশ্বরে। একসাথে ষাট বিঘে জমি কিনলেন রাসমণি। এই জমির কিছুটা অংশের মালিক ছিলেন হেষ্টি সাহেব। আর বাকি অংশে মুসলমানদের কবরখানা ও পীরের স্থান। জমির গড়ন খানিকটা কচ্ছপের পিঠের মতো। তন্ত্রমতে এই রকম জমিই শক্তিসাধনার জন্য উপযুক্ত। ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া কিছু হবার উপায় নেই। আগে থেকেই মা ভবতারিণী গঙ্গার পূর্বকূলে তাঁর স্থান নির্বাচিত করে রেখেছেন।

যেখানে মন্দিরটি অবস্থিত ঠিক তার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে পতিতপাবনী মা-গঙ্গা, সমস্ত দেবায়তনটির প্রতিবিম্ব বুকে ধারণ করে, দুর্বার গতিতে বয়ে চলেছেন। বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে মায়ের মন্দির এবং দেবীমূর্তি তৈরি হল।

'শ্যামালয়-বিনির্মাণে বহু অর্থ ব্যয়।
যত লাগে দেয় রানি কাতর না হয়।।' (পৃঃ ৪২)

রাসমণি জাতিতে ছিলেন মাহিষ্য, কিন্তু তাঁর স্বভাবটি ছিল অত্যন্ত উদার এবং যথার্থই রাজ্ঞীসুলভ।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে অত্যন্ত সুন্দর দুটি মন্দির—একটি রাধাশ্যামের, অপরটি—নবরত্নবিশিষ্ট মা-কালীর মন্দির। এর দক্ষিণে

নাটমণ্ডপ। উত্তরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দির আর পশ্চিমে দ্বাদশ শিব-মন্দির। আর এই মন্দিরের দক্ষিণে অতি সুশোভন চাঁদনী ঘাট। মাতৃমন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণে দুটি নহবতখানা। মাঝখানে প্রশস্ত চত্বর। উত্তরে-দক্ষিণে-পূর্বে আরও তিন সারি দালান। গঙ্গাগর্ভে ঝকঝকে বাঁধানো ঘাট। বিভিন্ন রকম পুষ্পবৃক্ষ-পূর্ণ চমৎকার বাগান। স্থানটি নানা প্রজাতির পাখির কলকাকলিতে মুখরিত। নৃত্যরতা মা-গঙ্গার সদা আনন্দময়ী অপূর্ব রূপ। স্থানটির সামগ্রিক সৌন্দর্যবিন্যাস অধ্যাত্মপিপাসুর হৃদয়ে কাশীতুল্য।

অপূর্ব সুন্দর দেবায়তন। ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা প্রায় দুঃসাধ্য, অনিন্দ্যসুন্দর দেবায়তনটির জমাটবাঁধা আধ্যাত্মিক পরিবেশে পবিত্রতা, স্বর্গীয় সৌন্দর্য এবং দৈবীশক্তি ভক্তজনের প্রাণ ও মনকে স্নিগ্ধ করে।

এই দেবালয়টি তৈরি হতে সময় লেগেছিল প্রায় দশ বছর। এই দশটি বছর রানি ব্রতধারিণী ব্রহ্মচারিণীর জীবনযাপন করেছেন। অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-সংযমের মধ্য দিয়ে ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন গ্রহণ এবং ভূতলে শয়ন করতেন। আর জপ করেছেন অবিশ্রান্ত। তারপর মা ভবতারিণীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

প্রশ্ন জাগতে পারে—রানি খুবই ভক্তিমতী কিন্তু কিসের জন্য এত কঠোর অনুষ্ঠান ও কৃচ্ছ্রসাধন?

তার কারণ, আমরা এই দেহ-মনকে যদি তাঁর উপযুক্ত করে তুলতে না পারি, তবে দেবী (মা-কালী) শুনবেন কেন আমাদের আবাহন? হয় আসবেন না, আর নয়তো এসেও ফিরে যাবেন।

ভক্ত সবসময় নিজের ইষ্টদেবতাকে আত্মবৎ সেবা করতে ভালবাসেন। আর তাই মা-কালী অর্থাৎ মা-ভবতারিণীকে অন্নভোগ দেবার জন্য রানির মন-প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু রানি দেখলেন, অন্নভোগ দেওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা তাঁর জাতি ও সামাজিক প্রথা। কেঁদে কেঁদে রানি মা-ভবতারিণীকে তাঁর মনের দুঃখ জানাতে লাগলেন।

এবার তিনি অন্নভোগ নিবেদন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নানা স্থানে তাঁর কর্মচারীদের পাঠালেন শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিতদের মতামত জানতে। তৎকালীন সমাজের কোনও ব্রাহ্মণ উপস্থিত সুপরামর্শ বা সুবিধান দিয়ে রানিকে উৎসাহিত করলেন না। পণ্ডিতদের দ্বারা বারবার প্রত্যাখ্যাতা হয়ে যখন তিনি নিদারুণ মনোকষ্টে দিন কাটাচ্ছেন, ঠিক সেই সময় অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ঝামাপুকুরের রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চতুষ্পাঠী (টোল) থেকে একটি সুখবর এল। তিনি বিধান দিলেন : মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে রানি যদি দেবোত্তর সম্পত্তি কোনও সদ্‌ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ যদি ঐ মন্দিরে দেবীপ্রতিষ্ঠা করে অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন, তাহলে শাস্ত্রনিয়ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ এবং উচ্চবর্ণের ব্যক্তিগণ মন্দিরে দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করতে পারবেন।

শ্যামামায়ের নিষ্ঠাবান ভক্ত এই রামকুমার। তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞ, তেমনই ভক্তিমান। মা কালী—মা আদ্যাশক্তি তাঁর জিবে জ্যোতিষের মন্ত্র লিখে দিয়েছিলেন। সেই জন্য তিনি হয়েছিলেন বাক্‌সিদ্ধ। কোনও অবস্থাতেই তাঁর কথা মিথ্যে হত না।

কিন্তু রামকুমারের এ-ব্যবস্থায় পণ্ডিতমহল খুশি হতে পারলেন না। আড়ালে-আবডালে নানা কথা বললেও কোনও পণ্ডিতের সাধ্য ছিল না যে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিধান খণ্ডন করে বিরুদ্ধাচরণ করেন।

কিন্তু অন্নভোগের কাজে ব্রতী হবেন এমন ব্রাহ্মণ পাওয়ার সমস্যা দেখা দিল! কৈবর্তের ঠাকুরকে কে অন্নভোগ দেবে? অব্রাহ্মণ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবতার পায়ে প্রণাম পর্যন্ত নিষিদ্ধ। তাই ভীষণ মর্মবেদনায় রাসমণি অত্যন্ত কাতর হলেন। মনে মনে বললেন : হে মা-কালী, হে মা-ভবতারিণী, আমায় এমন নীচ কুলে জন্ম দিলে! আমার সঙ্গে যুক্ত বলেই তো অন্নভোগ দেবার ব্রাহ্মণ মিলছে না! শেষপর্যন্ত কি তোমায়

আমি অন্নভোগ দিতে পারব না? —ভক্তিমতী রানি শেষপর্যন্ত রামকুমারকেই পূজায় ব্রতী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। রামকুমারের মন সবসময়েই শ্যামামায়ের শ্রীপাদপদ্মেই রত। মায়ের সেবা-পূজা হবে না—এ খবর পেয়ে তিনি নিজেই পূজকের আসন গ্রহণ করলেন। কেননা এ কাজ শাস্ত্রমতে শুদ্ধ। শুধু লৌকিক আচারেই এতে দোষ।

কামারপুকুরের পশ্চিমে শিহড় গ্রাম। ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের গ্রাম। রামকুমারের চেনা-জানা শিহড়-গ্রামের যত সদ্-ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁদের তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির কাজে নিযুক্ত করলেন। সৎকুলে জাত সেবাইতের অভাব হচ্ছিল রানির। মায়ের অশেষ করুণায় সমস্ত প্রয়োজনীয় কর্মী পেয়ে রানি আনন্দে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে (৯/২২) শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন :

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।'

—যে-সকল ব্যক্তি অনন্যচিত্তে উপাসনা করে আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে থাকে—শরীরধারণ উপযোগী খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনও চিন্তা না করে সম্পূর্ণ মন আমাতে অর্পণ করে—আমি তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই অযাচিত হয়েও এনে থাকি। —ভগবানের এই প্রতিজ্ঞা রানির জীবনে আক্ষরিক অর্থে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠল।

মন্দির তৈরি হল। সেই সঙ্গেই তৈরি হল জগন্মাতার চমৎকার মূর্তি। কাশী থেকে আনা মূর্তি রাখা ছিল বাক্সের মধ্যে। দেখা গেল মূর্তি ঘামছেন। রাত্রে রানি স্বপ্নে মাকে দর্শন করলেন। কাতর হয়ে মা বলছেন : 'আমাকে এমনই করে বাক্সের মধ্যে রেখে আর কতদিন কষ্ট দিবি? তাড়াতাড়ি আমাকে প্রতিষ্ঠা কর।' রানি অধীর হয়ে উঠলেন। আসন্ন যে-কোনও শুভদিনেই দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি পণ্ডিতদের তাড়া দিতে লাগলেন। পাঁজিতে দেখা গেল স্নানযাত্রার দিনই নিকটতম শুভদিন। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে একটা গুঞ্জনও উঠল। মা ভবতারিণী শক্তিস্বরূপিণী। এই শক্তিস্বরূপিণী মাকে বিষ্ণু-পর্বাহে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কী করে? রানি বললেন : হোক বিষ্ণু-পর্বাহ। তবু আর অপেক্ষা করা যায় না—মায়ের বড় কষ্ট হচ্ছে। মা আকুল হয়ে উঠেছেন। যা শক্তি তা-ই যে মাধুরী—তাইতো 'পরমাসি মায়া'। যিনি কালী, তিনিই তো লক্ষ্মী। আবার তিনিই লজ্জা—তিনিই পদ্মালয়া, সর্বার্থসাধিকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ অনুযায়ী ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিনই মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন নির্ধারিত হল।

ধীরে ধীরে সবকিছুই সুন্দর সমাধান হতে দেখে—রানি অশ্রুসজল চোখে ভাবতে লাগলেন :

এত স্নেহ মা-গো তোমার, তবুও করি অবিশ্বাস।
অন্ধ মনের যায় না সন্দ যতই তুমি দাও আশ্বাস।।

রানি পণ্ডিতদের কথা নাকচ করে দিয়ে বিষ্ণু-পর্বাহেই মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন ঠিক করলেন। নির্লোভ রামকুমারকে পূজকরূপে পেয়ে রাসমণি ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিনই মহাসমারোহের সঙ্গে শ্রীশ্রীজগদম্বা মা-ভবতারিণীকে নতুন নবরত্নবিশিষ্ট মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করালেন। শোনা যায় 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে সেদিন পুরী, মানুষের উল্লাসে-উচ্ছ্বাসে দিনরাত কোলাহলপূর্ণ হয়ে যেন আনন্দের হাট-বাজারের রূপ ধারণ করেছিল। রানি দরাজ হাতেই সেদিন অতিথি-অভ্যাগতদের প্রচুর জিনিসপত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করেছিলেন। সুদূর কান্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা, নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থানগুলি থেকে বহু পণ্ডিত চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন। রানি প্রত্যেক পণ্ডিতকে রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় এবং একটি করে সোনার টাকা দিয়েছিলেন। ঠাকুর পরবর্তী কালে বলতেন : 'ঐসময় দেবালয় দেখে মনে হয়েছিল, রানি যেন রজতগিরি তুলে এনে এখানে বসিয়ে

দিয়েছেন।’ সেই পুরীর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের অনায়াসে স্থান সংকুলান হয়। গঙ্গার কূলে এমন সুন্দর সুসজ্জিত দেবালয় কলকাতায় কেন আর অন্য কোথাও নেই। এই দেবালয় দর্শন করে উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মন-প্রাণ এক অতীন্দ্রিয়লোকে বিচরণ করছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ অনুযায়ী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় গদাইকে সঙ্গে নিয়ে কালীবাটী প্রতিষ্ঠার আগের দিনে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনেই উৎসব আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। বিরাট উৎসব। যাত্রা, কালীকীর্তন, শ্রীমদ্‌ভাগবত, রামায়ণ ইত্যাদি পাঠ দেখা ও শোনার জন্য চারপাশে মানুষের ও ভক্তদের ভিড়ে গমগম করছে। যেন আনন্দরূপ ফোয়ারার মুখ খুলে গিয়েছে। এই সুন্দর জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব দেখতে দেখতে সমাগত মানুষের মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত লোককে এই আনন্দযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করাতে পারলে মন পরিতৃপ্ত হত। দূরদূরান্ত থেকে নদীর স্রোতের মতো সাধারণ মানুষ এই উৎসব দেখার জন্য এসেছেন। ভিড় যেন উপচে পড়ছে। সদাব্রত অন্নসত্র চলছে। এখানে আজ আহূত-অনাহূতের কোনও ভেদ নেই।

আজকের এই আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু মা-ভবতারিণী। ‘মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরিম্, কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডমালীগলদ্রুধির চর্চ্চিতাম্।।’ মা পাষাণময়ী মূর্তিতে অধিষ্ঠান করছেন। কিন্তু তিনি কি সত্যিই পাষাণী! সে কী কথা! তিনি যে করুণাদ্রবা, আনন্দময়ী। কেউ কেউ যে বলেন তিনি মৃত্যুরূপা? না-না তা কি কখনও হয়? তিনি যে মৃত্যুবর্জিতা আনন্দরূপিণী—শিবসুন্দরী; ত্রিনয়নী—তেজোরূপোজ্জ্বলা। শুধু কি তাই? তিনি যে পুরাতনী, পরমার্থা—কাললোকবাসিনী কালী কপালিনী। তাই বলা যায়, ‘দেখে যারে রুদ্রাণী মা, সেজেছে আজ ভদ্রকালী।’ যেদিন রাধা-মাধব ও মা-কালীর মূর্তি সুসজ্জিত করা হল, সেদিন যেন অগণিত মানুষের ঢল! যেন বাঁধভাঙা স্রোতের মতো অসংখ্য মানুষের মিলনমেলা!

গর্ভমন্দিরে রূপোর সহস্রদল পদ্ম। তার ওপর দক্ষিণ শিয়রে শবীভূত সদানন্দ শিব শুয়ে আছেন। তাঁরই বক্ষোপরি দণ্ডায়মানা মা-ভবতারিণী। শ্রীঅঙ্গে লাল বেনারসী শাড়ি। মাথায় মুকুট। গলায় সোনার মুণ্ডমালা। মায়ের সর্বাঙ্গ ঝলমল করছে। ‘নানা ভরণ-শোভাঢ্যা, নানারত্নোপশোভিতা, শ্রেষ্ঠৈশ্চ মুক্তিকৈ সর্বা, দিব্যহারপ্রলম্বিভিঃ।।’ কটিতটে সারি সারি খণ্ডিত নরকর। মা চতুর্ভুজা। দুই বাম করে নৃমুণ্ড ও অসি। আর দক্ষিণ দুই করে বর ও অভয়মুদ্রা। ভবতারিণী মা-কালী দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর অপরূপ রূপ-প্রভাবে সমস্ত দেবপুরীটিতেই এক অপূর্ব ঐশ্বরিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আর তাই তো চারিদিকে এত আনন্দোচ্ছ্বাস! ‘বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না, মা আমার তাই দিগ্বসনা।’ মায়ের মিষ্টি শ্রীমুখের দিকে সারাটিক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও মনের আশ যেন আর মেটে না।

মা ভবতারিণীকে হঠাৎ দেখলে ভুল হয়ে যায়, মনে সন্দেহ হয় ইনি শ্যামা না শ্যাম?

‘অতুল উপমা রূপ কান্তি প্রতিমার।
শ্যাম-অঙ্গে শোভে যেন শ্যামা অলঙ্কার।।’ (পৃঃ ৪৪)

ভগবানের মানবলীলা মানুষকে ভগবদ্‌মুখী করার জন্য। প্রত্যেকটি লীলার পেছনে আছে ভক্তকে তাঁর নিজের দিকে আকৃষ্ট করা। শ্যাম না শ্যামা—মনের এই দোদুল্যমান অবস্থা কিছুটা দূর করার জন্য ব্রজধামের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত একটি রাতের ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে সমস্ত ব্রজধাম আলোকিত হয়ে উঠেছে দেখে নবম বর্ষীয় বালক গোপাল বনের মধ্যে গিয়ে মধুর স্বরে বাঁশি বাজাতে লাগলেন। ভগবৎ-প্রেম উদ্রেককারী সেই বাঁশি শুনে শুধু গাছপালা, পশুপাখীই মোহিত হয়েছে তাই নয়, ঐশ্বরীয় সুরমূর্ছনায় ঝঙ্কৃত হয়ে যমুনা নদীও যেন উজানে বইছে। ফুলের গন্ধে সমস্ত ব্রজভূমি

আমোদিত। গুঞ্জন ভুলে গিয়ে গানে-গন্ধে ভ্রমরের দল ফুলের বুকে মুখ রেখে দিব্যভাবে আবিষ্ট হয়ে যেন মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

সেই সময় ব্রজগোপীরা কেউ কেউ স্বামীদের পরিচর্যা করছিলেন; কেউ বা আহার করছিলেন আবার কেউ বা শিশুদের দুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের কাজ ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর মধুর ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে ফুটফুটে চাঁদের আলোয় বন-মধ্যে কৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলেন। যাঁরা কৃষ্ণগতপ্রাণ, তাঁদের হৃদয়ের অনুভূতির সঙ্গে যদি কোনও সাধক তাঁর হৃদয়ের অনুভব মেলাতে পারেন, তাহলে তিনিও যথার্থভাবে ভগবানের কৃপা-রূপ ভালবাসাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। দেহাভিমান ত্যাগ করে শুদ্ধ হতে পারলেই ভগবানের আকর্ষণ অনুভূত হবে অর্থাৎ তাঁর বাঁশি শোনা যাবে। তিনি তো সবসময়ই আমাদের ডাকছেন। তখন তাঁর সেই ডাক আমরা মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে পারব। ভগবানে আবিষ্ট-চিত্ত ভক্তদের কোনও শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান বা বিচার থাকে না। থাকে না শরীরবোধও। কৃষ্ণকে খুঁজে পেয়ে ব্রজগোপীরা ফুটফুটে সেই চাঁদের আলোয় আনন্দে নাচছেন, গান গাইছেন। পৌরাণিক অভিধান অনুযায়ী, এই সময় হঠাৎ কৃষ্ণ বললেন জটিলা-কুটিলা আয়ানকে নিয়ে আমাদের কাছেই আসছে। যেই জটিলা-কুটিলা এবং আয়ান বনের মধ্যে ওঁদের একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে, মুহূর্তের মধ্যে কৃষ্ণ বাঁশি ফেলে চতুর্ভুজা মা-কালীর রূপ পরিগ্রহ করলেন। আয়ান এমনিতে খুবই ভক্ত মানুষ। কিন্তু জটিলা-কুটিলার প্ররোচনায় এই সময় আয়ান তাদের কথার সত্যতা যাচাই করতে এসে দেখছেন, শুধু তাঁর স্ত্রী, বনফুল এবং বনফুলের মালা দিয়ে মা-কালীকেই আরাধনা করছেন, মা-কালীর শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করছেন। আয়ান এই দৃশ্য একটু দূর থেকে দেখে ভক্তিগদগদ চিত্তে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে চলে গেলেন।

তাই সাধক-কবিকে গাইতে শোনা যায় : 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন, মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব, যার হাতে মরণ-বাঁচন।।'

মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন গদাই মাতৃসমীপে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মনে হল মা-ভগবতী যেন কৈলাস শূন্য করে চলে এসে মন্দিরে বিরাজ করছেন। গদাই স্পষ্ট দেখলেন, করুণাময়ী মা ভবতারিণী পাষাণময়ী মূর্তি হলেও জীবন্ত হয়ে এই উৎসবের আনন্দোচ্ছ্বাস, বালিকার মতোই উল্লসিত হয়ে উপভোগ করছেন।

এত আয়োজন, সব জিনিসের ছড়াছড়ি—তবুও গদাই কিন্তু দেবপুরীর অন্নভোগ গ্রহণ করতে পারলেন না। দোকান থেকে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে তা-ই খেয়ে সারাটি দিন কাটিয়ে দিলেন। বেলা পড়ে গেলে আবার পায়ে হেঁটে ফিরে গেলেন ঝামাপুকুরে। এদিকে দাদা রামকুমারও দক্ষিণেশ্বরে গদাইয়ের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। কারও মুখে কোনও খবরও পাচ্ছেন না। শ্যামা-মায়ের সেবায় ব্যস্ত। সেবা-পরাধীন রামকুমার কটা দিন ব্যক্তিগতভাবে একদমই গদাইয়ের খোঁজ নেবার সময় করে উঠতে পারেননি। পরদিন এবং তার পরের দিনও দাদা রামকুমারকে ঝামাপুকুরে ফিরতে না দেখে গদাই মনে মনে ভাবছেন তবে কি দাদা কায়েমি হয়ে ওখানে থেকে যাবেন নাকি! এমনি করে ছ-ছটা দিন কেটে যাবার পর গদাই দাদার খোঁজে দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির। দাদাকে দেখতে পেয়েই গদাই জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'দাদা, এ কি? তুমি বাড়ি যাবে না?' রামকুমার বললেন, 'না রে, ভাবছি জীবনের বাকি কটা দিন এখানেই কাটিয়ে দেব। মন্দিরে মা-ভবতারিণীর পুজোর ভার নিয়েছি। টোল এবার তুলে দিয়ে এখানেই পাকাপাকিভাবে থাকব। তুইও চলে আয় আমার সঙ্গে।' এতে গদাইয়ের প্রবল আপত্তি। তিনি বললেন, 'তা কি করে হতে পারে? বাবা কখনও শূদ্রযাজী হননি। তাঁর ছেলে হয়ে কোন যুক্তিতে তাঁর প্রথার প্রতিকূলতা করবে? তুমি ওসব ছেড়ে দাও।'

রামকুমার অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু গদাই একেবারে স্থিরনিশ্চয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে দেখা যায় রামকুমার তখন বললেন, বেশ তাহলে ধর্মপত্র করা হোক। যা ধর্মপত্র তাই দৈবাদেশ—এটা তো মানতে হবে। ধর্মপত্র হচ্ছে একটা ঘটিতে কতকগুলি কাগজের টুকরোয় হ্যাঁ বা না লিখে রেখে দিতে হয়। তারপর কোনও একটি ছোট্ট শিশুকে দিয়ে যে-কোনও একটি কাগজের টুকরো ঐ ঘটি থেকে বের করতে হয়। সেই টুকরোটিতে যদি হ্যাঁ লেখা থাকে, তবে বুঝতে হবে 'করতে পারবে'। আর যদি না লেখা হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে 'করা চলবে না'। এই ধর্মপত্রের মধ্যে দিয়েই দেবতার আদেশ বোঝা যায়।

এবার ঘটি থেকে যেটি তোলা হল সেটিতে 'হ্যাঁ' লেখা আছে। তার মানে রামকুমার যেমন পুজোর কাজ করছেন সেই কাজই তাঁর করা উচিত।

রামকুমার ধীরে ধীরে গদাইকে বললেন, 'শাস্ত্রে যা বলে—আমি শুধু তা-ই করে থাকি। শাস্ত্রমতে এটি শুদ্ধ। শুধু লৌকিক আচারেই এতে দোষ।' গদাইকে শাস্ত্রগ্রন্থ খুলে দেখানোর পর গদাই সম্যক তৃপ্তি লাভ করলেন। প্রভুর অপূর্ব খেলার মধ্যেও কী অপূর্ব ভাব লুকিয়ে আছে।

'জগৎ জীবন বায়ু নয়নে না মিলে।
জলেস্থলে স্বভাবেতে সমভাব খেলে।।
কৌশলে গাঁথেন প্রভু হেন লীলাহার।
মানুষে কে বুঝে সুতা মধ্যে আছে তার।।' (পৃঃ ৪৫)

ঠাকুর বলতেন, 'নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মতো আচরণ করতে হয়—তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, কখনও বা ভয়—ঠিক মানুষের মতো। পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।'

আর তাই এখন গদাইয়ের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, তিনি কোথায় থাকবেন আর খাবেনই বা কি? দাদা রামকুমার বললেন, মন্দিরের

প্রসাদ খাবি। গদাই বললেন, তিনি কৈবর্তের অন্ন খেতে পারবেন না। রামকুমার বললেন, গঙ্গাজলে রান্না করে মাকে নিবেদন করা, মন্দিরের প্রসাদ খেতে দোষ কি? গঙ্গার নাম শুনে গদাই একেবারে গলে জল। সর্বকলুষনাশিনী মা গঙ্গা! গদাইয়ের মনে পড়ে 'তব তটনিকটে যস্য হি বাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ'। সেই পতিতপাবনী মা গঙ্গা! তাঁকে গদাই অস্বীকার করবেন কী করে?

গদাই বললেন : তিনি ভাণ্ডার থেকে সিধে নিয়ে নিজে রান্না করে খাবেন।

এখন প্রশ্ন—'কেন এই কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা'?

ঠাকুর বলতেন, 'পায়ে একটা কাঁটা ফুটলে আর একটি কাঁটা জোগাড় করে নিয়ে পায়ের কাঁটাটি বের করতে হয়। তার পরে, দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। ঠিক তেমনই অজ্ঞান-কাঁটা তোলবার জন্য জ্ঞান-কাঁটার দরকার। আর তার পরেই জ্ঞান ও অজ্ঞান দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। তখন বিজ্ঞান অবস্থা। ত্রিগুণাতীত অবস্থা।' তাই গীতায় অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন : 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন'। নিষ্ঠা না থাকলে সত্যে কী করে পৌঁছানো যাবে? নিয়মে না থাকলে কী করে নিয়মাতীত হওয়া সম্ভব? আগে শাসন চাই। শম-দম-সাধন চাই। তবে তো নির্বাণে পৌঁছানো সম্ভব হবে। আগে কঠিন না হলে পরে সরল হওয়া যাবে কি করে?

চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে চলেছে। শঙ্করাচার্যকে ছুঁয়ে দিল। শঙ্করাচার্য চমকে উঠে চণ্ডালকে বললেন, 'ইস, তুই আমাকে ছুঁয়ে দিলি?'

চণ্ডাল বললে, 'ঠাকুর, আমিও তোমাকে ছুঁইনি, তুমিও আমাকে ছোঁওনি। শুদ্ধ আত্মা যে নির্লিপ্ত।' সে কি ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে আসতে পারে? এটি যে নিত্য-সত্ত্বস্থের অবস্থা। এই অবস্থায় পৌঁছাতে হলে কত নিয়ম-নিষ্ঠার দরকার তার কী কিছু ঠিক আছে?

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে একজন পাগল এসে উপস্থিত। এক হাতে একটা কঞ্চি, অন্য হাতে একটা ভাঁড়। পায়ে ছেঁড়া জুতো। গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোঁচড়ে কি একটা ছিল তা-ই খেল। তারপরে মন্দিরে গিয়ে স্তব করতে আরম্ভ করল। তার গুরুগম্ভীর গলার স্তবপাঠের গমগম শব্দে সমস্ত মন্দিরচত্বরটি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। যেখানে সকলে খাচ্ছিল সেখানে কেউ তাকে বসতে না দেওয়ায়, যেখানে সব উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়েছিল সেখানে গিয়ে কুকুরদের সঙ্গে সে কাড়াকাড়ি করে খেতে লাগল। ইনি একজন পূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন। ঠাকুর হৃদয়ের মুখে সব শুনে ভয়ে হৃদুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। মা-ভবতারিণীকে তাঁর ভয়ের কথা জানিয়েও ছিলেন। পরবর্তী কালে তাই তাঁকে বলতে শুনি, 'আমাকে শুকনো সাধু করিসনে মা। আমাকে রসেবশে রাখিস।'

এবার প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সকল ধর্মের ও জাতপাতের সমন্বয় করবার জন্য। তিনি বলেছেন, ভক্তের কোনও জাত নেই। তাঁর বাবা ক্ষুদিরাম একজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। তিনি কখনও শূদ্রের দান গ্রহণ করতেন না। কিন্তু পুঁথিকার মনে করেন যে, প্রভু তাঁর লীলাকে এমন ভাবেই প্রকট করলেন যে, তাঁর অগ্রজ রামকুমার, ভক্তিমতী রাসমণি জাতিতে শূদ্র হলেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত কালী-মন্দিরে পূজারি হলেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং শূদ্রকূল-জাত রানি রাসমণির মন্দিরে দেবদেবীর সেবাপুজোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

রানি রাসমণির ভক্তিতে প্রভু গদাধর জাতপাতের গণ্ডি ভেঙে দিলেন। কামারপুকুরে তিনি তাঁর বাল্যজীবনেও ধনী কামারনী, চিনু শাঁখারি, খেতির মা-র ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে জাতপাত গ্রাহ্য করেননি।

রানি রাসমণি রামকুমারের মাধ্যমে শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব সব মন্দিরেই পূজার ব্যবস্থা করালেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সকলেই মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণগণ শূদ্র-পূজিত দেবদেবীর প্রসাদ গ্রহণ

করেন না দেখে প্রথমে রানির অত্যন্ত মানসিক কষ্ট হত। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপী প্রভু গদাধরের দেবপুরীতে আগমনের ফলেই এই ভেদবুদ্ধি চিরতরে দূর হল।

গদাই, দাদা রামকুমারের অনুমতি নিয়ে কামারপুকুরে ফিরে এলেন। নীচু জাতি রাসমণির পুরোহিত হওয়ার জন্য গ্রামের সকলে রামকুমারের নিন্দা করতে লাগলেন। গদাই কিন্তু গ্রামের মানুষের এই নিন্দাকে কোনওরকম গুরুত্বই দিলেন না।

কামারপুকুরের গ্রামবাসীরা প্রাণাধিক গদাইকে আপন-জ্ঞানে ভালবাসতেন। তাঁরা এখন গদাইকে কাছে পেয়ে বিবাহ করার জন্য বলতে লাগলেন। গদাই এই প্রস্তাবে আপত্তি না করে বরং হেসে হেসে কৌতুক করে বললেন—যেন তাঁর মনোমতো পাত্রী হয়। কামারপুকুরে এসে কয়েকদিন্ অবস্থান করেই গদাই চললেন শিহড়ে ভাগনে হৃদয়ের বাড়িতে। ঠাকুর হৃদয়ের বাড়িতে থাকতে খুবই পছন্দ করতেন।

একদিন শিহড়ে কোনও একজন সুকণ্ঠ গায়ক গান গাইছেন। সেটি শুনতে গ্রামের বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছেন। গদাইও সেখানে বসে গান শুনছেন। কোলে একটি শিশুকন্যাকে নিয়ে একজন স্ত্রীলোক সেই গান শোনার জন্য এসেছেন। গায়কের গীত শেষ হয়ে যাওয়ার পর কোনও কোনও রমণী তিন বছরের এই শিশুকন্যাটিকে নিয়ে কৌতুক জুড়লেন। তাঁদের মধ্যে কোনও একজন স্ত্রীলোক শিশুকে জিজ্ঞেস করলেন : দেখোনা, এখানে কত লোক জমেছে। এদের মধ্যে কাকে তোমার বিয়ে করতে ইচ্ছে করে, হাত তুলে তাকে দেখিয়ে দাও দেখি। ঐ মহিলাটির কথা শুনে শিশুকন্যাটি তখনই হাত তুলে গদাইকে দেখিয়ে দিল।

গ্রামের যে-সমস্ত মানুষ বিষয়ী, তাদের মধ্যে হরিভক্তি খুব একটা দেখা যেত না। কিন্তু ঠাকুরের মুখে ভগবদ্‌তত্ত্বের আলোচনা শুনে কিছু মানুষের অন্তরে এক দিব্যভাব সঞ্চারিত হত। কেননা ঠাকুরের ভগবদ্ প্রসঙ্গ এতই মধুর এবং চিত্তাকর্ষক যে, যাঁরা একবার এইগুলি শুনতেন,

তাঁরা আর এই দেবস্বভাব-বিশিষ্ট মানুষটিকে কখনোই ভুলতে পারতেন না। ঠাকুর শিহড় থেকে কামারপুকুরে ফিরে এসে আগের মতো আর এখানে মনোনিবেশ করতে পারছিলেন না। তাঁর মন কেবলই ভাগীরথীর তীরে দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে ফিরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।

তাই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন।

।। পুরী-প্রবেশ এবং রানি ও মথুরের সঙ্গে পরিচয় ।।

কাউকে কাউকে দেখলে মনে হয় যেন কোথায় দেখেছি—যেন কতকালের পরিচিত আপনজন। ঘরে ফিরে মনে কেবল একটা চিন্তাই আসে—কোথায়? —কোথায় দেখেছি? কোথায় দেখে থাকতে পারি!

দেবপুরীর মধ্যে এই সহজ সরল আত্মভোলা উদার-দৃষ্টি ছেলেটিকে দেখে মথুরবাবুর ঠিক এমনটিই মনে হল। মনে হল কে এই নবীন ব্রহ্মচারী? একে কি আগে কোথাও দেখেছি? কেন? কেন এই ছেলেটির জন্য মনটা এত ব্যাকুল হচ্ছে। কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। তবে কি জন্মজন্মান্তরে দেখেছি, কি জানি!

মথুরবাবু সরাসরি এই সৌম্য দর্শন বালকটির পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়কে।

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন রামকুমার : আমার ভাই।

মথুরবাবু বললেন : 'আহা! কী সুদর্শন ! আমার খুব ইচ্ছে আপনার ভাইকে এই দেবপুরীতে মায়ের সেবায় নিযুক্ত করি।' রামকুমার তাঁকে জানালেন : আমার ভাই কিন্তু এখানে থাকতে রাজি হবে না। সেদিন মথুরবাবু রামকুমারকে আর কিছু বললেন না। কিন্তু দেবোপম ঐ শ্রীমুখখানি তাঁর মনে বারবার ভেসে উঠতে লাগল।

বিধির বিধানে ঠিক এই সময়ে হৃদয়রামও দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির হলেন। ঠাকুরের অত্যন্ত কৃপাধন্য, স্নেহধন্য একজন।

ভাগনে হৃদয়রাম ঠাকুরের থেকে প্রায় বছর চারেকের ছোট। কিন্তু ছোট হলে কি হবে, একেবারে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

গাছের যেমন ছায়া, ঠাকুরের তেমনই হৃদু। সেই হৃদুকে কাছে পেয়ে ঠাকুর ছেলেমানুষের মতো আহ্লাদে যেন আটখানা! ঘোরাফেরা, খাওয়াদাওয়া সব একসঙ্গে।

গদাইয়ের বড় শঙ্কা, বড় ভয়, পাছে এই দেবপুরীতে কোনও কাজের জন্য মথুরবাবু তাঁকে ধরে বসেন। আর তাই মথুরবাবুকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন গদাধর।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজীবনের সঙ্গে ভক্ত মথুরানাথের দৈনন্দিন এবং আধ্যাত্মিক জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনবেদের অনুধ্যান করছি। আর তাই মথুরবাবুর সম্বন্ধে জেনে রাখা একান্ত দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবচোখে তাঁর যে চারজন রসদদারকে দেখেছিলেন, মথুরবাবু তাঁদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ অনুযায়ী মথুরবাবু একদিকে যেমন ঠাকুরের দৈবীশক্তির উপর নির্ভর করতেন, অন্য দিকে তেমনই আবার বালকস্বভাব ঠাকুরকে জাগতিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ জেনে তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর থাকতেন। আবার মথুরের ওপরও ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপা সবসময় দেখা যেত। ঠাকুর তাঁর ভক্তদের কখনও কখনও বলতেন : 'মথুরের ঠিকুজিতে লেখা ছিল বাপু, তার ইষ্টের তার উপর এতটাই কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে, শরীরধারণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, তাকে রক্ষা করবে।'

মথুরামোহন বিশ্বাসের জন্ম হয় বর্তমান বাংলাদেশের সাতক্ষীরার অন্তর্গত 'সোনাবেড়ে' গ্রামে। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও সুপুরুষ। কলকাতায় এসে তিনি কিছুদিন উচ্চশিক্ষাও লাভ করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

রানি রাসমণির তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের পর থেকে তাঁকে ‘সেজোবাবু’ বলে সম্বোধন করা হত। করুণাময়ীর মৃত্যুর পর রানি এই বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, উদারমনা উপযুক্ত জামাতাটিকে নিজের পরিবারের সঙ্গে চিরসম্বন্ধ স্থাপন করার অভিপ্রায়ে তাঁর সঙ্গেই কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বার আবার বিবাহ দেন। অল্পদিনের মধ্যেই মথুরামোহন অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে জমিদারি পরিচালনা করতে থাকায় রানির ডানহাত হয়ে ওঠেন।

ঠাকুরের সহজ-সরল বালকপ্রকৃতি এবং সুদর্শন চেহারা দেখে মথুরবাবু প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে সাধনার প্রথম পর্যায়ে ঠাকুরের যখন দিব্যোন্মাদ অবস্থা এসে উপস্থিত হতে লাগল, যখন শ্রীশ্রীজগদম্বার পুজো করতে করতে আত্মহারা হয়ে নিজের ভেতর মা-ভবতারিণীকে দর্শন করে কখনও কখনও নিজেকেই পুজো করে ফেলতে লাগলেন—তখন সাধারণ মানুষ তাঁকে ভুল বুঝে নানা কথা রটাতে লাগল। মথুরানাথের কানেও এই সব কথা পৌঁছে গেল। মথুরবাবু গোপনে দক্ষিণেশ্বরে এসে অন্তরাল থেকে নিজে ঠাকুরের ভাববিহ্বলতা দেখে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দিলেন : ‘ছোট ভট্চায যেভাবে যাই করুন না কেন, কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারবে না।’

মথুরের যেমন ঠাকুরের কাছে কোনও কিছু গোপন ছিল না, ঠাকুরেরও তেমনি মথুরের ওপর ভাবসমাধির সময় ছাড়া অন্য সবসময়ে ছোট ছেলে যেমন মায়ের কাছে অকপটে সব কথা খুলে বলে, মতামত নেয় ও তাঁর ভালবাসার ওপর নির্ভর করে, সেরকমই ভাব ছিল। সমাধির সময়ে বা অন্য সময়ে তাঁর যা-কিছু দর্শনাদি ও ভাব উপস্থিত হত, সেসব কথা মথুরকে বলে, বলতেন : ‘এটা কেন হল বল দেখি?’ ‘ওটা তোমার কি মনে হয়—বল দেখি।’ জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলি ঠাকুরকে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্ভাবনী শক্তিও মথুরের ভালবাসায় বেশ এসে যেত।

ঠাকুরকে মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করলে এবং ভালবাসলেও মথুরানাথ কিন্তু ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করতে ছাড়েননি। মস্তিষ্কবিকার মনে করে কলকাতার নামকরা কবিরাজ দেখানো, মন্দ-স্বভাব-বিশিষ্টা স্ত্রীলোকদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাঁর পবিত্রতা পরীক্ষা করা এবং ঠাকুরবাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তি তাঁর (ঠাকুরের) নামে লিখে দিয়ে তাঁকে প্রলোভিত করা ইত্যাদি নানা চেষ্টা তিনি করেছিলেন। এই সমস্ত কিছুর পরে মথুর ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছিলেন। ঠাকুরের অসাধারণ ত্যাগ এবং নিতান্ত বালকের মতো সরলতা মথুরের মনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঠাকুরকে মথুরবাবু এবং তাঁর স্ত্রী ‘বাবা’ বলে সম্বোধন করতেন। সস্ত্রীক অধিক পরিমাণে সেবা করার অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝেই জানবাজারের বাড়িতে ‘বাবা’কে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া এবং বহুদিন এক শয্যায় শয়ন পর্যন্ত করেছেন।

ঠাকুরের মধ্যে মথুরের অনেক রকম দিব্যদর্শনও হয়েছিল। কুঠিবাড়ি থেকে তিনি মা ভবতারিণী ও দেবাদিদেব মহাদেবরূপে ঠাকুরকে দর্শন করে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সেজোবাবু বিভিন্ন তীর্থ-পর্যটনও করেন। কাশী যাওয়ার পথে ঠাকুর মথুরবাবুকে দিয়ে দেওঘরের একটি দরিদ্র পল্লীর স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে অন্ন-বস্ত্র বিতরণের মধ্যে দিয়ে নরনারায়ণসেবা জোর করে করিয়ে নেন। তিনি সেজোবাবুকে যেমন ভালবাসতেন, তেমনই প্রয়োজনে তিরস্কারও করতেন।

একটানা চোদ্দো বছর ঠাকুরের সেবা করার ফলে বিষয়ী মথুরের মনও কতদূর নিষ্কাম হয়েছিল সে-সম্বন্ধে বহু ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনায় দেখা যায়, একসময়ে মথুরের শরীরের সন্ধিস্থলে ফোড়া হওয়ায় তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। সেই অবস্থায় ঠাকুরকে দর্শনের জন্য তাঁর মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে। ঠাকুর এই কথা শুনে প্রথমে যেতে রাজি হলেন

না। বললেন, 'আমি গিয়ে কি করব? তার ফোড়া সারিয়ে দেবার শক্তি কি আমার আছে?' কিন্তু বারবার মথুরের প্রার্থনায় তিনি সেখানে উপস্থিত হলে মথুর খুব আনন্দিত হলেন। অনেক কষ্টে বিছানায় উঠে বসে বললেন : 'বাবা, একটু পায়ের ধুলো দাও।' ঠাকুর বললেন, আমার পায়ের ধুলো নিয়ে কি হবে? তাতে কি আর তোমার ফোড়া সারবে?

মথুর তার উত্তরে বললেন : 'বাবা, আমি কি এমনি! তোমার পায়ের ধুলো কী ফোড়া আরাম করার জন্য চাইছি? তার জন্য তো ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হবার জন্য তোমার শ্রীচরণের ধুলো চাইছি।' এই কথা শোনামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই মথুরানাথের দেহরক্ষা হয়। তাঁর দেহত্যাগের সময় ঠাকুর বলেছিলেন : 'শ্রীশ্রীজগদম্বার সখীগণ মথুরকে সাদরে দিব্যরথে উঠালেন—তার ''তেজ'' শ্রীশ্রীদেবীলোকে গেল।'

ঠাকুরের বাল্যলীলায় দেখা যায় তিনি মাটি দিয়ে খুব সুন্দর করে মূর্তি গড়তে পারতেন। মূর্তি গড়া শেষ হয়ে গেলে, যারা দেখত তাদের ভুল হয়ে যেত—এটি আসল না নকল! দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার পর সেখানে গঙ্গামাটি দিয়ে এমনি মূর্তি গড়ছেন গদাধর। শিবমূর্তি। সেটি গড়ার পর পুজোয় বসে একেবারে তন্ময় হয়ে গেছেন গদাই। কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন সেজোবাবু। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখছেন সেই শিবের অনির্বচনীয় মূর্তিখানি। ভাস্কর্যের চেয়েও যা বড় জিনিস, সেটি যেন ফুটে উঠেছে মূর্তির সর্বাঙ্গে। সেটি ভালবাসা-মিশ্রিত ভক্তি। মূর্তিটি এমন সুন্দর ও নিখুঁতভাবে তৈরি যে সেজোবাবুর মতো মানুষেরও ভুল হয়ে যাচ্ছে। যতই দেখছেন, ততই অবাক হচ্ছেন। মনে হচ্ছে যেন কৈলাস থেকে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

এ মূর্তি কার তৈরি? মথুরবাবু জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুরের ভাগনে হৃদয়কে। তিনি বললেন : মামা গদাধরই তৈরি করেছে এই মূর্তি।

মথুরবাবু বললেন : পুজো হয়ে গেলে আমাকে দেবে শিবের এই সুন্দর মূর্তিখানি? হৃদয় সানন্দেই সম্মতি জানালো এবং বলল খুব কম সময়ের মধ্যেই মামা এই রকম মূর্তি গড়ে দিতে পারে! মূর্তিখানি হাতে পেয়ে আনন্দে এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন সেজোবাবু।

মথুরবাবু এই মূর্তিটি দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছেন যে সেটি নিয়ে তিনি রানির কাছে গিয়ে গদাধর সম্বন্ধে তিনি যতটুকু দেখেছেন বা দূর থেকে তাঁকে যতটুকু বুঝেছেন সবই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁকে বললেন। সেই সঙ্গে এটিও বলতে ভুললেন না যে, শিবেরই সমকক্ষ এই শিল্পী। আমাদের সৌভাগ্যবলে ইনি এখন এই দেবপুরীর মধ্যেই আছেন। তরুণ-ব্রহ্মচারীর মতো বেশবাস ছেলেটির, মা-ভবতারিণীর পূজারি বড়-ভটচার্যি মশায়ের ছোট ভাই। আমার মনে হয় মা-ভবতারিণীর সেবায় যদি এঁকে নিযুক্ত করা যায়—তবে ইনি অল্প দিনেই মাকে জাগ্রত করতে পারবেন।

মূর্তিখানি হাতে পেয়ে সেজোবাবু এই সৌম্যকে মায়ের মন্দিরে আনার জন্য আরও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। রামকুমারকে পরামর্শ দিলেন তাঁর ভাইকে মন্দিরে নিয়োগ করার জন্য। রামকুমার বললেন, গদাইকে চাকরিতে রাজি করানো খুবই শক্ত। মথুরবাবুর মন বলছে রামকুমারের এই ভাই-ই পারবেন মা-ভবতারিণীকে কাছের একজন করে নিতে। কেমন যেন জেদ চেপে গেল সেজোবাবুর। যেভাবেই হোক এই গদাই-ঠাকুরকে মা কালীর কোলের কাছে টেনে আনতেই হবে। বারবার লোক দিয়ে ডেকে পাঠাতে লাগলেন। গদাই কিন্তু নির্বিকার।

সেজোবাবু আপনাকে ডাকছেন। গদাই মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেন সেজোবাবুর পেয়াদা। আর একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন খোদ মথুরবাবু। আর পালাবার যো নেই। কেউ কেউ বলেন গদাধরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসবার জন্য শেষপর্যন্ত রামকুমারকে ধরে বসেছিলেন মথুরবাবু। ভাগনে হৃদয় বলল, 'মামা, উনি ডাকছেন যাওনা।' ঠাকুর

বললেন, ওরে হৃদু! গেলেই বলবেন, এখানে থাকো। চাকরি করো। ও আমার দ্বারা হবে না।

হৃদয় বললেন : করলেই বা চাকরি! এতে দোষ কি! একথা শুনে গদাধরের প্রতিক্রিয়া : চাকরি নিলেই চিরকাল বাঁধা পড়ে যেতে হবে। ও ঝঞ্ঝাট আমি পারব না। তা ছাড়া কালীপুজোর ভার নেওয়া কী তুই মনে করিস চারটিখানি কথা! মা ভবতারিণীর সর্বাঙ্গে যে অত দামী দামী গয়না, সে-সব কে সামলাবে? তার ভারই বা কে নেবে?

হৃদয় বললেন : কেন! আমি নেব। গদাধর বললেন : তুই নিবি? ঠিক? তবে যাই বলি গিয়ে সেজোবাবুকে।

সেজোবাবু যেন হাতে চাঁদ পেলেন। গদাধরকে বললেন, 'তুমি মাকে রোজ তোমার মনের মতো করে সাজাবে। আর হৃদয়রাম তোমাকে সাহায্য করবে।'

চুম্বক ও লোহার মধ্যে যেমন পরস্পরের এক আকর্ষণ থাকে, ঠিক তেমনই ভক্ত ও ভগবানের মধ্যেও থাকে প্রাণের এক গুপ্ত আকর্ষণ। এক শুভক্ষণে দেবপুরীর মধ্যে বিচরণরত গদাধরকে দর্শন করে রানির প্রাণ অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। এই ব্রাহ্মণকুমারের সর্বাঙ্গে দিব্য জ্যোতি, সুন্দর লাবণ্যযুক্ত অঙ্গকান্তি, ঈষৎ বঙ্কিম চক্ষুদ্বয় এবং আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় দেখে রানির মন ভক্তিতে ভরে গেল। ভক্তির সঙ্গে বাৎসল্য যুক্ত হওয়ায় তাঁর মন-প্রাণ এক অব্যক্ত আনন্দে বিহ্বল হয়ে কোনও এক দিব্যলোকে যেন বিচরণ করতে লাগল। আর তাই বারবার গদাধরের সৌম্য মূর্তিকে তিনি দেখতে লাগলেন। ভগবান যখন মায়াকে অবলম্বন করে মানুষের মতো হয়ে মানুষের সঙ্গে লীলা করেন, তখনই কেবল তাঁর মাধুর্যের স্ফুরণ হয়। একমাত্র শুদ্ধ-চিত্ত ভক্তই ভগবানের মাধুর্য পূর্ণভাবে আস্বাদন করতে পারেন। এখানেও রানি শুদ্ধা ভক্তি দিয়েই গদাইরূপী ভগবানকে পুরীর মধ্যে লাভ করেছেন। আত্মশক্তির অভিমানে ভগবানকে বাঁধা যায় না। ভগবান অসীম অনন্ত হয়েও

কৃপাতে তিনি ভক্তের বন্ধন স্বীকার করেন। এটিই তো তাঁর করুণা—তাঁর ভক্ত-বাৎসল্য!

রানি বা মথুরের অন্তরের যে ভক্তি, মনে হয় যে, সেটি ভগবানের অশেষ করুণার দান! ভগবান ছাড়া আর কেউ তো ভক্তির আস্পদ নন। ভক্তকে ভক্তিযুক্ত করাই যে ভগবানের বিশেষ কৃপা, অশেষ করুণা!

এই সময় দেবপুরীতে একটা অঘটন ঘটে গেল।

খুব ধুমধামের সঙ্গে জন্মাষ্টমীর উৎসব সবেমাত্র শেষ হয়েছে। ঘটনাটি তার পরের দিনের অর্থাৎ নন্দোৎসবের দিনের। ভাগবতে নন্দোৎসবের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে।

ব্রজধামে 'মহারাজ নন্দের পুত্র হয়েছে'—এই আনন্দের কথা শুনে ব্রজবাসীরা নানা মূল্যবান উপহার নিয়ে নন্দালয়ে নবজাত শিশুকে দেখবার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছেন। বয়োবৃদ্ধ গোপগণ পর্যন্ত নন্দ-নন্দনের জন্মোৎসব উপলক্ষে এতই আনন্দিত হয়েছেন যে, তাঁরা নিজেদের বয়সোচিত গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে চঞ্চল বালকের মতো নৃত্য করছেন—একে অপরের গায়ে দুধ, ঘি, দই প্রভৃতি ঢেলে দিয়ে আনন্দ করছেন। চারিদিকেই যেন একটা আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কারণ আনন্দস্বরূপ ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে। সবাই আনন্দময় হয়ে উঠেছেন। পদকর্তা শিবানন্দ লিখেছেন :

'শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ।।'

আজ সেই নন্দোৎসব। দক্ষিণেশ্বরের দেবপুরীতে রোজকার মতো আজও রাধামাধবকে সকালে তাঁদের শয়নকক্ষ থেকে মন্দিরে আনা হয়েছে। পুজো ও ভোগাদি হয়ে যাওয়ার পর আবার তাঁদের শয়নঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রত্যেকদিনই এই নিয়ম। দুপুরে বিশেষ পুজো-ভোগরাগাদি হয়ে যাওয়ার পর, বিশ্রামের জন্য আগেই পূজক ক্ষেত্রনাথ চাটুজ্যে রাধারানিকে তাঁর শয়নকক্ষে শুইয়ে রেখে এসেছেন।

এইবার নিয়ে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণকে। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলেন ক্ষেত্রনাথ। নিজে রক্ষা পেলেও বিগ্রহের একটি পা গেল ভেঙে। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে দেবপুরীতে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হল। মহা শোরগোল পড়ে গেল। কী সর্বনাশ! একী অশুভ লক্ষণ!

ক্ষেত্রনাথকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বরখাস্ত করা হল। কিন্তু পূজককে বরখাস্ত করলেই তো বিগ্রহের ভাঙা পা ঠিক হয়ে যাবে না! এখন উপায়? রানি রাসমণিও এই ঘটনায় মানসিক দুশ্চিন্তায় খুবই অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি নিজে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে মথুরবাবুকে বললেন, পণ্ডিতদের সভা আহ্বান করে তাঁদের মতামত নেওয়ার জন্যে।

পণ্ডিতদের সভা বসল। সভায় সমবেত পণ্ডিতবর্গ বহু শাস্ত্র ঘেঁটে, অনেক সংস্কৃত শ্লোক আওড়ে বিধান দিলেন—ভাঙা বিগ্রহে পুজোর রীতি নেই। ঐ মূর্তি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে তার জায়গায় নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

'নূতন মূরতি তাই পূজার কারণ।
বিধি দিল আনিবারে বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণ।' (পৃঃ ৪৯)

এই বিধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিগ্রহ তৈরি করার নির্দেশ দেওয়াও হয়ে গেল। কিন্তু রানি মর্মযন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হলেন। যে বিগ্রহকে তিনি হৃদয়-মন্দিরে সযত্নে চোখের জল-রূপ ভক্তি-পুষ্প দিয়ে এত দিন সাজিয়েছেন, তাঁকে কি গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া সম্ভব!

মথুরবাবু রানির হৃদয়ব্যথা বুঝতে পেরে তাঁকে বললেন : 'এ-ব্যাপারে একবার গদাধরকে জিজ্ঞেস করে দেখলে কেমন হয়? আমার মনে হচ্ছে যিনি সরলতার প্রতিমূর্তি একমাত্র তিনিই পারবেন এই সমস্যাটিকে সহজ-সরল করে দিতে।' গদাধরকে মথুরবাবু সব কথাই আনুপূর্বিক বললেন। বলার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বল?'

সব শুনে গর্জে উঠে গদাধর বললেন, 'যেমন পণ্ডিত, তেমনই তার বিধান! রানির জামাইয়ের যদি আজ পা ভাঙত, রানি কি জামাইকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে তার জায়গায় নতুন জামাই এনে বসাতেন?' রানিকে এ-ব্যাপারে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস করতে বললেন যে, কারও জামাইয়ের যদি পা ভেঙে যায় তাহলে তাঁরা কী করতে বলেন! তাকে ফেলে দেওয়া, না তার উপযুক্ত চিকিৎসা করানো? ঠাকুর নিজে যেমন সরল, তেমনই সরলের ওপর তাঁর দয়া ও ভালবাসা।

'সরলে দয়াল ভালবাসা সরলতা।
সরলে সরল বড় রামকৃষ্ণ-কথা।' (পৃঃ ৪৯)

রানি সহজেই বুঝলেন প্রভুর ইঙ্গিত। সভায় তিনি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করালেন। ঘটনাটির সঙ্গে প্রশ্নটি এমনই সঙ্গত যে সেটি শুনে পণ্ডিতদের মাথা ঘুরে গেল।

'সোজা কথা অতি মূর্খ পারে বুঝিবারে।
শুনিয়া বিধিজ্ঞদের মুণ্ডু গেল ঘুরে।' (পৃঃ ৪৯)

এই প্রশ্ন শুনে সমস্ত পণ্ডিতগণ একেবারে চুপ।

তখন গদাধর বললেন, রানি ভাল ডাক্তার এনে জামাইয়ের চিকিৎসা করাতেন। চিকিৎসা করিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলতেন। এখানেও তো সেই ব্যবস্থা করলেই হল।

শেষপর্যন্ত শাস্ত্র ছেড়ে 'পীড়িত ব্যক্তির সেবার চিরন্তন যুক্তিই' পণ্ডিতদের মেনে নিতে হল। তখন ঠাকুর বললেন, ভাঙা পা জুড়ে দিলেই বিগ্রহটি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। যেমন চলছিল তাঁর সেবা-পূজা, ঠিক তেমনটিই চলবে তাঁর পূজা, ভোগরাগাদি।

রানির একেবারে অন্তরের কথাটিই গদাধর প্রকাশ করায় রানি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। এমন সহজ-সরল সুন্দর মীমাংসা হতে দেখে পণ্ডিতেরা বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব। এখন তাঁরাই আবার শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নানারকম আপত্তি তুলতে লাগলেন। কিন্তু মনের কাছে, এমন সুন্দর সমাধানের কাছে শাস্ত্র কি দাঁড়াতে পারে?

তাই রানি বা মথুরবাবু এসব কথাকে কোনও গুরুত্বই দিলেন না। রানির বুক আনন্দে ভরে উঠল। মনে মনে বললেন, হে কৃষ্ণ! হে শ্যাম! তুমি কত সহজের মধ্যেই না আছ! কত সহজের মধ্যেই ধরা দিলে!

রানি রাসমণি গদাধরকে ধরে বসলেন—তুমিই হচ্ছ শ্রেষ্ঠ বৈদ্য। তুমিই পার এই বিগ্রহকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে।

ভাঙা পা একেবারে নিখুঁতভাবে জুড়ে দিলেন গদাধর। এখন এমন কারও সাধ্য নেই যে চোখে দেখে বার করে দেয় কোথায় জোড়ার দাগ! এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে দেবপুরীর সবাই অবাক। ঠাকুর এমন সুন্দর করে কৃষ্ণের ভাঙা পা জুড়ে দিয়েছিলেন যে খুব ভাল করে দেখলেও ঐ বিগ্রহ যে কোনও কালে ভেঙেছিল—একথা এখনও বুঝতে পারা যায় না।

এর মধ্যেই তৈরি করতে দেওয়া নতুন মূর্তি এসে পৌঁছালো। মথুরবাবু গদাধরকে বললেন, দেখো তো এই মূর্তিটি ঠিক আগের মতো হয়েছে কি না!

অন্তরের অন্তস্তলে ডুবে গিয়ে দেখল গদাই।

না, তেমনটি হয়নি। আর ঠিক তেমনটি যে হতেও পারে না! কারণ কত ভক্তি আর ভাব তাঁর সর্বাঙ্গে যে মাখামাখি হয়ে আছে! কত ভক্তি-অশ্রু দিয়ে তাঁকে স্নান করানো! অন্তরের ব্যাকুলতা দিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙানো! কারিগর যতই দক্ষ হোক না কেন এই সব উপচার সর্বাঙ্গে লেপন করে দিয়ে কি তৈরি করতে পারবে বিগ্রহ! পারবে কি তার সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে মূর্তি গড়তে! আর তাই কি কারও সিদ্ধান্তে প্রাণের এই শ্যামসুন্দরকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া যায়!

এই রকম চমৎকার মীমাংসায় রানির মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। গদাধরের প্রতি ভক্তিতে রানি আনন্দাশ্রুতে ভাসতে লাগলেন। ভক্তির লক্ষণই হচ্ছে অশ্রু-স্নান। ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণের নাম অনুরাগ। আর সেই অনুরাগই ভক্তি। আসক্তির নামই অনুরাগ। যেমন শিশুর আসক্তি—মাতৃক্রোড়ে, অর্থলোভীর—অর্থে, তৃষ্ণার্তের—জলে, ক্ষুধিতের—অন্নে। ঠিক তেমনই ভগবানের প্রতি তীব্র আসক্তিই ভক্তি।

একবার দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের খুব অসুখ করেছে। নারদ শ্রীভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন : প্রভু, এ রোগের ওষুধ কি। তখন কৃষ্ণ বললেন, কোনও ভক্ত যদি তার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দেয়, তাহলে এখনই ভাল হয়ে যাব। নারদ এত বড় ভক্ত কিন্তু তিনিও পিছু হঠলেন। কৃষ্ণের মহিষীবৃন্দ, তাঁদের কাছে গিয়ে হাত পাতলেন নারদ। তাঁরাও পত্নী ধর্ম নষ্ট হওয়ার ভয়ে স্বামিরূপ কৃষ্ণকে পায়ের ধুলো দিতে পারলেন না। নারদ তখন ব্রজে গেলেন। কৃষ্ণের অসুখের কথা শুনে ব্রজগোপীরা অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনারা দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় অধীর হয়ে উঠল। 'আমাদের কৃষ্ণের অসুখ! আমাদের পায়ের ধুলোতে যদি কৃষ্ণ ভাল হয়ে যান, তবে নিয়ে যাও আমাদের পায়ের ধুলো। তাতে যদি পাপ হয়, অধর্ম হয়, সে তো আমাদের হবে। জীবনে আর আমাদের অন্য ব্রত কী আছে? সেবা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করাই যে আমাদের একমাত্র ব্রত। হে নারদ! নিয়ে যাও আমাদের পায়ের ধুলো।'

ভক্তিমতী রানি গদাধরের এই অভূতপূর্ব সমাধানে আনন্দিতা হয়ে তাঁকে বিষ্ণুমন্দিরে সেবাপূজার ভার দিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর নাম দিলেন 'ছোট ভট্‌চায'। আর দাদা রামকুমার 'বড় ভট্‌চায'। ঠাকুরের ভাগনে হৃদয় পেলেন মা-ভবতারিণীকে সাজানোর দায়িত্ব।

'তুষ্ট হয়ে ভক্ত রানী ভক্তিভরে তাঁয়।
বলিলেন থাকিবারে বিষ্ণুর সেবায়।।

... ...

বড় ভাই বড় ভট্টাচার্য মহাশয়।
শ্যামা-বেশকারী হ'ল ভাগিনে হৃদয়।।' (পৃঃ ৫০)

প্রহ্লাদ নৃসিংহকে বলছেন : 'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি আনন্দ-সাগরে অবগাহন করেছি। আমার ব্রহ্মানুভূতির গোষ্পদ দিয়ে

কী হবে? সাক্ষাৎ-কারণানন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ। অনুভবের চেয়ে দর্শন অনেক বেশি আনন্দের। ব্রহ্মানন্দ সামান্য নয় ঠিকই কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমানন্দ তার চেয়েও অনেক বেশি সুখের। 'কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম।' ব্রহ্মানন্দ ছোট গর্তে জমে থাকা জলের মতো। আর কৃষ্ণনামানন্দ অম্বুনিধি। ভক্তিমতী রানির কাছে গদাই যেন সেই কৃষ্ণনামানন্দ অম্বুনিধি।

এই দেবপুরীর নিয়ম অনুযায়ী মন্দিরে প্রদত্ত সমস্ত প্রণামীর টাকা পূজারির প্রাপ্য। কিন্তু ত্যাগী এবং অনাসক্তির মূর্তপ্রতীক ঠাকুর, প্রণামীর সমস্ত টাকাকড়ি নিজে গ্রহণ না করে দুঃখীজনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বলতেন।

ভক্তিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অভিধেয়। অভীষ্টকে পাবার জন্য যা করতে হয়, তাই অভিধেয়। অভীষ্ট কে? অভীষ্ট হচ্ছেন শ্রীভগবান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আমাকে পেলে আর পুনর্জন্ম হয় না। 'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।' একমাত্র ভগবানকে জানলেই জন্মমৃত্যুর পার হওয়া যায়। তা ছাড়া আর কোনও উপায়ও নেই। 'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। ঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গদের বলতেন, 'তোমাদের আমাকে জানলেই হবে। আমি কে? তোমরা কে? এবং তোমাদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

ঠাকুর বলেছেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই ইদানীং এই দেহে রামকৃষ্ণ।' ভক্তবৎসল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের ওপর আকর্ষণ, ভালবাসা ও ভক্ত-বাৎসল্য এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যেটি কৃষ্ণের কথা দিয়ে বললে উভয়কেই আমাদের বুঝতে সুবিধে হবে। ছোট্ট কৃষ্ণকে আমরা ব্রজের ননীচোর বলেই জানি। কিন্তু তিনি কি শুধুই ননীচোর! আকাশ থেকে নিবিড়-নীল মেঘমালার শ্যামল কান্তি পর্যন্ত হরণ করেছেন। কত বজ্র দিয়ে সুরক্ষিত সেই কান্তি! এই চোরের হাত থেকে সেই কান্তিও রেহাই পায়নি। ব্রজগোপীরা অষ্টপাশের সব পাশ থেকেই মুক্ত হয়েছিল, কেবল লজ্জারূপ পাশ থেকে মুক্ত হতে পারছিল না। আর তাই কৃষ্ণ ব্রজগোপীদের বস্ত্র চুরি করেছিলেন। কৃষ্ণকে বলা হয় চোরদের রাজা। এই চোর, ভক্তদের হৃদয়-রূপ মাধুর্য চুরি করে আপন মাধুর্যের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন। আর সেই জন্যই চোরের রাজার সর্বাঙ্গে কোটি চন্দ্র-সূর্যের স্নিগ্ধ জ্যোতি। প্রজ্জ্বলিত আগুন যেমন শুকনো কাঠের স্তূপ নিমেষের মধ্যে ভস্মীভূত করে, ঠিক তেমনই কৃষ্ণ আমাদের বহু জন্মার্জিত পাপও কৃপা করে মুহূর্তের মধ্যে হরণ করে নেন। আর সেই জন্যই কৃষ্ণ চৌরাগ্রগণ্য। 'ব্রজে বসন্তং নবনীত চোরং। গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকুলচোরম্। অনেকজন্মার্জিতপাপচোরং, চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি।'

বিষ্ণুমন্দিরে ছ-মাস পুজো করার পর গদাধর মা-কালীর পূজারি হলেন। কিন্তু শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা না নিলে মা-কালীর পুজো করা যাবে না। তাই গদাই দীক্ষা নিলেন বৈঠকখানার শক্তিসাধক তান্ত্রিক কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। দাদা রামকুমারকে বিষ্ণুসেবার দায়িত্ব দেওয়া হল। অল্পেই সন্তুষ্ট রামকুমার এই সেবার কাজ পেয়েও খুব খুশি। লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে রামকুমারের শরীর এখন থেকে ভাল না থাকার জন্যই হোক অথবা ঠাকুরকে মা-কালীর পুজোয় অভ্যস্ত করাবার জন্যই হোক তিনি নিজে রাধাগোবিন্দজীর পুজো করতে লাগলেন এবং ঠাকুরকে মা-ভবতারিণীর পুজোয় নিযুক্ত করলেন। ঠাকুর কালীপুজোয় বেশ দক্ষ হয়েছেন জেনে মথুরবাবু, রামকুমারকে এখন থেকে বরাবরের জন্য বিষ্ণুঘরে পুজো করতে অনুরোধ করেছিলেন।

এর কিছুদিন পরে রামকুমার বললেন, 'অনেকদিন দেশে যাইনি। এবার একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।' হৃদয় এল রামকুমারের জায়গায়। বিশেষ কাজে কলকাতার উত্তরে শ্যামনগর-মূলাজোড় গিয়ে হঠাৎ রামকুমার দেহত্যাগ করলেন। গদাইয়ের চেয়ে বয়সে একত্রিশ বছরের বড় ছিলেন দাদা রামকুমার। বাবাকে হারিয়ে দাদাকে পেয়েছিল

গদাই। দাদার মৃত্যুতে বিহ্বল হয়ে পড়ল গদাই। এই সময় গদাধরকে পেয়ে বসেছে ঈশ্বরতৃষ্ণা। পেয়ে বসেছে মৃত্যুর রহস্য জানবার তীব্র আকুলতা। তাই দাদার জন্য শোক, মিশে গেল ঈশ্বর আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায়। যদি ঈশ্বরকে বুঝি তাহলে মৃত্যুকেও বুঝব।

মহাভারতে দেখা যায় কচ নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে রয়েছেন। সমাধি ভাঙবার পর একজন কচকে প্রশ্ন করলেন, এখন কী দেখছ? উত্তরে কচ বললেন, 'তখন যা দেখেছি, এখনও ঠিক তাই-ই দেখছি। দেখছি জগৎ যেন তাঁতে একেবারে জ্বরে রয়েছে। তিনিই পরিপূর্ণ। তিনিই সবকিছু। যা কিছু সব হয়েছে, তিনিই হয়েছেন। কিছু নেবার বা কিছু ফেলবার এমন কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

মা-ভবতারিণী যেন দেবপুরী আলো করে বসে আছেন। মায়ের পূজার ভার নিয়েছেন গদাই। ভার নিয়েই সমস্ত মন-প্রাণ উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন ভুবনভুলানো মায়ের শ্রীপাদপদ্মে। নিজে মায়ের হাত ধরেননি। বলেছেন : 'মা, তুই আমার হাত ধরে নিয়ে চল। মা, আমি যদি তোর হাত ধরি তবে হাত ফসকে পড়ে যেতে পারি। কিন্তু তুই যদি একবার হাত ধরিস তাহলে আর পড়বার ভয় নেই।' বেড়ালছানার মতো হেঁসেলে রাখলে তিনিই রাখবেন। আবার বাবুদের বিছানায় শোয়ালে তিনিই শোয়াবেন।

মাগো, তুই যেন ত্রিভুবন আলো করে বসে আছিস।

গদাই রোজ সকালে মা-ভবতারিণীর মূর্তি পুজোর সময় ফুল আর চন্দন দিয়ে মনের মতো করে মাকে সাজান। মা-ভবতারিণীর তুলতুলে নরম গায়ে হাত দিয়ে চমকে চমকে ওঠেন গদাই। মনে হয় এই মূর্তি যেন নিশ্চল পাষাণময়ী নন। প্রাণময়ী—স্নেহময়ী জননী! আর এই যে গায়ের উষ্ণতা? এটি যে প্রাণময়ী জননীর প্রফুল্ল প্রাণের উত্তাপ! মনে হচ্ছে যেন এখনই কথা বলে উঠবেন—হাত বাড়িয়ে টেনে নেবেন কোলের কাছটিতে।

আর তাই মাকে বহুক্ষণ দর্শন করলেও—সারাদিন মায়ের কাছটিতে থাকলেও ভক্তদের তাঁকে দেখার আশ যেন আর কিছুতেই মিটত না। মা-ভবতারিণীকে দর্শন করে লোকেরা এক ঐশ্বরিক আনন্দে বিভোর হয়ে মায়ের মহিমার কথা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। প্রবাদ আছে, কথা কানে হাঁটে। এই প্রাণময়ী মা-ভবতারিণীর কথা বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে দর্শনার্থীরা মা-ভবতারিণীকে দেখার জন্য দক্ষিণেশ্বর দেবপুরীতে আসতে লাগলেন। সকলের মুখে একই কথা—অনেক মায়ের মূর্তি দর্শন করেছি কিন্তু এমন গভীর আধ্যাত্মিক-ভাবতরঙ্গ তো কোথাও অনুভব করিনি বা মায়ের এমন চিন্ময়ী রূপও তো আর কখনও কোথাও দেখিনি! কে বলবে মা পাষাণময়ী!

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গদাইয়ের পুজোয় জাগ্রতা মাকে দেখার জন্য দূরদূরান্ত থেকে সাধু-ভক্তদের ভিড় উপচে পড়তে লাগল। ঠাকুর নিজেই মা-কালী হয়েও কালীর পূজারি সেজে দেবপুরীতে লীলা করলেন। সাধারণ মানুষের কাছে এই লীলা অত্যন্ত দুর্বোধ্য। তাঁর পুজোয় অত্যাশ্চর্যময়ী মা-কালী বহু মত ও পথের মানুষকে দক্ষিণেশ্বরে টেনে আনতে লাগলেন। এই দেবপুরীতে বিভিন্ন ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে সমস্ত ভক্ত সমভাবে ভাবিত হয়ে উঠলেন। এই দেবপুরীতেই ধর্ম ও বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সমন্বয়ের সূত্রপাত হল। জাতপাত ভুলে সবাই একই প্রসাদ গ্রহণ করছেন দেখে রাসমণির অন্তর এক অপরিসীম আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল।

ব্রাহ্মণ এবং উচ্চবর্ণের লোকেরা দেবপুরীতে মায়ের প্রসাদ খেতেন না দেখে রানি মনে-মনে অত্যন্ত মর্মযন্ত্রণা ভোগ করতেন। মনের ব্যথা মাকে কেঁদে কেঁদে জানাতেন। ঠাকুরের দেবপুরীতে আসবার পর তাঁরই অশেষ করুণায় রানির সেই মর্মন্তুদ হাহাকার সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়ে

গিয়েছিল। ঠাকুরের পুজোর বিশেষ মহিমা দেখে এবং তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে সমাজের ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সমস্ত বর্ণের মানুষ মা-ভবতারিণীর প্রসাদ অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করছেন দেখে রানি রাসমণির হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেল। এখন থেকে ঠাকুরের ওপর রানির অন্তরের ভক্তি এবং বাৎসল্যপ্রেম আরও বেশি প্রকাশ পেতে লাগল। আগেই দেখেছি দেবপুরীর মধ্যে ঠাকুরকে প্রথম দর্শনেই ভক্তিমতী রানির হৃদয়ে তাঁর প্রতি বিশেষ ভক্তি ও ভালবাসার উদ্দীপন হয়েছিল। রানিমা সেই ভক্তি ও ভালবাসা এখন সবসময় অনুভব করতে লাগলেন।

ঠাকুরের পুজো একটা দেখবার মতো ছিল। যেই দেখত, সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। তিনি পুজোয় বসে চোখের পলকের মধ্যে তন্ময় হয়ে যেতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকতেন। তাঁর পুজো যাঁরা দেখেছেন তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, তিনি কোনও প্রতীকের পুজো করছেন না, পুজো করছেন চিন্ময়ী জগন্মাতার। পুজোয় বসে এমন কাউকে এভাবে তন্ময় হয়ে যেতে মথুরবাবু আগে কখনও দেখেননি। পুজো দেখবার জন্য অথবা পুজোর সময় মাকে দর্শন করতে কারা ভিড় করল সেদিকে কোনও খেয়ালই থাকত না এই পূজকের। হৃদয়কে বলতে শোনা যেত ‘পূজার সময় ঠাকুরের তেজঃপুঞ্জিত শরীর ও তন্মনস্ক ভাব দেখে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব যেন নরশরীর ধারণ করে পুজো করতে বসেছেন।’

ঠাকুরের পুজো যেমন আকর্ষণীয় ছিল, তেমনই ছিল তাঁর মধুর কণ্ঠে গীত সঙ্গীত। ভাবই যে সঙ্গীতের প্রাণ—এটি তাঁর গানে সবসময় স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশিত হত।

ঠাকুর মনের মতো করে মা-ভবতারিণীকে সাজাতেন। আর তাই সময় পেলেই রানি দক্ষিণেশ্বরে মাকে দর্শন করতে চলে আসতেন।

দিগম্বর মিত্রের বাড়ি (পৃঃ ১১৮-১৯)

উত্তর কলকাতার ঝামাপুকুরে ঠাকুর গদাধর
যে বাড়িতে বাস করতেন (পৃঃ ১১৮-১৯)

ঝামাপুকুরে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের টোল (পৃঃ ১১৮-১৯)

দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বর (পৃঃ ১২৪-১২৫)

মা ভবতারিণী (পৃঃ ১২৮-২৯)

রানী রাসমণি (পৃঃ ১৩৬-৩৭)

মথুরানাথ বিশ্বাস (পৃঃ ১৩৬-৩৭)

যখনই তিনি দেবপুরীতে মা-ভবতারিণীকে দর্শন করতে আসতেন, তখনই ঠাকুরকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর কাছে ভগবৎ প্রসঙ্গ এবং তাঁর গান শুনতেন। রানির বিশেষ প্রিয় গানটিই ঠাকুরকে গাইবার জন্য অনুরোধ করতেন।

‘কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব বাড়ায়েছ যেন কত ন্যাকা মেয়ে।।
জেনেছি জেনেছি তারা, তারা কি তোর এমনি ধারা।
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল এমনি করে।।’

গানটি গাইতে গাইতে দু-চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়ে তাঁর বুক ভেসে যেত। সেই গানের ভাব উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মনকে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করত। আবার ঠাকুর যখন পুজোয় তন্ময় হয়ে যেতেন, তখন কাছে দাঁড়িয়ে মাকে দর্শন করতে করতে কেউ কথা বললেও তিনি ঐকথা শুনতে বা তাদের উপস্থিতি কিছুই বুঝতে পারতেন না।

ঠাকুর বলতেন : অঙ্গন্যাস, করন্যাস ইত্যাদিগুলি করার সময় ঐ মন্ত্রবর্ণ নিজের শরীরে উজ্জ্বলবর্ণে সন্নিবেশিত হয়ে রয়েছে বলে তিনি সত্য সত্যই দেখতে পেতেন। তিনি দেখতেন এই সোনালী বর্ণ কী করে তাঁর শরীরের সঙ্গে মিশে-মিশে যাচ্ছে। কী করে সর্পিণী-কুণ্ডলিনী সুষুম্না দিয়ে ধীরে ধীরে সহস্রারে উঠছেন। শরীরের যে-যে অংশকে ত্যাগ করে যাচ্ছেন, সেই সেই অংশগুলি এককালে নিস্পন্দ-অসাড়-মৃতবৎ হয়ে যাচ্ছে। পূজার জায়গায় যখন ‘রং’ মন্ত্র বলে জল ছিটিয়ে দিতেন, দেখতেন সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে শত জিহ্বা বিস্তার করে অগ্নির প্রাচীর তৈরি হয়ে পূজার স্থানটিকে সমস্ত রকম বিপদ থেকে রক্ষা করছে।

ঠাকুর পরবর্তী কালে বলতেন, ‘ধ্যানের অবস্থা কীরকম জান? মন হবে ঠিক তেলের ধারার মতো। এক ঈশ্বরচিন্তা ছাড়া আর কোনও চিন্তা থাকে না। পাখি মারবার জন্য ব্যাধ তাগ করছে। সামনে দিয়ে বর

বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে চলে গেল! কত হট্টগোল। কিন্তু ব্যাধের হুঁশ নেই। জানতেও পারল না বর চতুর্দোলায় চলে গেল। তখন এমন হয় স্পর্শবোধ পর্যন্ত থাকে না। গায়ের ওপর দিয়ে সাপ চলে গেলেও সাপ বুঝতে পারবে না কিসের ওপর দিয়ে চলে গেল। মনের বার বাড়িতে কপাট দিয়ে বোসো। কপাটের বাইরে পড়ে থাকবে তোমার রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, আর স্পর্শের পাঁচ উপচার। বন্ধ ঘরে তুমি আর তোমার মন। সেখানে কেবল বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা। প্রথম প্রথম সব ভোগের থালা আসবে ভারে-ভারে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ উপচার। তখন কিন্তু বিচলিত হলে চলবে না। অন্ধকার থেকে চলে আসতে হবে শুভ্রতায়। তখন আর ওরা আসবে না। আসবে আর কার কাছে?’

‘ধ্যান করতে করতে প্রথম প্রথম আমার কী দর্শন হত জানিস?’ —বললেন একদিন ঠাকুর। ‘স্পষ্ট দেখলুম, সামনে টাকার কাঁড়ি। শাল-দোশালা। এক থালা সন্দেশ, দুটো মেয়ে আর তাদের ফাঁদি নথ। মনকে জিজ্ঞেস করলুম, মন তুই কি চাস? উত্তর পেলাম কোনোটাই নয়। ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর যে কিছুই চাইবার নেই।’

ঠাকুরের দৈনন্দিন পুজো ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সন্ধ্যাকালীন আরতির ভঙ্গিও ছিল চমৎকার এবং দেখবার মতো। লোকশিক্ষা দেবার জন্যই এবার ঠাকুর পূজারির বেশে অবতীর্ণ হয়ে সকলকে পুজো ও উপাসনা শিক্ষা দিয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে দেবপুরীর মধ্যে উত্তরে এবং দক্ষিণে দুটি নহবতখানা আছে। সন্ধ্যা-আরতির সময় জোড়া নহবত ছাড়াও ঢাক-ঢোল, কাঁসর-ঘণ্টা ইত্যাদি বাজতে থাকে। পুরীর মাঝখানে জোড়া কাঁসর, দামামা ও ঘড়ি বাজে। তার সঙ্গে খুব জোরে জোরে উচ্চারিত হয় মা-মা ধ্বনি। বিষ্ণু-মন্দিরের সামনে বাজে খোল-করতাল।

মা ভবতারিণীর মন্দিরে গদাই ডান হাতে খুব বড় পঞ্চপ্রদীপ অপর হাতে গুরুভার ঘণ্টা নিয়ে অত্যন্ত ভাবের সঙ্গে আরতি করতে থাকেন।

পঞ্চপ্রদীপের ঠিক পরেই কর্পূর এবং তার পর-পর পাণি শঙ্খ, বস্ত্র, ফুল এবং সবশেষে চামর দিয়ে ব্যজন করতে থাকেন। কিন্তু ভাবে একেবারে আত্মহারা হয়ে ঘনঘোর শব্দে বেজে চলে ঘণ্টা আর দক্ষিণহস্তে আরতির উপকরণ হেলে-দুলে আন্দোলিত হতে থাকে। ভক্ত-মনোলোভন সেই নিরুপম আরতি ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা অসম্ভব হলেও মন-প্রাণ দিয়ে সেটি কিন্তু অনুভব করা যায়। একনাগাড়ে বহুক্ষণ ঢাকঢোল, দামামা ইত্যাদি বাজাতে বাজাতে বাদকরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ঘেমে-নেয়ে বাদকরা ক্লান্ত হয়ে বাজনা একসময় বন্ধ হয়ে যায়। তবুও কিন্তু আরতি যেন আর শেষ হয় না। তিনি শেষপর্যন্ত বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে জড়বৎ হয়ে পড়েন। তখন হৃদয় তাঁকে অতি যত্নে ধরে ধরে বাইরে নিয়ে আসেন।

সন্ধ্যা আরতি কেন? এর তাৎপর্যই বা কি? বৈষ্ণব মতে এবং ভাগবতেও দেখা যায়—সেই কোন সকালবেলায় ছোট্ট কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে গোচারণে গিয়েছেন। গরুগুলিকে নিজেদের মতো চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়ে সারাদিন গোপবালকদের নিয়ে খেলাধুলোর পর, শেষ বিকেলে বাড়ি ফেরার পালা। গোধূলির শেষ বিকেলের অস্তগামী সূর্যের নরম আলোয় তখন চারিদিকে যেন একটা মায়াঘোর। কৃষ্ণের হঠাৎ মনে পড়ে যায় মায়ের কথা। মা-যশোদা ব্যাকুল চিত্তে পথপানে চেয়ে বসে আছেন। বালক কৃষ্ণের মায়ের জন্য মন কেমন করে ওঠে। তারা শেষপর্যন্ত এসে পৌঁছয় নন্দভবনে। প্রদীপের আলোয় মা যশোদা প্রাণভরে কৃষ্ণকে দেখতে থাকেন। প্রদীপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন তাঁর প্রাণপ্রিয় দুলালের কোমল অঙ্গের কোথায় কোথায় ধুলোকাদা লেগে তার অঙ্গকে মলিন করে দিয়েছে। অতি সন্তর্পণে সুরভিত জলে সেসব জায়গা ধুয়ে দিয়ে নরম কাপড় দিয়ে মুছে দেন সর্বাঙ্গ। সুগন্ধি ফুল দিয়ে মনের মতো করে সাজান গোপালকে। সাজানোর পর একমনে দেখতে থাকেন নয়নের মণিকে। দেখতে দেখতে মা যশোদা চামর দুলিয়ে কৃষ্ণের ক্লান্তি দূর করেন। হঠাৎই

নিজের সন্তানের মধ্যে জগৎকারণ শ্রীভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করে ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভয়-বিহ্বল চিত্তে মা যশোদা সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানান তাঁর শ্রীপাদপদ্মে। আসল কথা আরতি যে ভাব নিয়ে আর যে উপচারেই করা হোক না কেন, দেবতার চরণে আত্মনিবেদনেই এর পরিসমাপ্তি।

দিনের বেলা মায়ের মন্দিরে বেশ কেটে যায় গদাধরের।

রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, সেই সময় শয্যা ছেড়ে একা একা বেরিয়ে পড়েন গদাধর। চলে যান গভীর জঙ্গলে। কিন্তু কী করেন সেখানে? দেখা যেত সকাল হলে আবার যখন ঘরে ফিরে আসতেন, চোখ দুটি জবা ফুলের মতো লাল—ফোলা ফোলা। মনে হত যেন সারা রাত কেঁদেছেন। মুহূর্তের জন্যও ঘুমোননি। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত। উন্মাদের মতো চেহারা। সাধারণ মানুষ তাঁকে ভুল বুঝে রটাতে আরম্ভ করল যে গদাধর উন্মাদ হয়ে গেছেন। বিষয়-উন্মাদ ব্যক্তিরা ভগবদ্‌প্রেমে ব্যাকুল গদাইকে কী করে চিনবে?

।। বিবাহ ।।

বালক যেমন তার মনের কথা মায়ের কাছে সব খুলে বলে আনন্দ পায়, ভৈরবী-ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসবার পর ঠাকুরও ঠিক সেই রকম তাঁকে সব কথা বিনা দ্বিধায় বলতেন। তাঁর অলৌকিক দর্শনাদি, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতে করতে বাহ্যজ্ঞান হারানো, গায়ের তীব্র জ্বালা, রাত্রে নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলার সময় বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, 'হ্যাঁগো মা, এগুলো আমার কি হয় বলতো? আমি কি সত্য-সত্যই পাগল হয়ে গেলাম? মা-ভবতারিণীকে ব্যাকুল-চিত্তে ডেকে ডেকে সত্যিই কি আমার কোনও কঠিন ব্যাধি হল?'

ভৈরবী ব্রাহ্মণী নিজের উপলব্ধি এবং শাস্ত্রগ্রন্থাদির সঙ্গে মিলিয়ে, ঠাকুরের ঐসকল কথা শুনতে শুনতে কখনও উল্লসিতা, কখনও উত্তেজিতা আবার কখনও বা করুণার্দ্র চিত্তে বলতে লাগলেন, 'তোমাকে কে পাগল বলে বাবা? তোমার মহাভাব হয়েছে। ঠিক এই রকম অবস্থা হয়েছিল শ্রীমতী রাধারানির এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। শাস্ত্র বলছেন, ঈশ্বরকে যাঁরা একমনে এভাবে ডেকেছেন, তাঁদের সকলেরই এই রকম উচ্চ অবস্থা হয়ে থাকে।' পরে ঠাকুরের সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ করার সময় তাঁর বারবার বাহ্যচৈতন্যলোপ ও কীর্তনে পরমানন্দ দেখে ব্রাহ্মণীর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে ইনি একজন সামান্য সাধকমাত্র নন। ব্রাহ্মণী আরও লক্ষ্য করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের মতো ভাবাবেশে স্পর্শ করে অপরের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করার ক্ষমতাও ঠাকুরের মধ্যে অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকাশিত। সাধকের মধ্যে প্রধান প্রধান উনিশটি ভাব বা অবস্থার সম্মিলনকে ভক্তিশাস্ত্র 'মহাভাব' বলে উল্লেখ করেছেন। এতদিন পর্যন্ত এই বিশেষ গুণগুলি দেখা গিয়েছিল মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ও ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে। একমাত্র অবতারপুরুষ ছাড়া এই উনিশ প্রকার ভাবের উদ্দাম বেগ ধারণ করা কখনোই কোনও জীবের পক্ষে সম্ভব নয়।

আগেই বলা হয়েছে ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামকুমারের দেহাবসানের পর ঠাকুর মা-ভবতারিণীকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এখন মন্দিরে সমস্ত মন-প্রাণ মা ভবতারিণীর পাদপদ্মে ঢেলে দিয়ে পুজো করতে লাগলেন। ধ্যান করার সময় একটি ফুল নিজের মাথায় দিয়েই দুটি ঘণ্টা কেটে যেত। এখন থেকে পুজোর অঙ্গ হিসেবে পুজো শেষ করে মা-ভবতারিণীকে রোজই সাধক রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গান—একের পর এক ব্যাকুল চিত্তে গেয়ে শোনাতেন। গান গাইতে গাইতে চোখের জলে বুক ভেসে যেত। মাকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুলতা এবং অনুরাগ দিন-দিন বাড়তে থাকায়

তাঁর বুক সবসময় টকটকে লাল হয়ে থাকত। দেখা যেত কোনও-কোনও-দিন সন্ধ্যারতির সময় হওয়া সত্ত্বেও বিভোর হয়ে মাকে গান শোনাচ্ছেন তো শোনাচ্ছেন। আরতির সময় বয়ে গেলেও গান গাইতে-গাইতে এমনই ভাববিহ্বল হয়ে যেতেন যে স্থূল জগৎ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই তখন তাঁর থাকত না। তাঁর এই রকম নিষ্ঠা-ভক্তি ও ব্যাকুলতা দেখে দেবপুরীর লোকদের মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। যেমন মথুরবাবু ঠাকুরের পুজো দেখে ভাবতেন এই পূজকের আন্তরিকতা এবং অসীম ভক্তি ও ভালবাসাতে এবার মা খুব শীঘ্রই জাগ্রতা হয়ে উঠবেন। মন্দিরের অন্যান্য কর্মচারীরা ভাবতেন ঠাকুর উন্মাদ হয়ে গেছেন। এই সময় মাকে দর্শন করতে না পারার জন্য তাঁর মধ্যে একটা উদ্বেগ ও অস্থিরতার ভাব দেখা দিয়েছিল। আর তাই প্রথানুযায়ী বিধিবদ্ধ পুজো করা তাঁর পক্ষে ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

রানি রাসমণির দেবপুরীতে মা-ভবতারিণীর মন্দিরে গদাই আর পুজো করছে না। শেষপর্যন্ত কামারপুকুরে মা-চন্দ্রামণির কানেও এই খবর এসে পৌঁছালো। এমনিতেই মা চন্দ্রামণি জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারের আকস্মিক মৃত্যুতে খুবই শোকাহত হয়েছিলেন। তার ওপর গদাইয়ের এই সংবাদে তিনি দুশ্চিন্তায় একেবারে অধীর হয়ে উঠলেন।

একটা কথা প্রচলিত আছে যে, মানুষের জীবনে যখন দুঃখ আসে, তখন কেবলমাত্র একটি দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়েই সেটি শেষ হয়ে যায় না। নানারকমের দুঃখ তখন চারিদিক থেকে এসে মানুষের জীবনকে সাময়িকভাবে হতাশাগ্রস্ত করে তোলে। মা চন্দ্রামণি ও রামেশ্বর এখন যেন ঠিক এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলেন।

তাঁরা আশঙ্কা করলেন গদাইয়ের মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে।

অত্যন্ত আদরের ছোট ছেলে গদাই, তাঁর নয়নের মণি। তার সম্বন্ধে এই নিদারুণ সংবাদ শুনে মা-চন্দ্রামণি নানা রকম অমঙ্গল আশঙ্কায় অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন। শোকে-দুঃখে অধীরা হয়ে তিনি

রামেশ্বরকে দিয়ে চিঠির পর চিঠি লেখাতে লাগলেন। যাতে গদাই অবিলম্বে দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে ফিরে যায়।

এর অল্পদিন পরেই কামারপুকুরে মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় ফিরে এল তাঁর একান্ত স্নেহের গদাধর।

‘এখানে প্রভুর ভাব হইল স্বতন্তর।
কখন সুস্থিরতর কভু বহে ঝড়।।’ (পৃঃ ৫৩)

গ্রামে ফিরে গদাই কখনও জড়ের মতো নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। আবার কখনও বা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে মা-মা বলে কেঁদে আকুল হয়। এই কান্না—এই ব্যাকুল করা মা-ডাকেই খুব বেশি অধীর হয়ে ওঠেন মা চন্দ্রামণি। তিনি গদাইয়ের এই কান্না আর যেন সহ্য করতে পারেন না। উৎকণ্ঠিত চিত্তে গদাইয়ের পিঠে-বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। মায়ের স্নেহ-স্পর্শে আবার বেশ হাসিখুশি হয়ে ওঠেন গদাই। কিন্তু কিছু পরে আবার সেই ভাবাবেশ! এই সময় তাঁর আচরণে কোনও লজ্জা, ঘৃণা, বা ভয় নেই। জগৎ-সংসার বলে যে কিছু আছে, সেই বোধই নেই। একেবারে মুক্ত পুরুষ। আর তাই লোকলজ্জা বলে কিছুই থাকে না! তবে মাঝে মাঝেই মা-চন্দ্রামণির মনে হয় তাঁর গদাই ঠিক পাগল হয়নি। পাগল হলে মাকে কি কেউ এতো ভালবাসতে পারে! পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে সেই একভাবেই আগের মতোই হাসি-ঠাট্টা-তামাশা করতে পারে! গাঁয়ের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, এ উপদেবতার ভর ছাড়া আর কিছুই নয়। ওঝাই পারবে এর একটা বিহিত করতে। কাজেই ওঝা ডাকা হল। ওঝা এসে অনেক ঝাড়ফুঁক করল, অনেক মন্ত্র পড়ল। শেষে একটা মন্ত্রপূত পলতে পুড়িয়ে শুঁকতে দিয়ে বলল, যদি ভূত হয় এতেই পালাবে। আর যদি না হয়—মনে মনে হাসল গদাই।

শেষপর্যন্ত যখন কিছুই হল না তখন সকলের পরামর্শে ‘চণ্ড’ নামানোই ঠিক হল। তন্ত্র-মন্ত্রে অত্যন্ত নিপুণ চণ্ডের ওঝা এল।

গ্রামের লোকেরা চণ্ড নামানো দেখার জন্য ভিড় করেছে। যথাবিধি পুজো ও বলি দেওয়াতে প্রসন্ন হয়ে চণ্ড অধিষ্ঠিত হলেন। চণ্ড বললেন, ‘ওকে ভূতে পায়নি বা ওর শরীরে কোনও ব্যাধিও নেই।’ পরে গদাধরকে সম্বোধন করে বললেন, ‘গদাই, যদি তোমার সাধু হওয়ারই এত ইচ্ছে, তবে তুমি এত সুপারি খাও কেন? ওতে দেহে কামের বৃদ্ধি হয়!’ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের কাছে বলতেন : ‘আমি সুপুরি খেতে খুব ভালবাসতাম এবং যখন তখন খেতাম। চণ্ডের কথাতে আমি সুপুরি খাওয়া একেবারে ত্যাগ করেছিলাম।’

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন ঠাকুরের বয়স প্রায় তেইশ বছর। কামারপুকুরে কয়েকমাস থাকার ফলে এখন গদাইয়ের শরীর ও মন অনেকখানি ভাল আছে। লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে, এই সময় ঠাকুর কামারপুকুরের পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ‘ভূতির খাল’ এবং ‘বুধুই মোড়ল’ নামে শ্মশান দুটিতে দিনের বেলা এবং রাত্রির বেশ কিছুটা সময় একাকী কাটাতেন। সেই সময় এই দুটি শ্মশানই ছিল অত্যন্ত নির্জন এবং জঙ্গলাকীর্ণ। গদাই এই জায়গা দুটিতে শ্রীশ্রীজগদম্বার অদ্ভুত দর্শনাদি বারবার লাভ করে এখন অনেকটা শান্ত হতে পেরেছিলেন।

‘এখানেতে প্রভুদেব আপনার মনে।
কখন ঠাকুরপূজা কখন শ্মশানে।।’ (পৃঃ ৫৪)

এই দুটি শ্মশানে শিবা আর উপদেবতাদের উদ্দেশে তিনি মাঝে মাঝেই বলি প্রদান করতেন। ভোগ দেবার জন্য নতুন হাঁড়িতে মিষ্টান্নাদি খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ঐ সব স্থানে যেতেন। যে হাঁড়িতে শেয়ালের জন্য খাবার থাকত, সেটি দেওয়ার সাথে সাথেই কোথা থেকে সব দলে দলে শেয়াল এসে খেয়ে যেত। আর যে হাঁড়িগুলি শিবের অনুচরদের ও উপদেবতাদের জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলি হঠাৎ শূন্যে উঠে গিয়ে বাতাসে যেন মিলিয়ে যেত। পাত্র বা খাদ্যসামগ্রীর কোনও খোঁজই পাওয়া যেত না।

অনেক সময় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত গদাই বাড়ি না ফিরলে মা চন্দ্রামণি অস্থির হয়ে উঠতেন। চিন্তা করে কোনও কূলকিনারা করতে না পেরে, শেষপর্যন্ত মধ্যম পুত্র রামেশ্বরকে শ্মশানে পাঠিয়ে ধরে আনতে বলতেন গদাইকে। গাঁয়ের শেষ প্রান্তে উত্তর-পূর্ব কোণে বুধুইমোড়ল-নামক শ্মশানের কাছাকাছি এসে রামেশ্বর গদাইয়ের নাম ধরে বেশ জোরে জোরে ডাকতেন। গদাই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠতেন, ‘যাচ্ছি-গো দাদা যাচ্ছি। তুমি আর এদিকে এসো না। এরা আমার সঙ্গে কিছু করে উঠতে পারছে না। কিন্তু তোমাকে এরা ছাড়বে না। এরা তোমার ক্ষতি করবে।’

বুধুই মোড়ল আর ভূতির খাল শ্মশান-দুটিতে বসতে পেরে গদাই এখন অনেক শান্ত হয়েছেন। এখানে দিগন্ত-বিস্তৃত বিশাল প্রান্তরস্থিত নির্জন শ্মশানের মধ্যে তাঁর প্রায়ই দর্শন হতে লাগল ‘মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম’ জগন্মাতার। ‘মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন।’ ‘তিনি দর্শন করতে লাগলেন কর্ত্রীকারয়িত্রী সংসারৈকসারাকে।’ ‘আমার দুঃখ দেওয়ার ছলে, মা তোর ভুবন-ভরা রূপ দেখালি।।’ চিন্ময়ী মায়ের দর্শন লাভ এবং তাঁর কাছ থেকে মনের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর পেয়ে গদাই সেইমতো নিজের জীবন পরিচালিত করছিলেন। যার ফলে তিনি এখন অনেক শান্ত ও সমাহিত হয়েছেন।

কিন্তু আত্মীয়স্বজনেরা এবং পাড়াপড়শিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন—‘গদাই শান্ত হয়েছে কিন্তু জাগতিক বিষয়ে সে উদাসীন। পরিধানের কাপড়ের প্রতি দৃষ্টি নাই। সে কি কখনও সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হবে?’

শেষপর্যন্ত পল্লীবাসী এবং আত্মীয়স্বজনেরা সবাই পরামর্শ করে ঠিক করলেন বিবাহ দিতে পারলে গদাইয়ের মঙ্গল হতে পারে।

‘একত্রে আত্মীয়বর্গে যুক্তি স্থির করে।
পারিলে বিবাহ দিতে হিত হ’তে পারে।।’ (পৃঃ ৫৪)

‘আর তাই গদাইয়ের অনুপস্থিতিতে আবার কখনও বা তার আড়ালে মা আর দাদা রামেশ্বর তার বিবাহের ব্যবস্থা করতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল সুশীলা স্ত্রীর ওপর মমতা-ভালবাসা গড়ে উঠলে—গদাইয়ের সবসময় যে উন্মনা ভাব, সেটি দূর হয়ে যাবে। যাকে নিয়ে এত গোপনীয়তা, সেই গদাইকে কিন্তু ব্যাপারটা লুকোনো গেল না। সমস্ত কিছুই টের পেয়ে শিশুর মতো উল্লসিত হয়ে বলতে লাগলেন ‘ওরে আমার বিয়ে হবে!’ বাড়িতে কোনও উৎসব হলে বা প্রিয় কোনও আত্মীয়ের আসার সম্ভাবনা থাকলে শিশু যেমন আনন্দে মাতামাতি করে—ঠিক তেমনই। যেন সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কে আসছে তাঁদের সংসারে!

বিয়েতে গদাইয়ের মত আছে জেনে নিশ্চিন্তা হলেন চন্দ্রামণি। শিহড়ের হৃদয়নাথের ভাই লক্ষ্মী মুখুজ্জেকে ঘটক হিসেবে নিযুক্ত করা হল।

জয়রামবাটী গ্রামের জয়রাম মুখুজ্জের কন্যা কালীর সঙ্গে সম্বন্ধ এনেছে ঘটক। কিন্তু পাত্র গদাই পাগল জেনে এই সম্বন্ধ ভেঙে গেল। এই সময় চন্দ্রামণি ও রামেশ্বর যখন দুশ্চিন্তায় আকুল—ঠিক সেই সময় গদাই ভাবাবিষ্ট হয়ে তাঁদের বলেছিলেন : ‘অন্য জায়গায় খোঁজাখুঁজি করা বৃথা। আমার বিবাহের পাত্রী জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে কুটো-বাঁধা হয়ে আছে। চাষি তার ক্ষেতের যে ফলটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, ঠাকুরকে নিবেদন করবে বলে তাতে একটা কুটো বেঁধে রাখে। পরে যাতে ভুলে সেটি বেহাত না হয়ে যায়। ঠিক তেমনই আমার বিয়ের কনে জয়রামবাটী গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে কুটো-বাঁধা হয়ে আছে। ওখানে খোঁজ করলেই তোমাদের আর ভাবনা বা ব্যর্থ পরিশ্রম করতে হবে না।’

শেষপর্যন্ত গদাইয়ের কথানুযায়ী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা পাঁচ বছরের সারদার সঙ্গেই বিয়ে ঠিক হল। যদিও আর সবকিছু মিলছে বটে, তবে পাত্রীটি একান্তই বালিকা। তার বয়স মোটে পাঁচ বছর। হয়তো জগন্মাতা এই রকম গুপ্তভাবেই লীলা করবেন ঠিক করেছেন। আর তাই মা চন্দ্রামণিও এই বিয়েতে মত দিলেন। কন্যাপক্ষের পণ তিনশো টাকা। তখনকার দিনে কন্যাপক্ষেরই পণ নেওয়ার প্রথা। কষ্টেসৃষ্টে এই টাকাও রামেশ্বর জোগাড় করলেন।

এই ব্যবস্থায় শুধু মা চন্দ্রামণিই নন—পল্লীর সমস্ত নরনারীই তাদের একান্ত স্নেহের গদাইয়ের বিয়ের খবরে খুব খুশি। সরলা মা চন্দ্রামণি অত্যন্ত পুলকিতা হয়ে পল্লীর বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে গদাইয়ের বিয়ের কথা জানিয়ে সবাইকে নিমন্ত্রণ করে এলেন। গ্রামস্থ সমস্ত নরনারীর মন এই খবরে আনন্দে নেচে উঠল।

কামারপুকুর পল্লীবাসীদের প্রাণপ্রিয় গদাইয়ের বিয়ে। তাই আনন্দের আতিশয্যে তাদের কারও চোখেই রাতে আর ঘুম আসছে না।

‘ঘরে ঘরে পড়ে গেল আনন্দের ধুম।
রাত্রিকালে কারো চোখে নাহি আসে ঘুম।।’ (পৃঃ ৫৫)

গদাইয়ের বিয়েকে উপলক্ষ করে কামারপুকুর-পল্লীর ঘরে ঘরে আনন্দের ধুম পড়ে গেল। বিশেষ করে পল্লীর রমণীগণ যেন আনন্দসাগরে ভাসছেন। শেষপর্যন্ত গ্রামবাসীদের অধীর আগ্রহে দিন গোনার পর সেই বিশেষ দিনটি এসে উপস্থিত হল। আজই সেই পবিত্র শুভ দিন। প্রতিবেশি রমণীগণ সব আনন্দে উল্লসিতা হয়ে পরম কান্তিময় প্রভুদেবকে সাজাবার জন্য মা চন্দ্রামণির বাড়িতে এসে সমবেত হতে লাগলেন। এসেই কেউ চন্দন ঘষছেন, কেউ বা মালা গাঁথছেন। সযত্নে তাঁরা সবাই তাঁর মনোহর ‘বেশ’ রচনা করতে লাগলেন।

বিবাহের দিন স্থির হল বাংলা ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের শেষের দিকে। এই সময় গদাধরের বয়স প্রায় চব্বিশ বছর। আর কন্যা সারদার বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে। জয়রামবাটীতে বিবাহ। কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী গ্রাম প্রায় মাইল চারেকের পথ।

বরবেশে গদাইকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। পল্লীর স্ত্রীলোকেরা গদাইকে মনের মতো করে সাজিয়েছেন। এমনিতেই অত্যন্ত সুদর্শন গদাই। তাঁর অঙ্গে চেলির জোড়–বস্ত্র, গলায় ফুলের মালা এবং কপালে চন্দনের তিলক। সাজানোর পর পল্লীবাসীরা অপলক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগলেন। পল্লী রমণীগণ আনন্দে শুভপ্রদ হুলুধ্বনি দিচ্ছেন। কিন্তু মাতৃসমা মেজ বৌদিদির মনে বড় দুঃখ। বিয়েতে বাজনা হয়নি। তিনি ভাবছেন, অন্ততপক্ষে ঢোল আর কাঁসর না হলে কি বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান মানানসই হয়! দৈবশক্তিসম্পন্ন গদাধর মাতৃসমা বৌদিদির অন্তরের দুঃখের কথা ঠিক টের পেয়ে গেছেন। বললেন, ‘দাঁড়াও আমি নিজেই বিয়ের বাজনা বাজিয়ে দিচ্ছি।’ গদাই অনুকরণে খুবই পটু। মুখে ঢোলের বোল বলে পাছা বাজিয়ে নাচতে লাগলেন। বিয়েতে চলেছেন। এমন সময় ঢোলের বাজনা! বাল্যভাব না ধরলে গদাইকে যে বুঝতে পারবে না কেউ। তাই,

‘এত বলি দেন মুখে বোল পরিপাটি।
ডেলে গু ডেলে গু ডেলে ডেলে ডেলে কাটি।।
ঢোলের স্বরূপ হাতে পাছা বাজাইয়া।
বাজান ডোমের বাদ্য নাচিয়া নাচিয়া।।’ (পৃঃ ৫৫)

মহারঙ্গকারী গদাই সত্যিই অতুলনীয়। আর তাই গদাইয়ের এই রঙ্গ। তাঁর ঢুলিদের অনুকরণে নাচ এবং বাজনা শুনে সবাই নির্মল আনন্দে মুখরিত। এখন মেজ বৌঠানের মনেও আর কোনও খেদ নেই।

খোলা গায়ে, খালি পায়ে বরযাত্রী চলেছে সব। কোমরে চাদর, কাঁধে গামছা, হাতে লাঠি। পথে যেতে যেতে তাদের মুখে চলতে লাগল কত রঙ্গ, রহস্য, কৌতুক। এই ভাবে তারা জয়রামবাটী গ্রামের কাছে পৌঁছালো।

এই বিবাহ আমাদের হিমালয়ে হর–গৌরীর বিবাহানুষ্ঠানের কথা মনে করিয়ে দেয়। শিবের বিয়ের দিন নাচে–গানে পারদর্শী অনুচরেরা সব মত্ত হয়ে বিয়ে দিতে চলেছে। পথে যেতে যেতে নানা রকম জাতি–খেলা খেলছে। নন্দিভৃঙ্গি, ভৈরব, তাল–বেতাল, ভূত–প্রেতের দল আনন্দে নাচতে নাচতে চলেছে। তাদের দুরন্ত আচরণে ধরণি যেন প্রকম্পিত। তাদের ছুটোছুটি, হুটোপাটির দাপটে ধরিত্রী যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মহাফণির শিরস্থিত কোটি প্রাণী ভয়ে কাঁপছে। ভূতদের মুখের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

‘ছুটাছুটি হুটপটি মাটি ফাটে দাপে।
মহাফণী ত্রস্ত প্রাণী কোটি শিরে কাঁপে।।
ভূতদলে আলো জ্বালে মুখের ভিতর।
চারি ধারে যায় ঘেরে ষাঁড়ে দিগম্বর।।’ (পৃঃ ৫৫)

মধ্যস্থলে বিরাজমান কন্দর্পদর্পনাশী ব্যোমকেশ। গদাধরের সঙ্গী বরযাত্রিগণও ঠিক এইভাবেই বিয়ের আসর জয়রামবাটী গ্রামের কাছে এসে পৌঁছালেন।

রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায় পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ। তাঁদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। পুরুষ–প্রকৃতির যোগই হল যোগমায়া। আর এই যোগের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিম রূপ। এই যোগ দেখার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীরাধার দিকে। আর শ্রীরাধার দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের দিকে। শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ বলে শ্রীরাধার নাকে নীল পাথর। আবার শ্রীরাধার গায়ের রঙ মুক্তোর মতো উজ্জ্বল বলে শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা। শ্রীরাধার বসন নীল বলে পীতাম্বর হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমতীর পায়ে নূপুর। আর তাই শ্রীকৃষ্ণের পায়েও নূপুর। আসল কথা হল প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের অন্তরে–বাহিরে মিল। শিব আর শক্তি ছাড়া আর যে কিছু নেই।

বিবাহকালীন আচার হিসেবে সাতাশটি কাঠি জ্বেলে মেয়েরা বররূপী গদাইকে প্রদক্ষিণ করছেন। হঠাৎ জ্বলন্ত কাঠির আগুনে গদাইয়ের হাতে–বাঁধা হলুদমাখানো মাঙ্গলিক সুতো পুড়ে গেল।

‘জ্বালা কাঠি লাগিয়া কি হৈল শুন কথা।
পুড়ে গেল শ্রীপ্রভুর মাঙ্গলিক সুতা।।’ (পৃঃ ৫৫)

কিন্তু এ কি অঘটন! এরও একটি মানে আছে। এটির মধ্যে দিয়ে অবিদ্যা-বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। অবিদ্যা-মুক্ত শক্তিকে গ্রহণ করলেন গদাধর। ঠাকুর পরে বলেছিলেন, ‘এই অবিদ্যাকে জয় করবার জন্যই তো শক্তির পূজাপদ্ধতি।’ এই বাংলা দেশে বিয়ের সময় বরের হাতে একটা জাঁতি থাকে। আর পশ্চিমে বরের হাতে থাকে ছুরি। এর অর্থ হল শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর ‘মায়া-পাশ’ ছেদন করবে। আর এই জন্যই কন্যা শক্তিরূপা।

ঘরের মধ্যে বাসর সাজাচ্ছে মেয়েরা। বাইরে দাওয়ায় খাওয়ানোর জন্য নিমন্ত্রিতদের পাত পড়েছে। ব্রাহ্মণদের আগে খেতে বসানো হয়েছে।

কত হাস্যকৌতুকই যে করছে মেয়েরা! কত লীলা চাপল্য! এই সব দেখতে দেখতে গদাইয়ের ভুবন-রঙ্গময়ীর কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর অন্তরে রঙ্গময়ী মায়ের লীলা জাগ্রত হয়ে উঠল।

‘নানাবিধ রমণীর নানারঙ্গ হেরে।
রঙ্গময়ী মার লীলা জাগিল অন্তরে।।
মা মা বলি হৈলা প্রভু ভাবাবেশান্বিত।
কোকিল জিনিয়া কণ্ঠে ধরিলেন গীত।।’ (পৃঃ ৫৬)

আর সঙ্গে সঙ্গেই গদাই ভাবাবিষ্ট হয়ে উদার কণ্ঠে মধুর সুরে তন্ময় হয়ে মা কালীর গান গাইতে আরম্ভ করলেন। বাসরঘরে মুহূর্তের মধ্যে যেন দেবতার মন্দিরের পরিবেশ সৃষ্টি হল। সেই আধ্যাত্মিক উচ্চ ভাবতরঙ্গে উপস্থিত সমস্ত নারী-পুরুষ আনন্দ ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। যাঁরা খাচ্ছিলেন, খাওয়া ভুলে মায়ের নামগুণগান শুনতে শুনতে কোন এক দিব্যলোকে অবস্থান করতে লাগলেন। বাসরের

রমণীগণ মুগ্ধ-বিস্ময়ে বর-রূপী গদাইকে অপলক দৃষ্টিতে দেখছেন। সবাই ভেবেছিলেন বাসরঘরে নতুন বরকে নিয়ে কত রকমের রঙ্গ রসিকতা করবেন! কিন্তু গদাইয়ের অভূতপূর্ব রঙ্গ দেখে তাঁদের মনের সমস্ত রকমের ইচ্ছে কোথায় কখন যেন হারিয়ে গেল। উপস্থিত অতিথি-অভ্যাগতদের সমস্ত অন্তর এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের স্রোতে মাতোয়ারা হয়ে গেল।

আগেই বলা হয়েছে যে ঠাকুর একবার শিহড়ে হৃদয়ের বাড়ি গিয়ে একটি গানের আসরে গান শুনতে গিয়েছিলেন। সেই গানের আসরে আশপাশের গ্রামের লোকেরাও গান শোনবার জন্য এসেছেন। শ্যামাসুন্দরীদেবীও ছোট্ট শিশু সারদাকে কোলে নিয়ে গান শুনছেন। গান শেষ হয়ে যাওয়ার পর একজন বয়স্কা আত্মীয়া ঐ শিশু সারদাকে মজা করে জিজ্ঞেস করলেন : এতো লোকের মধ্যে তুমি কাকে বিয়ে করতে চাও? শিশু-কন্যাটি সঙ্গে সঙ্গে তার কচি কচি হাত দুখানি তুলে অল্প দূরে উপবিষ্ট গদাধরকে দেখালেন। পরবর্তী কালে ঐ শিশুই জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। ভগবতী-জগন্মাতা এই রকম গুপ্তভাবেই যে আপ্তলীলা করবেন ঠিক করেছেন।

বাসরঘরে মা-কালীর গান গদাধর এমনই তন্ময় হয়ে গাইছেন যে কোমরে তাঁর কাপড় নেই বা প্রায় দিগম্বর অথচ সে-সম্বন্ধে তাঁর কোনও খেয়ালই নেই। বাসরঘরে সমবেত পল্লীরমণীরা উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে এমনই বিভোর যে তাঁদেরও এই জাগতিক বিষয়ে কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। শাশুড়ি ঠাকরুন শ্যামাসুন্দরীদেবী রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। জামাতা গদাইয়ের সুললিত কণ্ঠের অপুর্ব গান শুনে তিনি আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এলেন বাসরঘরে। বৃন্দাবনে ব্রজগোপীরা যেমন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুরে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে ছুটে আসতেন—ঠিক একইভাবে ছুটে এলেন শ্যামাসুন্দরীদেবীও। সমস্ত কিছু ভুলে বিভোর হয়ে তিনি জামাতাকে দেখছেন—তাঁর গান শুনছেন। এই সময় তাঁর মাথার

ঘোমটা খসে পড়েছে। কিন্তু সেদিকে তাঁর কোনও হুঁশই নেই। আসলে ভগবানের সান্নিধ্যে মানুষের দেহবোধ চলে যায়। তখন একেবারে ঐশ্বরিক আনন্দের হাটবাজার। আর তাই শ্যামাসুন্দরীর চিত্তে জাগতিক সংকোচবোধও চলে গেছে। স্বয়ং ভগবানকে জামাতারূপে পেয়ে শ্যামাসুন্দরীদেবী ধন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের নানা অনুভূতি এবং শারীরিক বিকারের কথা শুনে ভৈরবী-ব্রাহ্মণীর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল ভগবান শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ দুজনে জীবোদ্ধারের জন্য ঠাকুরের শরীর এবং মন আশ্রয় করে আবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ ঠাকুরের বিবাহ-অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের বিবাহের ঘটনাটিও স্মরণ করা যায়।

শ্রীচৈতন্য বা নিমাই-পণ্ডিতের মা রোজ গঙ্গাস্নান করেন। একবার নয়, দিনে তিনবার। তিনি যখনই গঙ্গাস্নান করতে যান দেখেন একটি ছোট্ট মেয়েকেও। রোজ রোজ তারও গঙ্গাস্নান করা চাই। শচীদেবীর সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্রই মেয়েটি এগিয়ে এসে শচী-মাকে প্রণাম করে। তার ইচ্ছে করে শচীদেবীর কাছ-ঘেঁসে দাঁড়ানোর, কিছু মিষ্টি কথা শোনার। একটু বা আদর পাওয়ার। মাত্র ন-দশ বছরের ফুটফুটে মেয়েটি—যেন সোনার প্রতিমা। ভক্তিতে যেন ভরপুর হয়ে আছে। গঙ্গাস্নানান্তে তীরে বসে প্রতিবারই কন্যাটি শ্রীকৃষ্ণের পুজো করে।

শচীদেবী ভাবেন, 'আহা! এই মেয়েটিকে নিমাইয়ের বউ করে ঘরে নিয়ে আসতে পারতাম!' শচীদেবী একদিন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে বসেন, 'তোমার বাবার নাম কি মা?'

—সনাতন মিশ্র।

'আর তোমার নাম?' মেয়েটি লজ্জাবনত হয়ে বলল—বিষ্ণুপ্রিয়া।

তোমাকে আশীর্বাদ করি মা তোমার বিষ্ণুর মতো স্বামী হোক।

দক্ষিণেশ্বরে গোবিন্দজীর বিগ্রহ (পৃঃ ১৪৪–১৪৫)

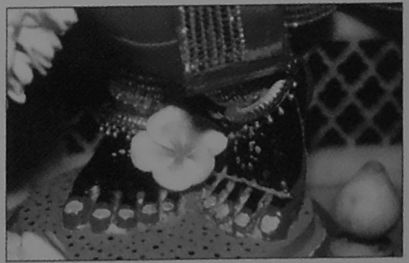

গদাধর নিখুঁতভাবে জুড়ে দেওয়ার পর গোবিন্দজীর ভগ্ন শ্রীপাদপদ্ম (পৃঃ ১৪৪–১৪৫)

(মায়ের) পায়ের লোভে মনের বনে
ফুল ফুটেছে পাঁচমিশালি (পৃঃ ১৫০–৫১)

এত স্নেহ মা গো তোমার তবুও করি অবিশ্বাস
অন্ধ মনের যায় না সন্দ যতই তুমি দাও আশ্বাস
(পৃঃ ১৬২–৬৩)

ভূতির খাল

ভূতির খালের তীরবর্তী বিস্তীর্ণ শ্মশানভূমি

বুধুই মোড়ল শ্মশানক্ষেত্র

শচীদেবী ঘটক কাশী মিশ্রকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘সনাতন মিশ্রকে জান?’ জানি বৈকি। বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণ। পদবী রাজপণ্ডিত। আদান-প্রদানের ঘর। এই কথা শুনে শচীদেবীর চোখ-মুখ আশার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তখন ঘটক কাশী মিশ্র—সনাতন মিশ্রের গুণাবলী সবিস্তারে বললেন তাঁকে।

সব শুনে শচী-মাতার মুখ ম্লান হয়ে গেল। এত বড় কুলীন, সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি কি আর আমার পিতৃহীন গরিব সন্তানকে পছন্দ করবেন? কিন্তু মনের ইচ্ছে চেপে না রেখে ঘটককে বলে ফেললেন, সনাতন মিশ্রের বিবাহযোগ্যা কন্যাটিকে আমার নিমাইয়ের জন্য এনে দিতে পারবে? কাশী মিশ্র অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, বড় কঠিন কাজ দিলেন মা!

‘আমার বড় ইচ্ছে মেয়েটিকে বউ করে নিয়ে আসি। দেখলেই মনে হয়, কোলের কাছটিতে টেনে নিই। তুমি একটু ভাল করে চেষ্টা করে দেখো। শচীদেবীর এই অনুরোধে দু-একদিনের মধ্যেই কাশী মিশ্র সনাতন মিশ্রের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন।

সনাতন মিশ্র তাঁকে দেখে অভ্যর্থনা করে বসালেন। আসন গ্রহণ করেই ঘটকমশাই বলে বসলেন, ‘বিশ্বম্ভর পণ্ডিতকে চেনেন?’—‘সে আবার কে?’ ‘সে কি কথা?’ চমকে ওঠবার ভান করলেন কাশী মিশ্র। ‘আমাদের নিমাই পণ্ডিতকে চেনেন না?’ ‘ওহো তাই বলো। হ্যাঁ তার কথা আমার কানে এসেছে।’ ‘না দেখে থাকলে, দেখে আসবেন একদিন।’

‘কেন, সে কি দেখতে খুব সুন্দর?’ —‘সে রূপের বর্ণনা করা যায় না। বেড়াতে বেড়াতে যাবেন একদিন গঙ্গার ঘাটে। নিজের চোখেই দেখে আসবেন একবার। দেখবার পর কি হবে জানেন? কয়েক পা এসে আবার ফিরে যাবেন। ফিরবেন ঘুরবেন আবার যাবেন। শেষে এমন হবে যে তাকে দেখে আর আশ মিটবে না। তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।’

বেশ যাব একদিন। —বললেন সনাতন।

নিমাইকে দেখলেন সনাতন মিশ্র। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ কী মানুষ না দেবতা? দেখলেই মনে হয় সমস্ত রূপই তার কৃষ্ণবিলাস। সমস্ত বিদ্যাই তার কৃষ্ণভক্তি। দেখলেন তার সমস্ত শরীর থেকে জ্যোতির স্রোত নির্গত হচ্ছে। এ যেন প্রাকৃত জ্যোতি নয়। চিন্ময় দ্যুতি। সনাতনের মনে হল এ-হেন অসামান্য—আমার মেয়েকে কি পছন্দ করবে? সনাতন মিশ্রের মুখে সব কথা শুনে তাঁর স্ত্রী বললেন, আহা! আমার কি সেই ভাগ্য হবে? সে কি আমার মেয়েকে পছন্দ করবে?

তখনকার দিনে ধনবানের চেয়ে বিদ্বানের সমাদর ছিল অনেক বেশি। কৌলিন্য কাঞ্চনে নয়। কৌলিন্য পাণ্ডিত্যে। আর তাই সনাতন মিশ্র ঘটক কাশী মিশ্রের মাধ্যমে তাঁর কন্যার সাথে নিমাই পণ্ডিতের বিয়ে দিতে যে রাজি আছেন, সেকথা শচীদেবীকে জানালেন। আরও বললেন যে, এখন শচীদেবী যদি কৃপা করে আমার এই কন্যাটিকে গ্রহণ করেন, তবে আমাদের নদীয়াবসতি সার্থক হবে।

বারবার গঙ্গাস্নান করতে আসে বিষ্ণুপ্রিয়া, যদি একবার স্থূল চোখে দেখতে পায় গৌরাঙ্গসুন্দরকে! শচীকে দেখতে পেলেই বিষ্ণুপ্রিয়া ছুটে আসে তাঁর কাছটিতে। এসেই প্রণাম করে।

একদিন গণক-ঠাকুর বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করতে চলেছেন সনাতন মিশ্রের বাড়ি। পথে নিমাইয়ের সাথে দেখা। গণকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব শুনে হাসতে লাগলেন নিমাই। 'আমার বিয়ে, অথচ কী আশ্চর্য, আমি কিছুই জানি না!' চলে গেল হাসতে হাসতে। নিমাইয়ের কথাবার্তায় গণক-ঠাকুরের কেমন যেন খটকা লাগল। মনে হল নিমাই বোধহয় এই কন্যাটিকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক নয়। গণকের মুখ গম্ভীর। সনাতন মিশ্রের বাড়িতে পৌঁছে নিরাশ হয়ে চুপচাপ বসে রইলেন।

সনাতন মিশ্র বললেন, 'পাঁজি-পুঁথি দেখে লগ্ন স্থির করুন।'

ম্লানমুখে গণক বললেন, এই একটু আগেই আসবার সময় নিমাই-পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হল।

সনাতন মিশ্র জিজ্ঞেস করলেন : কথা হল? কি বললে নিমাই?

গণক বললেন : বলবে আর কি? বিয়ের কোনও খবরই সে রাখে না। বিয়ের কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল। মনে হচ্ছে এই বিয়েতে তার মত নেই।

গণক-ঠাকুরের মুখে এই খবর পেয়ে সনাতনের সংসারে দুঃখের ছায়া নেমে এল। সনাতন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ভাবছেন—শচীদেবীর কথার দাম কি! ছেলের যখন মত নেই তখন এই বিয়ে আর হল না। অন্তঃপুরে খবর পাঠালেন সনাতন। সেখানে সবাই অত্যন্ত হতাশ হয়ে গেলেন। ঠিক এই সময়ে একজন অতিথি এসে হাজির হলেন সনাতনের বাড়িতে। বললেন, আমাকে নিমাই-পণ্ডিত পাঠিয়েছেন। সনাতন শোকে-দুঃখে অভিভূত হয়ে বিছানায় শুয়েছিলেন। উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন? কি খবর?' আগন্তুক বললেন : 'বিয়ের উদ্যোগ করুন। শচীদেবী যে নিমাইয়ের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছেন, তা তখনও নিমাইকে জানাননি তিনি। আর তাই গণক-ঠাকুরকে অমনি করে বলেছিল নিমাই। নিমাই আরও বলেছেন, তাঁর স্বতন্ত্র কোনও মত নেই। মায়ের মতই তাঁর মত। গণক-ঠাকুরকে ডেকে এখনই দিনক্ষণ ঠিক করুন।' বিষ্ণুপ্রিয়ার মা আনন্দে 'উলু' দিয়ে উঠলেন। আর বিষ্ণুপ্রিয়া? সে এখন শুধু কৃষ্ণের বাঁশির মধুর সুরই শুনছে। গৌর ছাড়া মুখে আর কোনও কথা নেই।

নিমাই-পণ্ডিতের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই কামারপুকুরের মতোই সমস্ত নবদ্বীপ আনন্দে মেতে উঠেছে। কায়স্থ জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ বললেন, 'এই বিয়ের সমস্ত খরচ আমি দেব।'

বিয়ের দিন পল্লীরমণীরা নিমাইয়ের সর্বাঙ্গ যথোচিত মার্জনা করে হলুদ আর আমলকি মাখিয়ে দিলেন। গৌরাঙ্গ-অঙ্গ মার্জিত করতে গিয়ে নিজেরাই পবিত্রতা-মণ্ডিত হয়ে গেলেন। গদাইয়ের বিয়ের দিন তাঁকে বরের বেশে সাজাতে গিয়ে কামারপুকুর-পল্লীরমণীদের ক্ষেত্রেও ঠিক

এই একই ব্যাপার ঘটেছিল। নিমাইয়ের পরিধানে পীতবস্ত্র। গায়ে পাটের চাদর। গলায় ফুলের মালা এবং ললাটে চন্দন দিয়ে অর্ধচন্দ্র-অঙ্কিত ফোঁটা। গদাইয়ের মতোই নিমাইকেও অনুপম দেখাচ্ছে। ব্রাহ্মণ বেদধ্বনি করছেন। এই সময়ে বুদ্ধিমন্ত খাঁ দোলা সাজিয়ে নিয়ে হাজির। কমলার সঙ্গে নারায়ণের বিয়েতে তাঁর সমস্ত ধনভাণ্ডার উজাড় করে খুলে দিয়েছেন। ব্যবস্থা করেছেন বিভিন্ন ধরনের বাজনার। হাজার হাজার দীপ জ্বালানো হয়েছে। চারিদিকে আলোর রোশনাই।

মাকে প্রদক্ষিণ এবং প্রণাম করে নিমাই দোলায় এসে উঠলেন। বললেন, 'গঙ্গাপ্রণাম করে সমস্ত নবদ্বীপ ঘুরে তারপরে কন্যাঘরে উপস্থিত হব।' সমগ্র নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতা নানা বর্ণের মাঙ্গলিক পতাকা হাতে নিয়ে নিমাইয়ের সাথে সাথে সারিবদ্ধভাবে চলেছেন। লোকেরা বলতে লাগলেন, বহু বড় বড় বিয়ে দেখেছি এমনটি আর কখনও দেখিনি। এ যে নিমাই-পণ্ডিতের বিয়ে! হাজারবার পেলেও যাঁকে পাওয়ার সাধ আর মেটে না। এ যে সেই বৃন্দাবনের 'অপ্রাকৃত মদনমোহন'। আর তাই নবদ্বীপবাসীদের হৃদয়ে আনন্দের বন্যা যেন শত সহস্র-ধারায় বয়ে চলেছে। গদাইয়ের উপস্থিতিতে বাসরঘর যেমন মুহূর্তের মধ্যে দেবমন্দির হয়ে উঠেছিল—এখানেও ঠিক তেমনই নিমাইয়ের উপস্থিতিতে বিয়ের প্রাঙ্গণ পবিত্রতামণ্ডিত মন্দির-অঙ্গনের রূপ ধারণ করল।

।। অনুরাগে কালীদর্শন ।।

মা-চন্দ্রামণি গদাইকে আর কামারপুকুরে ধরে রাখতে পারলেন না। বিয়ের অনুষ্ঠান সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণেশ্বরে ফেরবার জন্য গদাই অত্যন্ত উতলা হয়ে উঠেছিল। তারপর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে মা-ভবতারিণীর নিত্য সেবা করতে করতে আবার সেই পূর্বের মতোই ভাবে মাতোয়ারা। কোথায় তার মা-দাদা, আর কোথায়ই বা তার স্ত্রী-সংসার! আগের মতোই মা-ভবতারিণীর জন্য সেই আকুল-করা কান্না—হৃদয়-নিংড়ানো ব্যাকুলতায় বুক রক্তের মতো টকটকে লাল হয়ে উঠল। আবার শুরু হল সেই তীব্র গাত্রদাহ। যথারীতি চোখ থেকে ঘুমও গেল চলে। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন 'ওগো মা, তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই। একটিবার কাছে এসে দেখা দাও মা, দেখা দাও। তোমাকে না দেখে, না পেয়ে আর যে পারছি না মা।' মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলেন। এই সময় তাঁর নির্জনতাই বেশি ভাল লাগে। আর তাই—

'একাকী থাকেন প্রভু চিন্তায় মগন।
কখন থাকেন বসি যথা নিরঞ্জন।।' (পৃঃ ৬০)

পঞ্চবটীর কাছেই হাঁসপুকুর। সেই পুকুরটি নতুন করে সংস্কার করতে গিয়ে ঠাকুরের ধ্যান করার প্রিয় আমলকি গাছটি মরে গিয়েছে। পুকুরটি ঝালানোর সময় বাড়তি মাটি সব ফেলা হয়েছে পঞ্চবটীর গর্ভে। ফলে আমলকি গাছটি, যে গাছটির নিচে বসে ঠাকুর ধ্যান করতেন, সেটি শুকিয়ে গেল।

একদিন ঠাকুর হৃদয়কে বললেন, 'ওরে হৃদু, আমার বসবার একটা বন্দোবস্ত কর।'

গদাই নিজেই একটি অশ্বত্থের চারা নিয়ে এসে লাগালেন। হৃদয় নিয়ে এল বট, অশোক, বেল আর আমলকি। তুলসী আর অপরাজিতার চারা লাগিয়ে জায়গাটা ঘিরে দেওয়া হল। গঙ্গার তীরে, পঞ্চবটীর তলায়, যেখানে লোকেরা খুব একটা চলাফেরা করে না, সেখানে নির্জনে ধ্যান করবেন বলে ঠাকুর তুলসীকানন রোপণ করেছিলেন। বেল গাছের নীচে—গঙ্গার তীরে এখন সেই গাছগুলো তাঁর যত্নে আর

নিয়মিত জলসিঞ্চনে বেশ বড় হয়ে উঠে অল্পদিনেই ঘন ঝোপজঙ্গল হয়ে গেল। এখন তার ভিতরে ধ্যানে বসলে আর ঠাকুরকে বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যায় না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ঠাকুর একদিন দেখলেন, গরু–ছাগলে তাঁর লাগানো চারাগাছগুলি খেয়ে নিয়েছে। ঠাকুরের ইচ্ছে হল বেড়া দিয়ে স্থানটিকে আরও নির্জন করে রাখবার। হৃদয়েরও মায়ের মন্দিরে নানা কাজ। ঠাকুরকে জিনিসপত্র জোগাড় করে দেওয়ারও কেউ নেই। তাই ঠাকুর চিন্তিত হলেন।

কিন্তু কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল কেউ কিছু বুঝতেই পারল না। একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীর সামনে গঙ্গার দিকে মুখ করে বসেছিলেন। দেখলেন প্রবল জোয়ারের স্রোতে গঙ্গার জলে ঠিক পঞ্চবটীর সামনে বেড়া বাঁধবার আবশ্যকীয় যত কিছু জিনিসপত্র—যেমন কতকগুলি গরানের খুঁটি, বাখারি, নারকেল দড়ি, এমনকী একটি কাটারি পর্যন্ত ভেসে এল। কালীবাড়ির মালী ভর্তাভারির সাহায্যে ঐ বোঝা গঙ্গার জল থেকে তুলিয়ে বেড়া বাঁধিয়ে নিলেন। বেড়া বাঁধবার পর দেখা গেল দড়ি বা কাঠ একটুও আর অবশিষ্ট নেই। ঠিক যতগুলি দরকার ঠিক ততগুলিই ঐ বোঝার মধ্যে ছিল।

‘কার্য–সমাপনে কিবা বিস্ময় নেহারি।
না বাঁচিল এক তিল কাষ্ঠ কিবা দড়ি।।’ (পৃঃ ৬১)

এই বেড়া দেওয়া অপরাজিতা ও তুলসীকাননের মধ্যে গদাই ধ্যানের আসন স্থাপন করলেন। রাত্রে এখানে বসে তিনি ধ্যান করতেন। এই সময় কেউই তাঁকে আর খুঁজে পেত না।

পরবর্তী কালে ঠাকুর বলতেন, যে ঠিক ঠিক রাজার বেটা, সে মাসোহারা পায়। তবে যদি মুখে রাম নাম বলে, আর হাত দিয়ে কাপড় সামলায় তাহলে হবে না। এইটি বলেই বুড়ি গোয়ালিনী আর পণ্ডিতের গল্পটি বলতেন।

একদিন ভোরবেলা মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃদ্ধা গয়লানিকে রোজ নদী পার হয়ে ওপারে দুধ দিতে যেতে হয়। সেদিন সেই দুর্যোগে সে পারাপারের খেয়া পেল না। যে পণ্ডিতের বাড়িতে তাকে দুধ দিতে যেতে হয় সেই পণ্ডিতের মুখেই একদিন ঐ গয়লানি রাম–নামের মাহাত্ম্যের কথা শুনেছিল। সেইটি মনে পড়ে গেল। ভাবলে রাম–নামে ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়। আর আমি এই ছোট্ট নদীটা পার হতে পারব না! ‘রাম–নাম’ করতে করতে বৃদ্ধা নদী পার হয়ে গেল। খুব সকালে অত্যন্ত দুর্যোগের মধ্যেও পণ্ডিত বৃদ্ধাকে দেখে অবাক। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : এই দুর্যোগের মধ্যে কি করে সে দুধ দিতে এল? বৃদ্ধা গয়লানি বলল : কেন বাবাঠাকুর, তুমিই তো সেদিন তোমার শিষ্যদের বলেছিলে রাম–নামে ভবসাগর পার হওয়া যায়। আর আমি এই ছোট্ট নদীটা পার হতে পারব না? রাম–নাম করেই পার হয়ে এসেছি। নদীর অপর পারে পণ্ডিত মশায়ের কোনও একটা কাজ ছিল তাই তিনি বললেন : ‘চল, আমিও তাহলে ঐভাবেই আমার কাজটা সেরে আসি।’

বৃদ্ধা এবং পণ্ডিত দুজনেই আসলেন নদীর ধারে। বৃদ্ধা ‘রাম–নাম’ করে নদী পেরিয়ে যেতে লাগল। পণ্ডিতও ‘রাম–নাম’ করে এগিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু কিছুটা জলে নেমেই তিনি এক হাত দিয়ে কাপড় গুটোতে লাগলেন। বৃদ্ধা বললে, ‘ঠাকুর রাম–নামও করবে আবার কাপড়ও গুটোবে—তা হবে না।’ বুড়ি অনায়াসে ‘রাম–নাম’ করে নদী পার হয়ে গেল। আর পণ্ডিত নদীতে ডুবে গেলেন। আসল কথা হচ্ছে সরল বিশ্বাস চাই—চাই ভগবানের ওপর অকপট বিশ্বাস ও সম্পূর্ণ নির্ভরতা। ঠাকুর বলতেন : বিশ্বাস করো, নির্ভর করো—তোমায় কিছু করতে হবে না, মা কালী সব করবেন।

ধ্যানের সময় ঠাকুরের কীরকম দর্শন বা অনুভূতি হত, সে–সম্বন্ধে কবি অক্ষয় কুমার সেন মশাই বলছেন : প্রথম দর্শন হল কুয়াশার

মতো একটি দৃশ্য। দ্বিতীয় দর্শনটি অপূর্ব। তিনি দেখলেন, এই সমগ্র সৃষ্টিতে যেন রাশি রাশি জোনাকি জ্বলছে। কিবা তার শোভা! তৃতীয় দর্শনে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন চন্দ্র-সূর্যের অপূর্ব প্রভায় চারিদিক উদ্ভাসিত। শেষে তিনি জ্যোতি-সমুদ্রের এক মনোহর দৃশ্য দর্শন করেন। সেই মহা জ্যোতির সমুদ্রে যখন তিনি লীন হতেন, তখন তাঁর দেহ বাহ্যসংজ্ঞাহীন হয়ে জড়ের মতো পড়ে থাকত। তিনি তখন আনন্দসাগরে লীন হয়ে তারই সত্তা লাভ করতেন। দেখে মনে হত যেন সিন্ধুতে সিন্ধুরই সমাগম হয়েছে।

‘দেহ-ভাব-জ্ঞান-লোপ দেহে নাই মন।
সিন্ধুর সিন্ধুর সঙ্গে যেন সমাগম।।’ (পৃঃ ৬১)

এরপর দাস্যভাবে ভক্তি-সাধনার সময় ঠাকুরের জীবনে এক অভূতপূর্ব দর্শন ও অনুভব এসে উপস্থিত হয়েছিল। এই দর্শন, এই অনুভব তাঁর আগের সমস্ত দর্শন বা প্রত্যক্ষাদির থেকে এতই নতুন ধরনের যে, এটি তাঁর মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়ে স্মৃতিতে সব সময়ের জন্য জাগরূক ছিল।

ঠাকুর বলতেন, ‘একদিন পঞ্চবটীতে বসে আছি—ধ্যানচিন্তা কিছু যে করছিলাম তা নয়। এমনই বসে আছি। গঙ্গাতট, বৃক্ষলতা, কখনও বা পরিষ্কার নীলাকাশে প্রকৃতির খেলা একমনে দেখছিলাম। এই সময় হঠাৎই দেখি নিরুপমা জ্যোতিময়ী এক স্ত্রীমূর্তি অদূরে আবির্ভূতা হয়ে স্থানটিকে আলোকিত করে তুললেন। ঐ মূর্তিটিকেই তখন যে কেবল দেখতে পাচ্ছিলুম তা নয়। পঞ্চবটীর গাছপালা, গঙ্গা ইত্যাদি অন্য সবকিছুই দেখছিলাম। দেখলাম, মূর্তিটি মানবীর। কারণ উনি অন্যান্য দেবীর মতো ত্রিনয়না নন। কিন্তু প্রেম-দুঃখ-করুণা সহিষ্ণুতাপূর্ণ সেই মুখের মতো অপূর্ব ওজস্বী গম্ভীরভাব-বিশিষ্ট দেবীমূর্তি বড় একটা দেখা যায় না।

‘এমন সময় হয় দৃষ্টির গোচর।
অতি অনির্বচনীয় সর্বাঙ্গ সুন্দর।।
জ্যোতিময়ী মানবী মূরতি নিরুপমা।
জীবন্ত মন্থর গতি কনক-প্রতিমা।।’ (পৃঃ ৬১)

‘প্রসন্ন দৃষ্টিতে ঐ ‘‘দেবী-মানবী’’ মন্থর গতিতে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। অবাক হয়ে ভাবছি, কে ইনি? ইনি কে হতে পারেন? আর কেনই বা এদিকে আসছেন? ঠিক এই সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটি হনুমান উ-উপ্ শব্দ করে এসে তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল। আমার মন তখন বলে উঠল, সীতা। জনম-দুঃখিনী সীতা। জনকরাজনন্দিনী—রামময়জীবিতা সীতা! তখন ‘মা’ ‘মা’ বলে অধীর হয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করব বলে নীচু হচ্ছি, ঠিক এই সময়ে চকিতের মধ্যে (নিজ শরীর দেখিয়ে) এর মধ্যে ঢুকে গেলেন! আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেলাম।

‘মা বলিয়া কাছে প্রভু যাইতে যাইতে।
অমনি মিশিল আসি প্রভুর অঙ্গেতে।।’ (পৃঃ ৬১)

ধ্যানচিন্তাদি কিছু না করে এর আগে এরকম দর্শন আর হয়নি। জনম-দুঃখিনী সীতাকে সবচেয়ে আগে দেখেছিলাম বলেই বোধ হয় তাঁর মতো আজন্ম দুঃখভোগ করছি।’

কামারপুকুর ঠাকুরের বাল্যলীলা-স্থল। তাঁর বড় সাধের নিজ জন্মভূমি। কামারপুকুর অঞ্চলে অনেক ছোট-বড় পুকুর দেখা যায়। এই পুকুরগুলির চারপাশ তাল-তমাল এবং বিভিন্ন বুনো সুগন্ধি ফুলগাছে ভরা। ঝিরঝিরে বাতাসে ছোট্ট ছোট্ট তরঙ্গ—চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর প্রতিবিম্ব বুকে নিয়ে পুকুরের জল এক অভূতপূর্ব স্বপ্নের রাজ্য গড়ে তোলে। এই সময় কখনও কখনও রাত-জাগা পাখির চমৎকার মিষ্টি

ডাক মনকে উদাসবিধুর করে তোলে। এই পুকুরগুলির জল কাকচক্ষুর মতো নির্মল টলটলে। সাধারণত এই পুকুরগুলির ঘাটের পাশে দেখা যায় ঝুরিওয়ালা বড় বড় বটগাছ। কামারপুকুরের পশ্চিম দিকে গোচারণের মাঠের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে ভূতির খাল। এই ভূতির খালের পাশেই নানারকম ঝোঁপঝাড়ে ঘেরা ভূতির শ্মশান। এই শ্মশানের মাঝখানে একটি সুন্দর ঝুরিযুক্ত বটবৃক্ষ। এই বটবৃক্ষের চারপাশে আবার তুলসীকানন। ভূতির খালের শ্মশানের কাছে দাঁড়িয়ে যদি উত্তর-দক্ষিণ অথবা পশ্চিম দিকে তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে বহু দূর পর্যন্ত সবুজের সমারোহ। দূরে দূরে গাছে-ঘেরা গ্রামগুলিকে দেখে মনে হয় যেন সবুজ-সাগরের মধ্যে ভাসমান ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ। দূর থেকে গাছগাছালি-ঘেরা এই ঘন-কৃষ্ণ গ্রামগুলিকে মনে হয় আকাশের অসীম নিলীমায় মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। এই সব দেখতে দেখতে মন যেন কোথায় কোন সুদূরে হারিয়ে বিরাটের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। আর তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

‘মাঠের পরে মাঠ,   মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি   আকাশে মেশে।
এ ধারে পুরাতন   শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁষে।’

এই শ্মশানের একটু পশ্চিমে মানিক রাজার বিখ্যাত আমবাগান—যেখানে ব্রজলীলারই পুনরাবৃত্তি গদাইয়ের বাল্যলীলায় বহুবার সংঘটিত হয়েছিল। এই আম্রকাননটি দেখলেই মনে হত যেন তপোবন—ঋষির আশ্রম। ঠাকুরের জন্মভূমির দক্ষিণ-পূর্বদিকে রয়েছে বহু পরিচিত লাহাবাবুদের সুপ্রশস্ত বিখ্যাত বাড়ি। লাহাবাবুদের বাড়ির কাছেই ভিক্ষামাতা ধনী কামারনীর বসতবাড়ি। এখানকারই পাইনদের বাড়ির ছেলেমেয়ে ও ব্রাহ্মণ, তামলী, বেনে, তাঁতী প্রভৃতি নানা জাতির ভক্তিমান লোকেরা ছিলেন ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয় বাল্য-লীলাসহচর। নাপিত, ছুতোর অথবা ডোম কেউই ঠাকুরের কাছে কম ছিলেন না। সকলেই তাঁর কাছে সমান প্রিয়—বড় আপনজন। আর ঠাকুরের নিজের বাড়িতে আছেন তাঁদের সবচেয়ে প্রিয়তম ‘রঘুবীর’। আছেন নিজের গর্ভধারিণী অত্যন্ত সরলা ধার্মিক মা আর দাদা। ঠাকুরের খুব প্রিয় শিহড় গ্রামে হৃদয়ের বাড়িটি—সেখানে তিনি মাঝে মাঝেই যেতেন। আর ছিল তাঁর সাধের শ্বশুরবাড়ি। তাঁর খুব শখ ছিল শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার। সেইজন্য তিনি ধোপ দেওয়া ধুতি সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতেন। স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, ঠাকুরের আবার এরকম ভাব কেন? শ্বশুরবাড়ি যাবেন বলে কাপড় সুন্দর করে কুঁচিয়ে রাখছেন!

যাঁরা আধ্যাত্মিক চিন্তা করেন—ঈশ্বর চিন্তা করেন, তাঁদের মন খুব সূক্ষ্ম হয়ে যায়। তাঁরা যখন যে কাজটি ধরেন—সেই কাজটির সঙ্গে একেবারে একাত্ম হয়ে যান—মেতে ওঠেন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে প্রাচীন সন্ন্যাসীদের অনেককে এরকম দেখা যায়। ফলে সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় এটি তাঁদের আসক্তি। মায়ের জীবনেও দেখি—মা যখন রাধু রাধু করছেন অথবা বাড়ির কোনও কাজ নিয়ে মেতে রয়েছেন, তখন সরাসরি ভক্তদের কেউ কেউ তাঁর এই ভাবকে আসক্তি বলে অনুযোগ করেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের কথাতে পাই—‘হাজরা ঠাকুরকে বলেছিল ‘‘নরেন-টরেন ওদের জন্য অত ভাবেন কেন? ...আপনি ভগবানের চিন্তায় মন স্থির করুন। আপনার আবার মায়া কেন?’’ ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে তার কথামতো সব মায়া কাটিয়ে ভগবানে মন লীন করলেন। দাড়ির চুল, মাথার চুল এমনই সোজা হয়ে কাঁটা দিলে কদম ফুলের মতো। ঠাকুর তখন শৌচে গিয়েছিলেন। রামলাল আর শৌচ করাতে পারলে না। কাকে শৌচ করাবে? সব শরীর জড়, কাঠ—শক্ত! তখন রামলাল বলতে লাগল, ‘‘যেমনটি ছিলে তেমনটি হও, যেমনটি ছিলে তেমনটি হও।’’ বারবার বলতে বলতে শেষে দেহে মন এল। দয়ায় মনকে নামিয়ে রাখতেন।’

মা-ভবতারিণীর সেবা-পূজার শেষ দিকে ঠাকুরের হৃদয়াকাশে ভগবদ্‌প্রেমের প্রবল ঝড় উঠেছিল। আর সেই ঝড় তাঁর অনেক সাধের কামারপুকুর, জয়রামবাটী অথবা শিহড় প্রভৃতি স্থানের প্রতি ভালবাসার আকর্ষণকে কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। এই সময় ঠাকুরের কাছে মা-ভবতারিণী ছাড়া জগতে আর কেউ ছিল না—কিছুই ছিল না।

দক্ষিণেশ্বরের প্রসঙ্গে দেখা গেছে, শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। দ্বৈতবাদী-অদ্বৈতবাদী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব অথবা তান্ত্রিক সবার কাছেই দক্ষিণেশ্বর মহাপীঠ। কারণ এখানে ঠাকুর সমস্ত ভাবের সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তা ছাড়াও ঠাকুর যখন যে-যে ভাবের সাধনা করেছেন সেই সময় সেই-সেই মতাবলম্বী উচ্চকোটীর সাধকগণ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়ে স্থানটিকে আধ্যাত্মিক ভাব-তরঙ্গে ভরিয়ে তুলেছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একনাগাড়ে বারো বছর কঠোর তপস্যা এবং বিভিন্ন ভাবের সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আর তাই পঞ্চবটী মহা সিদ্ধপীঠ। এখানে ঠাকুরের কত ভাব, মহাভাব হয়েছিল। হয়েছিল কত দিব্যদর্শন, দিব্য-অনুভূতি—যেগুলির অনুপম স্মৃতি ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের কাছে এক মহামূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ। আর কোনও অবতার পুরুষের জীবনে এত কঠোর ও বিভিন্ন ভাবের সাধনা, এত উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি দেখা যায় না। ঠাকুর বলতেন, ‘এখানকার সব অনুভূতি বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে গিয়েছে।’ আর সেইজন্যই স্বামীজী ঠাকুরকে ‘অবতারবরিষ্ঠায়’ বলেছেন।

সাধনার প্রথম দিকে ঠাকুর কোনও কোনও দিন মা-ভবতারিণীর পায়ে জবাফুল ও বেলপাতা নিবেদন করে কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে মাকে ডাকেন। আবার কোনও দিন বা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উচ্চৈঃস্বরে মা-মা ডাকে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তোলেন। আর চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। ভগবানকে লাভ করার জন্য

গদাধরের অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতাই তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ, তাঁর সব থেকে বড় সহায়। এই ব্যাকুলতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে তাঁর শরীর এবং মনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছিল। মা-ভবতারিণীর উপর অসীম ভালবাসাই গদাধরকে বৈধীভক্তির সমস্ত নিয়মকানুনেরও ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে রাগানুগাভক্তির স্তরে উন্নীত করায় গদাধর মা-ভবতারিণীর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, ঠাকুর তো মা-ভবতারিণীকে লাভ করে কৃতার্থ হয়েছিলেন, তবে তার পরে আবার তাঁকে নানা প্রকার সাধন করতে হল কেন? এই প্রশ্নটির উত্তর ঠাকুর নিজেই খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন। বলছেন : ‘ফুল-ফলের গাছে আগে ফুল ও পরে ফল হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু গাছে আগেই ফল, পরে ফুল হয়।’ সাধনার সময় গদাধরের ক্ষেত্রেও তাঁর মনের বিকাশও ঠিক ঐরকমভাবে হয়েছিল।

পরমহংসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মায়ামুক্ত সমাধিনিষ্ঠ শুকদেবের জীবনে জন্মাবধি নানারকমের দিব্যদর্শন ও অনুভব এসে উপস্থিত হয়েছিল। ঠাকুরের মতো তিনিও পূর্ণজ্ঞান হয়েছে বলে যে ঐরকম দর্শন করছেন, সেটি বুঝতে পারেননি। আর তাই তিনি একদিন পিতা ব্যাসদেবকে বললেন : ‘শাস্ত্রে যে-সমস্ত অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আছে, সেটি আমি আজন্ম অনুভব করছি। কিন্তু তবুও আধ্যাত্মিক রাজ্যের চরম সত্য উপলব্ধি করেছি কি না, সে-বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হতে পারছি না। ঐ-বিষয়ে আপনি যা জানেন, সেগুলি আমাকে বলুন।’ ব্যাসদেব ভাবলেন, ‘শুককে আমি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও চরম সত্য সবসময় উপদেশ দিয়েছি। তবুও তার মন থেকে সন্দেহ দূর হচ্ছে না। শুক ভাবছে, পূর্ণজ্ঞান লাভ করলে সে সংসার ত্যাগ করবে—এই ভেবে স্নেহের বশবর্তী হয়ে আমি তাকে সবকিছু বলিনি। কাজেই এখন তার অন্য কোনও মনীষীর কাছে গিয়ে এই সকল বিষয়ে শোনা দরকার।’

ব্যাসদেব তখন বললেন : 'আমি তোমার সন্দেহ নিরসনে অসমর্থ। তুমি জান, বিদেহরাজ জনক যথার্থ জ্ঞানী। তাঁর কাছে গিয়ে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করে এসো।' শুক পিতার ঐকথা শুনে অবিলম্বে রাজর্ষি জনকের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর কাছে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যেসব অনুভূতি হয় সেগুলি শুনলেন। গুরুর উপদেশ, শাস্ত্রবাক্য এবং নিজের জীবনে অনুভূত ঐক্য মিলিয়ে নিয়ে তিনি শান্তিলাভ করেছিলেন।

বর্তমান যুগে শ্রীশ্রীজগদম্বা কেবলমাত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ঠাকুরের মতো একজন প্রায় নিরক্ষর মানুষের জীবন দিয়ে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ সমস্ত রকমের অবস্থা এবং বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরান ইত্যাদি সকল ধর্মশাস্ত্রের সত্যতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আর তাই নিজে শান্তিলাভ করবার পরেও ঠাকুরকে তাঁর সাধনা করে যেতে হয়েছিল।

ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল বন্যা যখন অতর্কিতভাবে মানুষের জীবনে এসে উপস্থিত হয়, তখন তাকে দমিয়ে রাখবার সহস্র চেষ্টা করলেও কিছুতেই সফল হওয়া যায় না। সাধারণ মানুষের জড়-দেহ এই প্রবল বেগ সামলাতে না পেরে ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে যায়। মনে রাখা দরকার পূর্ণজ্ঞান বা পূর্ণা-ভক্তির উদ্দাম বেগ কেবলমাত্র অবতার-পুরুষদের শরীর-মন ধারণ করতে পারে।

দেখা যায় ভাব-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় ঠাকুরের শরীরে নানারকম অদ্ভুত বিকার এসে উপস্থিত হয়েছিল। কোনও কোনও দিন ভূলুণ্ঠিত হয়ে মা-ভবতারিণীর কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেন : মাগো আমি ধন-জন, ভোগ-লোকমান্য-বৈভব কিছুই চাই না। সাধক-জীবনের সবচেয়ে প্রতিবন্ধক অষ্টসিদ্ধি, তা-ও চাই না মা—তা-ও চাই না। তুই নিয়ে নে মা আমার অহংকার-অজ্ঞান। তুই নে আমার ভাল-মন্দ, মান-অপমান। আমার যা-কিছু আছে তুই সব নিয়ে নে মা। আমায় শুধু দে সবকিছুর সার তোর শ্রীপাদপদ্মে অচলা শুদ্ধা ভক্তি।

কোনোই সহায়-সম্বল নেই গদাধরের—আছে শুধু আত্যন্তিক বিশ্বাস আর তীব্র ব্যাকুলতা। বলছেন : মা কবে যাবে আমার অহংবুদ্ধি! কবে হব আমি দীন অপেক্ষা দীন, হীন অপেক্ষা হীন? গদাধর যে কীভাবে দীনতার সাধনা করেছিলেন—সেটি ভাবলেও অবাক হতে হয়।

মা-ভবতারিণীর মন্দিরে খুব বড় অতিথিশালা। যেমন প্রশস্ত অতিথিদের থাকবার জায়গা, ঠিক তেমনই বিশাল তার ভাণ্ডার। রানি যেমন ভক্তিমতী, তেমনই তাঁর উদার ব্যবস্থা। প্রতিদিন সেখানে হাজার হাজার অতিথি ও সন্ন্যাসী আসেন। দুপুরবেলায় শ্রীমন্দিরে তাঁরা বসে প্রসাদ পান। প্রসাদ পাওয়ার পর উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলে রেখেই তাঁরা উঠে যান। গদাধর নিজের হাতে সেই সব উচ্ছিষ্ট এক জায়গায় জড়ো করে নিজের মাথায় তুলে নিয়ে গঙ্গার তীরে ফেলতেন। তারপর ঝাঁটা হাতে নিয়ে জায়গাটি সুন্দর করে পরিষ্কার করে দিতেন।

'যতেক উচ্ছিষ্ট পাতা তারা যায় ফেলে।
শ্রীহস্তে একত্র করি শিরোপরি তুলে।।
গঙ্গাকূলে ফেলিতেন শ্রীপ্রভু আপুনি।
পশ্চাৎ মার্জন ঠাঁই ধরিয়া মাজনী।।' (পৃঃ ৬২)

দক্ষিণেশ্বরে দেবপুরীর মধ্যে বিভিন্ন মন্দির-সহ জায়গাটি বেশ বড়। সুবিশাল মন্দির-প্রাঙ্গণ গদাধর শেষ রাত্রিতে খুব গোপনে গোপনে পরিষ্কার করে রাখতেন। তাই কেউ জানতেই পারত না এই বিস্তীর্ণ মন্দির-চত্বরটি কে পরিষ্কার করে রাখে! ভোরবেলা ঝকঝকে মন্দির-অঙ্গনটি দেখে লোকেরা একেবারে অবাক হয়ে যায়। নানা রকম কথা রটনা হতে থাকে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকে এটি নিশ্চয়ই কোনও দেবতা বা দৈত্যের কাজ!

'দেখে প্রাতে লোকে লাগে অপার বিস্ময়।
দেব কি দৈত্যের কর্ম নানা কথা কয়।।' (পৃঃ ৬২)

জীবের কল্যাণের জন্য, জীবের উদ্ধারের জন্য ঠাকুর যে কত কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলি আমরা চিন্তাও করতে পারি না। অথচ কোনও কোনও শাস্ত্রকার বলেছেন, ভগবানের অর্থাৎ শ্রীহরির হৃদয় বজ্রের চেয়েও কঠিন। কবি বলছেন, বরফের জলে কত শৈত্য—পদ্মের পাপড়িতে কত কোমলতা, সেটি তিনি জানেন না। কিন্তু :

'সুলভত্বে এতই সহজ সেই হরি।
নাহি ধারে কোন ধার বরষার বারি।।' (পৃঃ ৬২)

ঠাকুরের অঙ্গকান্তি ছিল অনিন্দ্যসুন্দর। ভগবানের অঙ্গকান্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলছেন : 'কোটি সূর্য প্রতীকাশ' এবং চন্দ্রকোটিসুশীতল। অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময় জ্যোতিতে কোটি সূর্যের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পেলেও, তাতে কোনও উত্তাপ নেই। সেই জ্যোতি কোটি চন্দ্রের স্নিগ্ধ প্রভার মতোই নরম—সুশীতল। ঠাকুরেরও অঙ্গকান্তি ছিল ঠিক সেই রকম।

'উজ্জ্বলত্বে কান্তি কিবা আছে তুলনায়।
কোটি কোটি দিনমণি বানে ভেসে যায়।।' (পৃঃ ৬৩)

তাঁর স্নেহ-মমতার কাছে গর্ভধারিণী মায়ের স্নেহও তুচ্ছ মনে হত। তাঁর এই অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ ভালবাসার আকর্ষণেই তো নরেন, রাখাল, তারক, শরৎ প্রমুখ অল্প বয়সের ছেলেরা ঠাকুরের কাছে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে ধন্য হয়েছিলেন।

সপ্তদ্বীপ দিয়ে ঘেরা এই পৃথিবী। আর আছে অসীম সমুদ্র। এই পৃথিবীর স্থলভাগে এবং সমুদ্রে যে পরিমাণ জল আছে, ঠাকুরের ভালবাসা এবং করুণাবারি এই সবকিছুর থেকেও অনেক অনেক বেশি।

কলিকালে মানুষ কামিনী ও কাঞ্চনে মত্ত। আত্মসুখের কাঙাল। বদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্যই ভগবান নরদেহ ধারণ করে নিজে দীনহীনভাবে থেকে, অশেষ কষ্ট সহ্য করে জীবকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদছেন গদাধর। কৃপা করে দেখা দে মা, দেখা দে। রামপ্রসাদকে তো দেখা দিয়েছিস। সেই কি কেবল তোর একমাত্র ছেলে? আমি কি তোর কেউ নই মা? তবে আমায় কেন দেখা দিবি না? মা-কালীকে দেখতে না পেয়ে তিনি এক অব্যক্ত মর্মভেদী বেদনায় গঙ্গার তীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মুখ ঘষতে থাকেন। চোখের জলে ভিজে যায় জায়গাটি। পথে যেতে যেতে কৌতূহলী লোকেরা দাঁড়িয়ে যায়। ভাবে, ছেলেটির মা মারা গেছে বোধহয়। তাই মায়ের জন্য এত কাঁদছে। মা-ভবতারিণীকে দেখতে না পাওয়ার যন্ত্রণায় নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারছেন না গদাধর। চার-পাশে এত ভিড়। তবু গদাধরের কোনও হুঁশ নেই, ভ্রূক্ষেপই নেই। নেই কোনও শরীরবোধও।

গদাধরের অন্তরে মা-ভবতারিণীকে সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা দিন দিন বেড়ে যায়। তাঁকে লাভ করার জন্য যেন তিনি পাগল হয়ে ওঠেন। অত্যন্ত আকুল হয়ে বলতে থাকেন, 'মা-গো তুই কোথায় মা কোথায়! আমাকে কৃপা কর। আমাকে দেখা দে মা, দেখা দে।' সীমাহীন সেই বিরহ-যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে শেষ পর্যন্ত তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ভাগনে হৃদয় এবং দক্ষিণেশ্বর মাতৃমন্দিরের অন্যান্য ব্রাহ্মণরা তাঁকে অসুস্থ মনে করে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে আসত। জ্ঞান ফেরার পর তিনি যখন আলুথালু পায়ে টলমল করে হাঁটতেন তখন তাঁকে দেখলে মনে হত ঠিক যেন কাঁচা ঘুম থেকে তুলে আনা এক শিশু।

গীতামুখে শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন :

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।' (৯/২২)

যে-সমস্ত ভক্ত আমার সঙ্গে অনন্যচিত্তে নিত্যযুক্ত হয়ে থাকে এবং শরীর ধারণের জন্য খাওয়া-দাওয়ার কথাও চিন্তা না করে সম্পূর্ণভাবে মন আমাতে অর্পণ করে—তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই অযাচিত

হয়েও আমি প্রদান করে থাকি। —গীতার এই প্রতিজ্ঞা ঠাকুরের জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল।

কোনও কোনও দিন পুজো শেষ করে গদাধর শ্যামাবিষয়ক গান গাইতেন। গান গাইতে গাইতে চোখের জলে বুক ভেসে যেত। তাঁর মা-ভবতারিণীর এই পুজো কোনও শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী তো নয়ই—এমনকী সাধারণভাবে আমরা যেমন আশা করি সেরকমও নয়। অদৃষ্টপূর্ব এই পুজোর সময় তাঁর মধ্যে নানা ভাব দেখা যেত, যেগুলি কেউ কখনও দেখেননি। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত পুজোর যে নিয়ম তার সঙ্গে না মিললেই লোকেরা পূজককে পাগল বলে থাকে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। লোকে গদাধরকে 'পাগল' বলে রটাতে লাগল।

দেখা গেল ভক্তিমতী রানি রাসমণি এবং মথুরবাবু গদাধরের পুজো দেখে কিন্তু খুবই খুশি। তবে তাঁর পাগলামি দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় আবার চিন্তিতও। বাৎসল্যময়ী রানি এবং মথুরবাবু দুজনেই গদাধরকে যেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন তেমনই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। আর ঠাকুরও, রানি রাসমণি এবং মথুরবাবুকে শুধু যে ভালবাসতেন তা-ই নয়, তাঁদের উপর তাঁর অশেষ করুণা সবসময় বর্ষিত হত। তিনি যে সত্য সত্যই পাগল নন, সেটি বোঝাবার জন্য কখনও কখনও তাঁদের কাছে নিজের স্বরূপটিও তিনি প্রকাশ করতেন।

রানি পূর্ব থেকেই গদাধরের কণ্ঠে মধুর সুরে গান শুনে তাঁর ওপর খুবই স্নেহপরায়ণা ছিলেন। ঠাকুরের মতো দেবপুরুষ যে শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপালাভ করবেন—এটি মহা ভক্তিমতী রানি ও শ্রদ্ধাবান মথুরবাবু খুব ভালভাবেই বুঝেছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যার দ্বারা তাঁদের এই বিশ্বাসে চিড় ধরবার প্রবল আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। একদিন রানি রাসমণি এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। গঙ্গায় স্নান করে মা-ভবতারিণীর মন্দিরে এসে শান্ত হয়ে বসেছেন। গদাধরের মন-প্রাণ-আকুল করা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক বা শ্যামা-বিষয়ক গান শুনতে খুব ভাল লাগে রানির। তাই তিনি মায়ের কাছে উপবিষ্ট গদাধরকে গান গাইতে বললেন।

গদাধর ভাবে তন্ময় হয়ে দেবদুর্লভ-কণ্ঠে মা-কালীর গান গাইতে আরম্ভ করলেন। রানিও মায়ের ধ্যানচিন্তায় ডুবে গেলেন। হঠাৎ ভাবাবিষ্ট ঠাকুর গান বন্ধ করে রানির কোমলাঙ্গে আঘাত করে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন : 'এখানেও ঐ চিন্তা!'

পুঁথিকার কবি অক্ষয়কুমার সেন বলছেন : গদাধর মা-ভবতারিণীর দিকে আঙুল দেখিয়ে রানিকে বললেন, 'ঐ দেখো গো, ঐ দেখো। প্রাণভরে সাক্ষাৎ আনন্দময়ী জগজ্জননীকে দর্শন করো।'

'অঙ্গুলি নির্দেশ করি দেখাইলা তায়।
ঐ দেখ ঐ দেখ সাক্ষাৎ শ্যামায়।।
সম্মুখে অতুলা মূর্তি প্রতিমা শ্যামার।
একদৃষ্টে দেখে মুখে কথা নাহি আর।।' (পৃঃ ৬৪)

রানি মুগ্ধ বিস্ময়ে অপলক চক্ষে মা-ভবতারিণীকে দেখছেন—আর শ্রাবণের ধারার মতো দু-চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় জল ঝরে পড়ছে। ঠাকুর রানিকে স্পর্শ করে শক্তি সঞ্চার করে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিলেন। ধ্যানের সময় মনে অন্য চিন্তা না আসতে দেওয়ার জন্যই ঠাকুর রানিকে আঘাত করে শিক্ষা দিলেন।

আঘাত পেয়ে প্রথমে রানি বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই শ্রীশ্রীজগদম্বার অশেষ করুণায় রানি, নিজের মনের দুর্বলতা ধরতে পেরে অনুতপ্তা হয়েছিলেন। জমিদারি সম্পর্কিত ঐসময় একটা জটিল মামলা আদালতের বিচারাধীন ছিল। ধ্যানে বসে মায়ের কথা চিন্তা না করে রানি ঐ মামলাটির কি রায় (ফল) হতে পারে সেটির চিন্তায় ডুবে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন।

এই ঘটনায় মন্দিরের খাজাঞ্চি-গোমস্তারা মনে মনে খুব খুশি। কেননা তাঁরা প্রায় সবাই ঠাকুরকে খুবই হিংসে করেন। তাঁরা ভাবছেন, এবার ঠাকুর কিছুতেই কঠোর শাস্তি এড়াতে পারবেন না।

কথাটা মথুরবাবুর কানেও পৌঁছাল। তিনিও অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। ভাবলেন, এ কী অশোভন আচরণ!

হৃদয় ছুটে এল। ভীতকণ্ঠে বলল, 'মামা, এ তুমি কি করেছ!'

গদাধরের মুখে নির্মল প্রশান্তি। মৃদু হেসে ঠাকুর বললেন, 'ওরে হৃদু, আমি তার কি জানি! মা বললেন, ''এখানে এসেও রানি বিষয়-সম্পত্তির কথা চিন্তা করছে। এক-ঘা পিঠের ওপর দে বসিয়ে।'' তাই বসিয়ে দিলাম। মায়ের আদেশ কী করে অমান্য করি বল!'

রানি মথুরবাবুকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'ছোট ভট্‌চার্যের কোনও দোষ নেই। আরও শুনে রাখো উনি পাগলও নন।' তিনি মথুরবাবুকে আনুপূর্বিক সব ঘটনা বুঝিয়ে বলাতে মথুরবাবুরও ঠাকুরের ওপর যে ভুল ধারণা হয়েছিল, সেটি তাঁর মন থেকে চিরকালের জন্য মুছে গিয়েছিল। তাঁরা উভয়েই বুঝেছিলেন, ঠাকুর একজন দৈবীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। এই ঘটনার পর ঠাকুরের ওপর রানি এবং মথুরবাবুর ভক্তি-শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গিয়ে তাঁদের মনে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়েছিল।

গদাধর যে পাগল নন সেটি বোঝাবার জন্য তিনি তাঁর নিজের স্বরূপ রানি রাসমণি এবং মথুরবাবুর কাছে কখনও কখনও প্রকাশ করতেন।

কবি অক্ষয়কুমার সেন বলছেন, মথুরবাবু একদিন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাগর্ভে মুখ ধুচ্ছেন। একটু দূরে বকুলতলায় গদাধর বসে আছেন। বালকস্বভাব গদাধর প্রত্যেকটি মানুষের কথা বিশ্বাস করেন। লোকেরা তাঁকে পাগল বলে রটিয়েছে। তাই তিনি চিন্তামগ্ন। ভাবলেন, মথুর তো একজন বড় জমিদার, তাঁকে বললে হয়তো এর একটা প্রতিকার হতে পারে।

'মথুরে দেখিয়া মনে হইল তাঁহার।
ধনবান শ্রীমথুর বড় জমিদার।।
অনেক সম্পত্তি ধন টাকাকড়ি ঘরে।
বলিলে যদ্যপি কোন সদুপায় করে।।' (পৃঃ ৬৪)

হঠাৎ কি মনে হল গদাধরের, কাছে পড়ে থাকা একটা ঢিল তুলে নিয়ে মথুর-মথুর বলে সেটি তাঁর গায়ে ছুঁড়ে দিলেন। মথুরবাবু ঠাকুরের এই ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ভাবলেন, এখন গদাধরের তো পুরো পাগলের লক্ষণ দেখছি! তিনি খুব ভাল করে গদাধরকে মনে মনে পরীক্ষা করে, তাঁকে দেখে নিয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন। মথুরবাবুকে দেখে গদাধর ম্লানমুখে বললেন, 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। মন্দিরের সকলেই বলছে আমার মাথার গোলমাল হয়েছে। তুমি আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করো।'

এই কথাটি বলার ঠিক পরেই গদাধর মথুরবাবুর সঙ্গে উচ্চ আধ্যাত্মিক আলোচনায় মেতে উঠলেন। মথুরবাবুও মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলেন। গদাধরের কথার এতই শক্তি যে মুহূর্তের মধ্যেই বহুদিনের পুঞ্জীভূত অজ্ঞানরাশি দূর হয়ে যায়। তাই গদাধরের আন্তরিক ভাবসমৃদ্ধ ঐশ্বরিক তত্ত্বকথা মথুরবাবুর প্রাণের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলায় তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন। সব শোনার পর মথুরবাবু গদাধরের পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করে বললেন : 'এমন অসাধারণ মানুষ আপনি—আপনাকে কী কারণে লোকে পাগল বলে? প্রাণ দিলেও যদি আপনার ভাল হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি তা-ই করব।'

ভগবৎ প্রেম হলে ভক্তের কীরকম অবস্থা হয়, তা বোঝাতে গিয়ে দেবর্ষি নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে বলেছেন :

'তৎপ্রাপ্য তদেব অবলোকয়তি তদেব শৃণোতি
তদেব ভাষয়তি তদেব চিন্তয়তি।।' (।।৫৫।।)

—অর্থাৎ, পরম প্রেম লাভ করলে ভক্ত সর্বত্রই সেই প্রেমের প্রভাবে প্রেমাস্পদকেই দেখেন। এই দর্শন অর্থে কেবলমাত্র দর্শনেন্দ্রিয় দিয়েই নয় শ্রবণেন্দ্রিয়, বাগেন্দ্রিয়, মন সমস্তই সেই প্রেমাস্বাদনেই তখন বিভোর হয়ে থাকে। সর্বত্রই তিনি তাঁকে দেখেন। সবসময়েই তাঁর সম্বন্ধে শোনার জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন। তাঁর কথা ছাড়া অন্য কথা বলেন না এবং একমাত্র তাঁরই কথা চিন্তা করেন। মন সর্বক্ষণ তাঁরই চিন্তায় ব্যাপ্ত থাকে।

ঠিক সেই রকম মা-কালীর পুজো ও সাধনা করতে করতে মৃন্ময়ী মা-ভবতারিণী গদাধরের অনুভব ও উপলব্ধিতে চিন্ময়ী হয়ে উঠলেন। মা-ভবতারিণীর সঙ্গে এখন তাঁর সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ালো মা আর সন্তান। আর তাই তাঁর বিধিবাদীয় পুজো উঠে গেল। মানসপুজো অর্থাৎ ভাবের পুজোর মধ্যে দিয়ে তিনি আর মা-ভবতারিণী যেন এক হয়ে গেলেন। তাঁর ভাবে মা-ভবতারিণী সত্য সত্য জীবন্ত—চিন্ময়ী মা হয়ে উঠলেন! দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে একজন ব্যক্তি মা-ভবতারিণীকে পাষাণ-মূর্তি বলায়, তার কথা সত্য কি না পরীক্ষা করার জন্য গদাধর মায়ের নাকের সামনে তুলো ধরে দেখলেন মায়ের নিঃশ্বাস পড়ছে কি না! দেখা গেল তুলোটিও শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে দুলছে। তখন গদাধর বলে উঠলেন : মা যে আমার চিন্ময়ী—করুণাময়ী গো!

‘ধরিলেন তুলা লয়ে শ্যামার নাসায়।
দুলু দুলু কাঁপে তুলা নিঃশ্বাসের বায়।।’ (পৃঃ ৬৫)

পুজো ও সেবার কালাকাল-বিচার গদাধরের মধ্যে এখন আর দেখা যেত না। ভাবাবেশে সবসময় বিভোর হয়ে তিনি এখন মা-ভবতারিণীকে যেভাবে সেবা করবার ইচ্ছে হত, সেই ভাবেই করতেন। কোনও কোনও দিন পুজো না করেই হয়তো ভোগ নিবেদন করে দিলেন। অথবা ধ্যানে তন্ময় হয়ে নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে পুজোর জন্য আনীত ফুল-চন্দন দিয়ে নিজেকেই ভূষিত করে বসলেন। অন্তরে-বাইরে

নিরন্তর মা-ভবতারিণীর দর্শনের মাহাত্ম্যেই যে গদাধরের এইরকম বিসদৃশ আচরণ—এ সমস্ত কথা ঠাকুর নিজের মুখেই স্বামী সারদানন্দজী প্রমুখ সন্ন্যাসী-শিষ্যবৃন্দকে কথাপ্রসঙ্গে একাধিকবার বলেছেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের ‘সাধনা ও দিব্যোন্মত্ততা’র মধ্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

‘একদিন গদাধর মন্দিরে মাকে শয়ান দিচ্ছেন। হঠাৎ সেই শূন্যরূপা মাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন : ‘মাগো, আমাকে তোর কাছে শুতে বলছিস?’ বলেই হাত-পা গুটিয়ে ছোট্টটি হয়ে মায়ের রুপোর খাটে শুয়ে পড়লেন গদাধর। আবার একদিন মাকে ভোগ নিবেদন করছেন। ঠিক এই সময় একটি বিড়াল এসে মা-কালীর মন্দিরে ঘুরছে আর মিউ মিউ করছে। গদাধর অমনি বলে উঠলেন : ও মা এসেছিস? খাবি? খা মা, খা। এই বলে ভোগের থালাটি নিয়ে বিড়ালটিকে খাওয়াতে বসলেন গদাধর।

একটি পৌরাণিক ঘটনার কথা বলা যায়। মাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন গণেশ। একদিন মা-ভগবতী গণেশকে বললেন, তুই আমাকে কীরকম মেরেছিস দেখ! আমার সমস্ত শরীরে আঘাতের চিহ্ন। গণেশ তো অবাক! সে মাকে মারবে! লজ্জায়, দুঃখে মরমে একেবারে মরে গেল যেন সে। ভাবতে লাগল সে কখন মেরেছে মাকে, গণেশ একবার মেরেছিল একটি বিড়ালকে। মা ভগবতী তখন বললেন : ওরে আমি যে ওর মধ্যেও আছি। যা মার্জারি তাই-তো ভগবতী—তাই-তো আমি। প্রসঙ্গত বলা যায়, জয়রামবাটীতে জ্ঞান মহারাজকে মা বলেছিলেন : ‘দেখো জ্ঞান, বেড়ালগুলোকে মেরো না। ওদের ভেতরেও তো আমি আছি।’

ভবতারিণীর নিমিত্ত ভোগ বিড়ালকে খাওয়াতে দেখে ও গদাধরের পুজোর নানারকম সামঞ্জস্যহীন আচার-আচরণ দেখে মন্দিরের কর্তব্যরত অন্যান্য ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা ভাবছেন, ছোট ভট্‌চায্যি পাগল

হয়ে গেছেন। দেবদেবী নিয়ে এই রকম ছেলেমানুষি, এই রকম অনাচার তো আর সহ্য করা যায় না। ফুল নিয়ে আগে নিজের মাথায় ও পায়ে ঠেকিয়ে তারপরে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করা! আগে নিজে খেয়ে মাকে এঁটো খাওয়ানো! মা-র খাটে শুয়ে পড়া—মা-র চিবুক ধরে লঘু পরিহাস করা!

অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার! এই সমস্ত ব্যক্তিরাই মায়ের শ্রীমন্দিরে এসে গদাধরের পুজো দেখে আবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে দেখতে থাকেন। তাঁরা বুঝতে পারেন গদাধরের পুজোর সময়ের আচার-আচরণ সব অস্বাভাবিক হলেও সেটি কিন্তু গভীর আন্তরিকতা পূর্ণ। আর ঐ যে উন্মনা ভাব, মনে হয় ওটিও যেন ঠিক উন্মাদের মতো নয়।

এঁরা সবাই এসেছিলেন ছোট ভট্চায্যিকে শাসন করতে। কিন্তু মুখ ফুটে কেউই কিছু বলতে পারলেন না। এই ব্রাহ্মণরা শেষ পর্যন্ত গদাধরের বিরুদ্ধে, মন্দিরে মায়ের পুজোর সময়কার নিয়ম-নিষ্ঠা সম্পর্কে মথুরবাবুর কাছে সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে নালিশ করে বসলেন!

মথুরবাবু বলে পাঠালেন, তিনি নিজে গিয়ে সব ব্যবস্থা করবেন। যতদিন না তিনি কোনও ব্যবস্থা করতে পারছেন, ততদিন তাঁরা যেন প্রতিবাদ না করেন।

এর ঠিক পরেই মথুরবাবু সব দেখে-শুনে ও সত্য উপলব্ধি করে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের ওপর হুকুমজারি করে বলে পাঠালেন, গদাধরকে যেন কোনওরকম বাধা দেওয়া না হয়। যেভাবে খুশি, সেইভাবেই তিনি পুজো করবেন।

'শ্যামার হয়েছে কৃপা তাঁহার উপরে।
যাহা ইচ্ছা করিবেন পুরীর ভিতরে।।' (পৃঃ ৬৫)

আরও বললেন, বহু পুণ্যের ফলে এমন সিদ্ধ মহাপুরুষ জগন্মাতার পূজারি হয়েছেন। যত দিন তিনি জীবিত থাকবেন, ততদিন তিনি তাঁকে মাথায় করে রাখবেন।

'বহু পুণ্যবলে আমি পাইয়াছি তাঁয়।
বাঁচিব যতেক দিন রাখিব মাথায়।।' (পৃঃ ৬৫)

মথুরবাবুর এই কথা শুনে পরশ্রীকাতর ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা মনে করলেন গদাধর সেজোবাবুকে নিশ্চয়ই 'গুণ' বা 'তুকতাক' করে বশ করেছেন।

এই ঘটনাটি 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার ভাবার্থটি অনেকখানি এই রকম :

পূর্বে কোনও সংবাদ না দিয়ে গদাধরের পুজোর সময় একদিন মথুরবাবু ভবতারিণী মায়ের মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই সরাসরি প্রবেশ করলেন গর্ভমন্দিরের মধ্যে। এখানে এসে যা দেখলেন, তা দেখবেন বলে কখনও কল্পনাও করেননি।

গদাধর তন্ময় হয়ে পুজো করছেন। কোনওদিকে লক্ষ্য নেই, বহির্জগতের জ্ঞান লুপ্ত। যে মথুরবাবুকে দেখলে দেবপুরীর সবাই তটস্থ হয়ে ওঠে, সেই মথুরবাবুই মন্দিরে এসে প্রবেশ করেছেন। গদাধরের তাতে কী এসে গেল! কেননা তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ মাতৃচিন্তায় বিভোর! মন্দিরে কে এল, কে গেল সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই পূজকের! কখনও কাঁদছেন আকুল হয়ে আবার কখনও আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠছেন : ওগো মা রোস রোস, থাম থাম আগে মন্ত্রটা বলে নি, তারপরে খাস। তন্ময় হয়ে মা-ভবতারিণীকে গান গেয়ে শোনাচ্ছেন গদাধর। আবার পরক্ষণেই ধ্যানের অতল গভীরে সমাহিত, নিঃসাড়-নিস্পন্দ দেহ। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্কোচে মার সঙ্গে কথা কইছেন, আবদার করছেন ঠিক ছোট্ট ছেলেটির মতো। শুধু কি তাই! অভিমানও করছেন তাঁর এই মায়ের সঙ্গে। ছোট্ট ছেলেটির মতো মায়ের সঙ্গে খুনসুটি করাও আছে ষোলো আনা!

মথুরবাবু কাউকে কিছু না জানিয়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন—ঠিক তেমনই ফিরেও গেলেন।

মনে হয় পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতির ফলেই মথুরবাবু ঠাকুরের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। তা যদি না হত, তবে তিনিও হয়তো ঠাকুরকে পাগল বলেই সাব্যস্ত করতেন।

শোনা যায়, মথুরবাবু ঠাকুরের এই সময়ের পুজো দেখে জানবাজারের বাড়িতে ফিরে এসে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রানি রাসমণিকে বলেছিলেন, 'অদ্ভুত পূজক পাওয়া গিয়েছে—দেবী বোধ হয় খুব শীঘ্রই জাগ্রতা হয়ে উঠবেন!'

গদাধর গোপনে গোপনে আরও নানা রকমের সাধনা করতেন। এই সব কঠোর সাধনার ফলে তাঁর শরীরে নানা প্রকার বিকার এসে উপস্থিত হয়েছিল। এগুলিকে বলে যোগজ বিকার—যোগ-সাধনার জন্য বিকার—দেহের ব্যাধি নয়। সাধারণ মানুষ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক মহিমা তখনও বুঝতে পারেনি।

গদাধরের খুড়তুতো দাদা পণ্ডিত সাধক হলধারী দক্ষিণেশ্বরে কালী-মন্দিরে পূজারি নিযুক্ত হলেন। রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে পুজো করেন। এখানে এসে হলধারী মধুরভাবের পরিচর্যায় পরকীয়া সাধন নিয়ে মেতে উঠলেন। বৈষ্ণব মতে এও একরকমের সাধনা বটে। কিন্তু এটি নিকৃষ্ট সাধনা। অধোগতিদায়ক সাধনা। কয়েকদিনের মধ্যেই হলধারীর সম্বন্ধে নানান কথা রটতে লাগল। শুরু হল নানা রকমের কানাকানি। কিন্তু কারও সাধ্য নেই যে হলধারীর মুখের ওপর স্পষ্ট করে কিছু বলে বা বিরোধিতা করে! কেননা বাক্‌সিদ্ধ হলধারীকে সবাই খুব ভয় করে—এড়িয়ে চলে। আর তা ছাড়া হলধারী অত্যন্ত অপ্রিয়ভাষী। কথায় কথায় অভিশাপ দিয়ে বসেন।

'সিদ্ধবাক কাছে কেহ কিছু নাহি কয়।
পাছে দেন অভিশাপ এই মনে ভয়।।' (পৃঃ ৬৫)

যথারীতি গদাধরের কানেও কথাটি এল। তিনি কিন্তু বরদাস্ত করতে পারলেন না। দাদাই হোক আর যেই হোক, চলবে না এমন কদাচার। দাদাকে সাবধান করে দিলেন গদাধর।

গদাধরের এই কথা শুনে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন হলধারী : 'আমার ভাই হয়ে, আমার থেকে ছোট হয়ে তুই আমাকে এমন কথা বললি? দেখবি, তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।'

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই এক সন্ধ্যাবেলায় সত্যি সত্যি গদাধরের মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল। সীমপাতার রসের মতোই ঘন কালো রক্ত। কতক বেরিয়ে আসছে আবার কিছুটা জমে থাকছে মুখের মধ্যে। আবার কিছুটা দাঁতের গোড়া থেকে সুতোর মতো ঝুলছে। রক্ত বন্ধ করার জন্য মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দিলেন গদাধর। তবু রক্ত বন্ধ হল না। আশপাশ থেকে সবাই ছুটে এল। হলধারীও এলেন।

'দাদা, শাপ দিয়ে তুমি আমার এ কি করেছ দেখো'—ডুকরে উঠলেন গদাধর।

চোখে দেখে সহ্য করতে পারলেন না হলধারী। কাঁদতে লাগলেন। মনে হয় হলধারীর এই কান্নার মধ্যেও একটা গর্ব সূক্ষ্মভাবে মিশে ছিল। সে বাক্‌সিদ্ধ।

'সজল নয়নে তবে কহে হলধারী।
কুকর্ম করেছি ভাই অভিশপ্ত করি।।' (পৃঃ ৬৫)

চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেল।

'তুমি কি হঠযোগ করো?'—একজন প্রশ্ন করলেন।

চোখ তুলে তাকালেন গদাধর। দেখলেন প্রশ্নকর্তাকে। দেখলেন, দক্ষিণেশ্বরে গত কয়েকদিন ধরে যে প্রাচীন বিজ্ঞ সন্ন্যাসীটি আছেন, প্রশ্ন করছেন তিনিই। তারপর সন্ন্যাসী বললেন, তবে আর কোনও ভয় নেই। সাধনায় সুষুম্নাদ্বার খুলে গিয়েছে। দেহের সব রক্ত মাথায় গিয়ে উঠেছিল। মায়ের কৃপায় নিজের থেকেই যে মুখের মধ্যে একটা পথ করে নিতে পেরেছে—এটা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার বলতে হবে।

কেননা হঠযোগে জড়সমাধি পর্যন্ত হয়ে যায়। সব রক্ত যদি মাথায় গিয়ে একবার জমতে শুরু করত, তাহলে তোমার সমাধি আর ভাঙত না।

ঠাকুর বললেন : সবই মায়ের ইচ্ছে।

সন্ন্যাসী আরও বললেন, 'মায়ের ইচ্ছেতেই তুমি আজ বেঁচে গেলে। মনে হচ্ছে তোমাকে দিয়ে মা অনেক কাজ করাবেন বলেই তোমাকে আজ এইভাবে রক্ষা করলেন।'

এই সময় তীব্র গাত্রদাহে নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছিলেন গদাধর। সারা দিন তীব্র গাত্রদাহে অত্যন্ত কষ্ট পেতেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জ্বালাও বাড়তে শুরু করত। দিনের দ্বিতীয় প্রহরের সময় গায়ের জ্বালা অসহ্য হওয়ায় শেষপর্যন্ত গঙ্গায় নেমে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রাখতেন। মাথায় ভিজে গামছা দিয়ে রাখতেন। কখনও কখনও আবার ঠাণ্ডা মেঝেতে গড়াগড়ি দিতেন।

গদাধর এই সময় কখনও কখনও জাগতিক বিষয় নিয়েও বিচার করতেন। একদিন তিনি গঙ্গার তীরে বসে মাটি আর টাকা হাতে নিয়ে মনে মনে বিচার করছেন। চেষ্টা করছেন দেখতে কোনটা বেশি ভারি। কোনটার দাম বেশি!

মাটি না টাকা! টাকা না মাটি!—বিচার করতে করতে মনই বলে দিল দুই-ই সমান—দুই-ই তুল্যমূল্য—দুই-ই অসার।

'এত বলি টাকা মাটি উভয়ে লইয়ে।
দূর গঙ্গাজলে প্রভু দিলেন ফেলিয়ে।।' (পৃঃ ৬৬)

মাটি আর টাকা দুই-ই হাতে নিয়ে বারবার 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলতে বলতে একসঙ্গে দুটোই গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তিনি পরে বলেছিলেন: 'তখন ভয় হল মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন। মা লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা করলুম! এখন যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন! অমনই বললুম : মা, খোদ তোমায় চাই। আর কিছুই চাই না। তোমাকে পেলেই সবকিছু পাওয়া হবে।' কাছেই ভবনাথ চাটুজ্জে বসেছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'এটি আপনার পাটোয়ারি!'

ঠাকুর হেসে বললেন : হ্যাঁ, ঐ-টুকু পাটোয়ারি।

ঈশ্বরের আনন্দ পেলে কোথায় থাকে বিষয়ানন্দ আর কোথায়ই বা থাকে সংসারানন্দ! একবার ভগবান ভক্তের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিয়ে বললেন : বর নাও। ভক্তটি বললেন : আমাকে এমন বর দিন যেন সোনার থালায় নাতির সঙ্গে বসে ভাত খাই। পাটোয়ার ভক্ত। একবারে অনেকগুলি চেয়ে নিল। ঐশ্বর্য হল, ছেলে হল, নাতি হল। আবার আয়ুও হল!

'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বিচার করে গঙ্গায় ফেলে দেওয়ার কদিন পরেই ঠাকুর দুঃখিত মনে মায়ের মন্দিরে এসে মাকে জানালেন, 'মা আমি তো ঐ করে বসলুম। কিন্তু যদি মা-লক্ষ্মীর কোপে পড়ি, যদি তিনি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন তো কি হবে? আর আমাকে কে খাওয়াবে, কে দেখবে?'

রামলালদাদা তাঁর স্মৃতিকথায় বলছেন : এই প্রসঙ্গে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন : 'তখন মা-ভবতারিণী আমার কথা শুনে বললেন— ''তুই লক্ষ্মীর কোপে পড়লি তো কি বয়ে গেল, তোর ভয় কি? এই দেখ এরা তোর রসদ্দার হয়ে খাওয়াবে, দেখবে।''—এই বলে মা দেখালেন—দেখলুম মায়ের চারিদিকে স্ফুট উঠছে। তাতে মথুর, বলরাম, সুরেন্দ্র, কেশব আরও কত রে। এরা এক-একজন মায়ের চারিদিকে হাততালি দিয়ে বলছে—''জয় কালী মহাকাল, জয় শিব মহাকাল।'' তারপরে সকলে একে-একে লীন হয়ে গেল।'

ঠাকুর অত্যন্ত গোপনে বিচিত্র ধরনের বহু সুকঠিন সাধনা করেছিলেন। পুঁথি রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেন মশাই এখানে যে-সাধনাটির কথা উল্লেখ করেছেন সে-সম্বন্ধে তিনি লিখছেন :

'এসময়ে শুনি এক কঠোর সাধন।
সূর্যেতে সতত লগ্ন দুখানি নয়ন।।' (পৃঃ ৬৬)

ঠাকুর সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একনাগাড়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। সূর্য আস্তে আস্তে যেভাবে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ত, তিনিও ঠিক সেই ভাবে সূর্যের দিকে তাকিয়ে নিজের সাধনার স্থানটিতে আবর্তিত হতেন।

এই ভাবে পরপর তিনটি দিন সূর্যের দিকে তাকিয়ে সাধনা করার ফলে দেখা গেল তিনি আর চোখের পাতা ফেলতে পারছেন না। কি দিনে কি রাতে কোনও সময়েই চোখ বন্ধ করতে পারছেন না। ফলে তাঁর মনে নানা রকম দুশ্চিন্তা দেখা দিতে আরম্ভ করল।

তাঁর মন শান্ত হয় না। নিয়ত জাগ্রত নিষ্পলক দুটি-চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় জল ঝরে পড়ছে। বলছেন : মাগো আমার দু-চোখ নিশ্চল করে দিয়েছিস চোখের সামনে চিরন্তনী হয়ে থাকবি বলে! কিন্তু এমনই করে আমাকে জাগিয়ে রেখে তুই কি শেষে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লি মা? এই কি তোর বিচার? যে সন্তান মায়ের জন্য আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ফেরে, তার মা কি কখনও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে!

এমনই করে ছয় বছর চোখের পাতা এক করেননি গদাধর। চোখের পলক ফেলার মুহূর্তে মা যদি এসে চলে যান! এই ছটি বছর ঘুমোননি একটুও। কি দিনে কি রাতে। সারাক্ষণ চোখ দুটি মেলে রেখেছেন। মায়ের জন্য ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছেন। শেষপর্যন্ত গদাধরের এই হৃদয়-নিংড়ানো কান্নাই মমতার নির্ঝরিণীকে নিজের অন্তরে টেনে এনেছেন। গদাধর দেখিয়েছেন কীরকম সুতীব্র ব্যাকুলতা থাকলে মা-কালী অর্থাৎ ভগবান দেখা দেন।

একদিন গদাধর মা-ভবতারিণীর মন্দিরে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে ম্লান মুখে বসে আছেন।

'শ্যামার মন্দিরে হেনকালে একদিন।
বসিয়া আছেন মুখ বিষণ্ণ মলিন।।
অকস্মাৎ উপনীত সাধু একজন।
মনোহর মূর্তিখানি বিশাল নয়ন।।' (পৃঃ ৬৭)

গদাধর এই সময় দূরে একজন শান্ত-সৌম্য সুদর্শন সন্ন্যাসীকে দেখে ভাবছেন, চোখের পাতা কেন ফেলতে পারছেন না, সেকথা তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু দেখলেন যে ঐ সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীটি তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি আয়তনেত্রে ঠাকুরকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন—না না, এটি তোমার চোখের রোগ নয় অথবা কোনও ব্যাধিও নয়। সাধনার ফলে তোমার এটি হয়েছে। একে বলে 'লোচন-বিকার'। সন্ন্যাসীর কথা শুনে ঠাকুরের সমস্ত দুশ্চিন্তা ও দুঃখ মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে গেল আর তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠল।

সমস্ত মানুষ যখন রাতের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে, তখন নিজের ঘর ও বিছানা ছেড়ে গদাধর একা-একা চলে যান পঞ্চবটীতে। চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল হয়ে থাকে। দেখলেই মনে হয় যেন সারা রাত কেঁদেছেন আর চোখের পাতা দুটি মুহূর্তের জন্যও এক করেননি। ভাগনে হৃদয় জানতে পেরে একদিন ধরে বসল—'কোথায় যাও রাত্তিরে?' মনের মতো কোনও উত্তর না পেয়ে হৃদয় ঠিক করল দেখতে হবে মামা রোজ রাত্রে কোথায় যায়, কি-ই বা করে!

হৃদয় মামাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। হৃদয়ের মনে হল রাত্রিবেলা মামাকে কখনোই একা-একা যেতে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। কাছেই পঞ্চবটী। চারিদিকে ঘন ঝোপঝাড়। একেই কবরডাঙা, তার ওপর ঘন জঙ্গল আর ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাই লোকেরা দিনের বেলাতেও ভূতের ভয়ে ঐ জায়গাটা এড়িয়ে চলত।

রাত গভীর হয়ে আসতেই ঠাকুর যথারীতি শয্যা ছেড়ে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও দূর থেকে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল। মামাকে ঐ কবরডাঙার ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে দেখে ভয়ে শিউরে উঠল হৃদয়। মামার পিছন পিছন না গিয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে দূর থেকে মামার স্বগতোক্তি শুনতে লাগল।

‘মাগো মন্দিরে তো এখন চাবি পড়ে গেছে। কিন্তু তোর এই ভুবনজোড়া চিরসুন্দরের মন্দিরে তো আর চাবি পড়ে না। তাই এখন চুপিচুপি চলে এসেছি তোর কোলের কাছটিতে। এই অন্ধকারে যে তোর হাতের স্পর্শ পাই গো মা। আর এই স্তব্ধতায় পাই তোর প্রাণের স্পন্দন। এই অন্ধকারের অসীম নীরবতায় তোর পায়ের শব্দ শোনার প্রতীক্ষায় যে অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছি মা। তুই দয়া কর। দেখা দে মা, দেখা দে।’

চিৎকার-চেঁচামেচি করেও কোনও ফল না হওয়ায় হৃদয় দূর থেকে একের পর এক ঢিল ছুঁড়ে মামাকে ভয় দেখাতে লাগল। কিন্তু কোনও ফল হল না। ঢিল ছুঁড়েও যখন মামাকে ফিরানো গেল না, তখন একদিন গভীর রাতে কেবলমাত্র মামার উপর ভালবাসার আকর্ষণে অনেক সাহস সঞ্চয় করে ঢুকে পড়ল ঐ জঙ্গলের মধ্যে। কিন্তু মামার প্রিয় আমলকী গাছের তলায় এ কী দেখছে হৃদয়! মামা কি তাহলে সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেল! বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে হৃদয় প্রত্যক্ষ করল সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন হয়ে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতোই ধ্যানস্থ ঠাকুর। শুধু যে কাপড় খুলে রেখে ধ্যান করছেন তা-ই নয়, পৈতেটিও গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছেন।

‘বুঝিতে না পারি মর্ম কার্যের কৌশল।
সত্য সত্য মামা তুমি হলে কি পাগল।।’ (পৃঃ ৬৮)

হৃদয় এরকম অভাবিত তপস্যা দেখে সহ্য করতে না পেরে কাছে গিয়ে ধমকে বলে উঠল : ‘কাপড় পৈতে ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসে আছ যে! এটা কী হচ্ছে শুনি?’ গদাধর হৃদয়ের হাঁকডাক প্রথমে কিছুই শুনতে পাননি। যখন দেহে চেতনা ফিরে এল, তখন বললেন, ‘ওরে হৃদু তাঁর কাছে যেতে হলে অহং-এর সামান্য ফেঁকড়ি থাকলেও চলবে না! তাই তো এই ভাবে এখানে মায়ের ধ্যান করি।’

কিন্তু জঙ্গলে কেন?

‘নির্জন না হলে কি ধ্যান হয়! আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করলে মনের কামনা সিদ্ধ হয়।’

—তোমার আবার কামনা কি?

‘ওরে হৃদু, আমার একমাত্র কামনা মাকে দেখব, মাকে পাব, মায়ের সঙ্গে এক হয়ে মিশে থাকব।’

কিন্তু মামার এই কথা হৃদয় কিছুই বুঝতে না পেরে বলল, ধ্যান কর-না, কিন্তু দিগ্বসন হতে হবে কেন?

গদাধর বললেন : ‘অষ্ট পাশে মানুষ একেবারে বদ্ধ হয়ে আছে। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, কুল, শীল, মান, জাতি, অভিমান ইত্যাদির সামান্য আঁশটি থাকলেও তাঁর কাছে আসা যাবে না। তাই ওসব খুলে রেখেছি। এগুলো কি জানিস? এগুলো হচ্ছে শিশুর মুখে চুষিকাঠির মতো। শিশু যতক্ষণ চুষিকাঠি নিয়ে ভুলে থাকে ততক্ষণ মা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। যখন সে চুষিকাঠি ফেলে দিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে পড়িমরি করে ছুটে এসে ছেলেকে কোলে তুলে নেন। তাই আমিও এই অহং-এর চুষিকাঠি-রূপ কাপড়-পৈতে খুলে রেখে ব্যাকুল অন্তরে মাকে ডাকছি।

‘গোপীদের বস্ত্রহরণ হয়েছিল কেন জানিস? গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল। শুধু লজ্জাটি বাকি ছিল। বস্ত্রহরণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই পাশটিও কাটিয়ে দিলেন। কাজেই পরিধেয় বস্ত্র আর পৈতে এগুলি জাত্যভিমান ছাড়া তো আর কিছুই নয়।’

P. T. C. LIBRAR

রানি রাসমণি গদাধরকে খুবই ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন। তাঁকে দেখলেই বাৎসল্যরসে ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে পড়েন। গদাধরের মুখ থেকে রক্ত মোক্ষণ হওয়ায় এবং মা-ভবতারিণীকে লাভ করার জন্য আহার-নিদ্রার দিকে তাঁর কোনও লক্ষ্য না থাকায় রানি খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। মথুরবাবুকে নির্দেশ দিলেন গদাধরকে ভাল ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করানোর জন্য।

গদাধরের শরীর নিয়ে মথুরবাবু এবং রানি দুজনেই খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে কলকাতার তৎকালীন বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে আরম্ভ করলেন। বেশ কিছুদিন গঙ্গাপ্রসাদের চিকিৎসায় থেকেও কোনও ফল হল না। ঠাকুর কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদকে ধন্বন্তরি বলেই মানতেন। ঈশ্বরের কৃপা না থাকলে কি আর অত বড় চিকিৎসক হওয়া যায়? ঠাকুর বলতেন, যেখানেই বিশেষ গুণের বিকাশ, সেখানেই ঈশ্বরের প্রকাশ। চিকিৎসায় কোনও ফল না পাওয়া গেলেও হৃদয় ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে মাঝে মাঝে গঙ্গাপ্রসাদের কলকাতার বাসভবনে উপস্থিত হতেন।

ঠাকুর বলতেন : একদিন ঐ ভাবে হৃদয়ের সঙ্গে তিনি গঙ্গাপ্রসাদের বাসভবনে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর চিকিৎসায় বিশেষ ফল হচ্ছে না দেখে চিন্তিত হয়ে কবিরাজ মশায় বিশেষভাবে পরীক্ষা করে নতুন ঔষধের ব্যবস্থা করলেন। ঐসময়ে কবিরাজের ভাই দুর্গাপ্রসাদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রোগের সমস্ত বিবরণ শুনতে শুনতে তিনি বলেছিলেন : ‘‘‘ইঁহার দিব্যোন্মাদ অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে। উহা যোগজ ব্যাধি। ঔষধে সারিবার নহে।’’ ঐ বৈদ্যের ভাই-ই আমার শরীরের বিকারসমূহ প্রথম নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।’ কবি অক্ষয়কুমার সেন মশাই বলছেন :

‘করিতেন সেই ভাই যোগের সাধন।
প্রভু দরশনে মনে কৈল নিরূপণ।।

… … …

যোগেশ-দুর্লভ পীড়া পীড়া ইহা নয়।
সমুদিত অঙ্গে পীড়া বহু ভাগ্যে হয়।।’ (পৃঃ ৬৮)

গদাধরের বর্তমান অবস্থা দেখে রানি ও মথুরবাবু হৃদয়কে মা-ভবতারিণীর পূজারি হিসেবে নিয়োগ করলেন।

‘আজ থেকে নিত্যকর্ম শ্যামা পূজা গেল।
কিন্তু শ্যামা অনুরাগ চৌগুণ বাড়িল।।’ (পৃঃ ৬৮)

একদিন হলধারী গদাধরকে বললেন : ‘তুমি প্রতিনিয়ত মা মা বলে কাঁদছ কেন? শ্যামামায়ের তো নামই কেবল শোনা যায়। কে কোথায় তাঁকে দেখতে পেয়েছেন, বলোতো? শিশু যেমন চাঁদের জন্য অকারণ কাঁদে, তুমিও দেখছি মা কালীকে পাওয়ার জন্য অকারণ কাঁদছ। পাওয়ার হলে এত দিনে কবেই পেতে। ক্ষুধা নাই, নিদ্রা নাই কেবল কাঁদছ। কেমন করে যে তোমার এমন মাথার বিকার হল?’

‘মা মা বলি কেন কাঁদ বালকের প্রায়।
শ্যামা মাত্র শুনা নাম কে পায় কোথায়।।

… … …

ক্ষুধা-নিদ্রা নাই কেন কাঁদ দিনে রেতে।
পাবার হইলে শ্যামা এত দিনে পেতে।।’ (পৃঃ ৬৯)

দাদা হলধারীর মুখে মা-ভবতারিণীকে লাভ করা অতি কঠিন শুনে তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা শত-সহস্রগুণ বেড়ে গেল।

গদাধর একদিন দুঃখে অভিভূত হয়ে অত্যন্ত কাতরভাবে মা-ভবতারিণীকে গান গেয়ে শোনাচ্ছিলেন। মা জগদম্বার দর্শন লাভ করবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করছিলেন। মায়ের দেখা পাচ্ছিলেন না বলে হৃদয়ে এক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকেন। জলশূন্য করবার জন্য লোকে যেমন গামছা নিংড়ায়,

গদাধরেরও মনে হচ্ছিল কেউ যেন ঠিক সেইভাবেই তাঁর বুকের ভেতরটা নিংড়াচ্ছে।

মা-র দেখা বোধহয় আর কোনওকালেই পাবেন না—এই মনে করে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে গদাধর ভাবলেন, মা থাকতেও মাকে যদি না দেখতে পাই তবে এ জীবন রাখার আর কি দরকার? হঠাৎ মায়ের ঘরের দেওয়ালে যে খাঁড়াটি ঝুলছিল তার ওপর তাঁর নজর পড়ল। গদাধর উন্মত্তের মতো ছুটে গিয়ে নামিয়ে আনলেন সেই খড়্গটি, সেই মুহূর্তেই জীবন শেষ করে দেবেন বলে।

নিজের গলায় আঘাত করতে যাচ্ছেন ঠিক এই সময়ে এক দিব্যালোকে মন্দিরাভ্যন্তর পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। জ্যোতির সমুদ্রে অবগাহন করে গদাধর মায়ের দর্শন পেলেন। ব্রহ্মময়ী মায়ের অদৃষ্টপূর্ব রূপ দর্শন করে তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল। মায়ের পদতলে লুটিয়ে পড়লেন গদাধর।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গে অনুযায়ী এই দর্শন সম্বন্ধে যেরকম বর্ণনা পাওয়া যায় সেটি এই রকম। ঠাকুর স্বয়ং বলেছিলেন : ‘দেখলুম ঘর-বাড়ি, ছাদ-দেওয়াল, আড়াল-আবডাল সমস্ত কিছুই নিমেষের মধ্যে কোথায় যেন সব উড়ে গেল—মিশে গেল। কোথাও কিছু নেই। শুধু এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতি সমুদ্র! যে দিকে যতদূর দেখি চারিদিক থেকে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন-গর্জন করে গ্রাস করবার জন্য মহাবেগে আমার দিকে এগিয়ে আসছে! দেখতে দেখতে আমাকে মুহূর্তের মধ্যে যেন গ্রাস করে ফেলে আলোর উজ্জ্বল-স্নিগ্ধ বন্যায় কোথায় কোন অতল তলে তলিয়ে নিয়ে চলে গেল! চোখের পলকে সেই জ্যোতি আমাকে আচ্ছাদন করে ফেললে! মা মা বলে কেঁদে উঠলুম। মনে হল ও তো ঢেউ নয়। মা-ই আমাকে টেনে নিলেন তাঁর নিশ্চিন্ত শান্তিতে-ভরা কোলের মধ্যে। তখন অন্তরে একটা অননুভূত জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত বইছিল। এই সময় মা-র সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করছিলাম।’

কিন্তু মাকে একবার দেখে কি তৃপ্তি আছে গদাধরের? তিনি বারবার তাঁকে দর্শন করতে চান। মাকে নিয়ে অবিচ্ছিন্ন আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতে চান। আর তাই তাঁর ব্যাকুলতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে দেখা দিতে লাগল।

গদাধর মা-ভবতারিণীকে নিয়ে সর্বক্ষণ তন্ময় হয়ে থাকেন। ঐ তন্ময়তায় সামান্য সময়ের জন্যও ছেদ পড়লে, এমন তীব্র ব্যাকুলতা এসে তাঁকে গ্রাস করত যে মাটিতে আছড়ে পড়ে মুখ ঘষে ঘষে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতেন। দেবর্ষি নারদ বলতেন :

‘নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্ বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি।।’ (নারদীয় ভক্তিসূত্র, ১৯)

—দেবর্ষি নারদ ভক্তকে সচেতন করে বলেছেন, যদি তাঁকে ক্ষণিকের জন্যও বিস্মৃত হই, তখন যেন এই বিস্মৃতির জন্য অন্তরে তীব্র জ্বালা অনুভব করি। সেই অবস্থা যখন স্বাভাবিকভাবে আসবে, সেটাই হল ভক্তি। যখন তাঁকে ভুলে থাকা যায়, তাঁর থেকে দূরে থাকা যায় যিনি ভক্ত তিনি তখনই অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেন। তাঁর অদর্শন-জাত এই যে তীব্র অন্তর্জ্বালা তার নিদর্শন দেখা যায় গোপীদের আচরণে। ভাগবতে এমনই বর্ণনা আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সকাল থেকে গোচারণে গিয়েছেন—গোপীরা সারাদিন তাঁর দর্শন পাননি। সন্ধ্যার সময় যখন তিনি গৃহে ফিরছেন তখন গোপীদের আকাঙ্ক্ষা তিনি যেন এক লহমার জন্যও চোখের আড়াল না হন। তাই চোখের পলক পড়লেও গোপীরা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। কারণ সেই মুহূর্তটি তাঁদের বৃথা চলে যাচ্ছে। তাই তাঁরা বিধাতার কাছে অনুযোগ করছেন যে ভক্তের কাছে প্রিয়তমের অদর্শনের দুঃখ যে কত গভীর, এক লহমার জন্য চোখের একটি পলকই যে তাঁদের কাছে একটি যুগের সমান—বিধাতাপুরুষের সে-সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই।

আমরা অনেক সময় ভুল করে ভেবে থাকি যে, ভক্তিতে বোধ হয় অবিমিশ্র আনন্দ। তা কিন্তু নয়। ভক্তিতে অসীম আনন্দের মধ্যে আছে অপার বেদনা। এই আনন্দ ও বেদনা দুটিই অতুলনীয়। ভক্তের জীবনে এই দুটিরই চরম অনুভূতি হয়। যখন তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তখন তাঁর সমস্ত কর্ম তাঁরই উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। তখন তিনি হৃদয়ে উল্লাস অনুভব করেন। কিন্তু যদি কোনও সময়ে তাঁর মন ঈশ্বর থেকে একটু বিচ্যুত হয়, তখনই তিনি এই বিস্মৃতির জন্য বিহ্বল হয়ে পড়েন।

ঠাকুরের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে এমন ব্যাকুলতা এসে তাঁকে গ্রাস করত যে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে প্রাণ যাওয়ার অবস্থার মতো হত। আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরতে থাকত। তখন তিনি কোথায় পড়লেন সে-সম্বন্ধে তাঁর কোনও হুঁশই থাকত না। ঠাকুর যেমন বলতেন : ব্যাকুলতা হল, মানে অরুণোদয় হল—তারপর সূর্য উঠল। অর্থাৎ দর্শন হল। তাই পরক্ষণেই আবার মা-ভবতারিণীর দর্শন লাভ করে গদাধরের মুখমণ্ডল অভূতপূর্ব দিব্যজ্যোতিতে ও তাঁর হৃদয় দিব্যোল্লাসে পূর্ণ হয়ে যেত। তখন তিনি যেন সম্পূর্ণ আর এক ব্যক্তি হয়ে যেতেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখা যায় শ্রীমতী রাধারানিরও শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে গদাধরের মতোই অবস্থা হত। এটিকে মহাভাব বলে। বহু পুণ্যের ফলে ও তীব্র ব্যাকুলতা-সহ সাধনার ফলে মহাভাগ্যবান দু-একজনের মধ্যেই কালেভদ্রে ঐ মহাভাবের উদয় হয়ে থাকে।

'ব্যাস শ্রীরাধার অঙ্গে পুরাণে বাখানে।
দুর্লভ উদয় নহে যেখানে সেখানে।।' (পৃঃ ৭০)

নির্জনে বসে কাঁদতে লাগলেন গদাধর। মনের ঐকান্তিক আকুতি—মা কবে থাকবেন তাঁর কাছটিতে চিরদ্যুতি হয়ে!

গ্রীষ্মের দারুণ অগ্নিবাণের পর ভয়ঙ্কর রূপ ধরে এল বর্ষা। আকাশের বুকে শুরু হয়ে গেল কালো মেঘের ঘনঘটা। যত মেঘ ছিল

আকাশের বুকে, তারা ঘনঘোর কাল-ওড়নায় নিজেদের ঢেকে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে উঠল। এর ঠিক পরেই কোন এক অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলিহেলনে, প্রমত্ত কালভৈরবের মতো মহা হুঙ্কারে চারিদিক অন্ধকার করে একসঙ্গে আছড়ে পড়তে লাগল পৃথিবীর বুকে। প্রলয়ের মত্ত রোলের মতো মুহুর্মুহু হেঁকে ওঠে বাজ। বিদ্যুৎ-কশাঘাতে ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল অন্ধকার। ভাগীরথীর টলটলে জল গৈরিক বসনে সেজে উঠল। সমুদ্রের উথালপাথাল করা প্রবল উচ্ছ্বাসের জোয়ারে গঙ্গার মিঠা জল হয়ে উঠল লবণাক্ত। গদাধর ঘটি-ঘটি সেই জল পান করার ফলে সাংঘাতিক পেটের অসুখে ভুগতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মা-ভবতারিণীকে নিয়ে অব্যক্ত আনন্দে মেতে থাকা থেকে—তাঁকে সবসময় কাছটিতে পাওয়ার উল্লাসের মধ্যে সামান্য ছেদ পড়লেই অত্যন্ত অস্থির হয়ে ছটফট করতে থাকেন।

গদাধরের এখন মা-ভবতারিণীকে চিন্তা করে এমন অবস্থা হয় যে, যেখানেই ভাবাবেশ হয়, সেখানেই তিনি মাটিতে বা কাদায় লুটিয়ে পড়েন। তীব্র ব্যাকুলতা এসে তখন তাঁকে এমনভাবে গ্রাস করে যে তাঁর মর্মভেদী কান্নায় আকাশ-বাতাস ভরে যায়।

'প্রভুর অবস্থা কিবা কাদা কিবা মাটি।
যেখানে আবেশ সেখানে লুটাপুটি।।
ঘটি ঘটি লোনা জল পেটে গিয়া পড়ে।
হইল এবারে পীড়া বিষম উদরে।।' (পৃঃ ৭০)

শেষপর্যন্ত গদাধরের আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে কামারপুকুরে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য নিয়ে এলেন। সবাই দেখলেন কামারপুকুরের পল্লীবাসীদের সঙ্গে তাঁর যে মধুর সম্পর্ক সেটি আগের মতোই আছে। কখনও হাসিখুশি, আবার কখনও বা তাঁর স্বভাবসুলভ রসালাপে সবাইকে আনন্দে মাতিয়ে রাখছেন। কখনও গদাধর চলে যান নির্জন

স্থানে—যেখানে কেউ কোথাও নেই। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় কাটাতে লাগলেন গ্রামের পশ্চিমে ও উত্তর-পূর্ব দিকের ঘন ঝোপজঙ্গলে ঘেরা 'ভূতির খাল' এবং 'বুধুই-মোড়ল' নামে জনহীন শ্মশান দুটিতে।

'প্রভুর অন্তরে নাই কোনই তরাস।
ক্রমে করিলেন পরে শ্মশানেতে বাস।।
শ্মশানের পোড়া কাঠ করি আহরণ।
না আসিয়া ঘরে হয় তথায় রন্ধন।।' (পৃঃ ৭১)

সেখানে মায়ের ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকেন। শ্মশানের পোড়া কাঠ দিয়েই কিছু রান্না করে মাকে নিবেদন করে নিজে ঐখানেই সেটি গ্রহণ করেন। গদাইয়ের এই সমস্ত কাণ্ড দেখে পল্লীবাসীদের অনেকেই গদাইকে পাগল বলে কানাকানি করতে লাগলেন।

একদিন গদাধরের যে কী ভাব হল সারাদিন কিছু না খেয়ে মৌন থেকে ভাবে বিভোর হয়ে বসে আছেন। গদাই গ্রামবাসীদের অতিপ্রিয়। খবর পেয়ে পল্লীবাসীরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে গদাইদের বাড়িতে সমবেত হয়ে নানারকম জল্পনাকল্পনা করতে লাগলেন। পুঁথিকার বলছেন :

'একদিন শ্রীপ্রভুর কি হইল মন।
ভাবেতে বিভোর গোটা দিন অনশন।।
সমাগত লোকজন বাড়ি পরিপূর্ণ।
বিষাদিত সকলেই শ্রীপ্রভুর জন্য।।' (পৃঃ ৭১)

ধনী কামারিনী গদাইয়ের ভাব বুঝতেন। তিনি যে শুধু গদাইয়ের ভিক্ষামাতা ছিলেন তা-ই নয়—কোলেপিঠে করে তাঁকে মানুষ করেছেন। তিনি তখন গদাইয়ের জন্য উদ্বিগ্ন উপস্থিত গ্রামবাসীদের বললেন : 'গদাইকে যার-যা খাওয়ানোর ইচ্ছে তাড়াতাড়ি সেই সব খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। আজ যার যা মনের সাধ প্রাণভরে সব মিটিয়ে নাও।'

ধনী কামারিনীর এই কথা শুনে পল্লীবাসীরা দুধ, মিষ্টি, ফল ইত্যাদি যে-যা মনের মতো জিনিস পেল—নিয়ে এসে গদাইকে খাওয়াতে লাগলেন। আর গদাধরও ভাবাবেশে সবকিছুই খেতে লাগলেন। কিন্তু এই ভাবে গদাধর কত যে আহার করলেন, সে-সম্বন্ধে তাঁর কোনও হুঁশ নেই।

'মুখে তুলে দেয় দ্রব্য মনোমত যার।
ভাবাবেশে প্রভুদেব করেন আহার।।
কতই খাইলা প্রভু নাহি বাহ্যোদয়।
এখনও কে আছে বাকি ভিক্ষামাতা কয়।।' (পৃঃ ৭১)

ভিক্ষামাতা বললেন, এখনও যদি কেউ প্রভুকে খাওয়াতে বাকি থাকে কাছে এসে মনের সাধ মিটিয়ে নাও। এখানে কোনও বাছবিচার বা জাতপাতের ব্যাপার নেই। কোনও ভয় নেই।

'একজন ছিল ডোম ভাবিয়া না পায়।
কি দ্রব্য আনিয়ে দিবে প্রভুর সেবায়।।' (পৃঃ ৭১)

জাতিতে একজন ডোম ওখানে দীনহীনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সম্পত্তি বলতে একটি কুঁড়ে ঘর আর কুঁড়ে ঘরটির লাগোয়া একটি কাঁঠাল গাছ। হীন জাতি হলেও ধনী কামারিনীর কথায় সাহস পেয়ে ভাবছে, হে প্রভু! কি আছে আমার, যা দিয়ে আজ তোমার সেবা করব! ভাবতে ভাবতে বাড়িতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখল তার কাঁঠাল গাছটিতে একটি সুপক্ক কাঁঠাল ঝুলে রয়েছে এবং তার মিষ্টি গন্ধে চারিদিক ম-ম করছে। আনন্দে ঐ লোকটি বাড়ির চালে ঠেকে থাকা পাকা কাঁঠালটি পেড়ে মাথায় করে নিয়ে এসে ভক্তিতে গদগদ হয়ে গদাধরকে খেতে দিল। ভক্তিতে নিবেদিত সেই কাঁঠালটি গদাধর খেলেন। অক্ষয়কুমার সেন লিখছেন :

'দীনবন্ধু প্রভুদেব দীনের সম্বল।
উদর পূরিয়ে খান কাঁঠালের ফল।।' (পৃঃ ৭১)

গদাধর দীনবন্ধু হয়ে দীনহীন ভক্তের বহু দিনের সাধ পূরণ করলেন। দূর করলেন তার দুঃখ-দারিদ্র।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—গদাধর সমস্ত পল্লীবাসীর অত খাবার খেলেন কীভাবে?

যাঁকে সবাই গদাই বলে ভালবাসছেন তিনি শুদ্ধাত্মা। শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত। প্রকৃতির পার। তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। তিনি অজর অমর সুমেরুবৎ। যেমন বাতাসে কখনও সুগন্ধ কখনও দুর্গন্ধ পাওয়া যায় কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।

ব্যাসদেবের যমুনা পার হওয়ার সময়ের একটি ঘটনা আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে দেখা যায়—একবার ব্যাসদেব যমুনার তীরে এসেছেন নদীর ওপারে যাবেন বলে। সেই সময় গোপীরাও ওপারে যাওয়ার জন্য সেখানে উপস্থিত। দুধ, দই, ননী, ক্ষীর ইত্যাদি বিক্রি করতে যাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু খেয়া নেই। কেমন করে পার হবেন ভাবছেন। ঠিক এই সময়ে ব্যাসদেব বললেন : আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে। তখন গোপীরা তাঁকে ক্ষীর, সর, ননী খাওয়াতে লাগলেন। আর ব্যাসদেবও প্রায় সমস্তই খেয়ে ফেললেন। খাওয়ার পর ব্যাসদেব যমুনাকে সম্বোধন করে বললেন : ‘হে যমুনে! আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি, তাহলে তোমার জল দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যাক আর মাঝে রাস্তা দিয়ে আমরা ওপারে চলে যাব।’ আশ্চর্যের ব্যাপার ঠিক তা-ই হল! যমুনা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন—মাঝে ওপারে যাওয়ার পথ। সেই পথ দিয়ে ব্যাসদেব ও গোপীরা সবাই পার হয়ে গেলেন।

আসল কথা হল, ‘আমি খাই নাই’ মানে এই যে আমি সেই শুদ্ধাত্মা। শুদ্ধাত্মা তো নির্লিপ্ত। প্রকৃতির পার। তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই।

গদাই কামারপুকুর অঞ্চলের সমস্ত জাতির খাবার গ্রহণ করায় তাঁর দাদা রামেশ্বর খুবই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কেননা তাঁদের বংশের যে আচরিত রীতি-নিয়ম সেটি নিয়ে কেউ যদি কোনও প্রশ্ন করে বসে! গ্রামের মানুষ যদি তাঁদের ‘ঠেকো’ করে অর্থাৎ একঘরে করে! তাই দাদাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্য গদাধর ঠিক করলেন শীঘ্রই তিনি কামারপুকুর ছেড়ে তাঁর প্রিয় জায়গা শিহড় গ্রামে ভাগনে হৃদয়ের বাড়িতে চলে যাবেন।

‘প্রভুর যে কুলে জন্ম জানি পরিচয়।
যাহার তাহার দ্রব্য গ্রহণীয় নয়।।
… … …
পাছে কেহ করে প্রশ্ন কুলের উপর।
সে হেতু সন্ত্রস্ত-চিত্ত দাদা রামেশ্বর।।’ (পৃঃ ৭২)

গদাধর এমনভাবে সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করলেন যে সমাজের কোনও জাতির মানুষই বাদ গেলেন না। কেবলমাত্র বেনেদের দুর্গাদাস নিজের বাড়ির কুলবধূ ও কন্যাদের খুবই অন্তরালে রাখতেন। তাই তাঁর বাড়ির স্ত্রীলোকদের গদাধরকে দর্শন করতে না পারার জন্য মনে খুব দুঃখ হয়েছিল।

‘কুলবতীগণে সব থাকে অন্তঃপুরে।
উপায়বিহীনা আসে বাড়ির বাহিরে।।
বধূরা প্রভুর কথা শুনে মাত্র কানে।
উগ্রতর প্রাণে সাধ প্রভু-দরশনে।।’ (পৃঃ ৭২)

একদিন দুর্গাদাস কোনও একজন আত্মীয়ের কাছে এই বিষয়টি নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছিলেন। ভগবান লক্ষ অপরাধ মার্জনা করলেও দুটি জিনিস একেবারেই সহ্য করতে পারেন না, একটি হল অহংকার আর অন্যটি হল প্রতারণা।

এখানেও ঠিক সেটিই ঘটল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের ভাব অনুযায়ী—হঠাৎ গদাধর সেখানে উপস্থিত হয়ে দুর্গাদাসের কথা শুনে বললেন : অবরোধপ্রথার মধ্যে দিয়ে মেয়েদের কি কখনও রক্ষা করা

যায়? একমাত্র সৎশিক্ষা আর দেবভক্তির মধ্যে দিয়েই তাঁরা সুরক্ষিতা হন। ইচ্ছে করলে আমি তোমার অন্দরের সকলকে দেখতে ও তাদের সমস্ত কথা জানতে পারি।

গদাধরের এই কথা শুনে আরও বেশি অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে দুর্গাদাস বললেন, বেশ কেমন করে জানতে পার জানো দেখি। কই একটা কাকপক্ষী গিয়ে আমার বাড়ির ভিতরের কথা বা মেয়েদের মুখ দেখে আসুক তো!

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ির দরজায় একটি মেয়ে এসে উপস্থিত। বেশভূষা দেখেই দুর্গাদাসের মনে হল তাঁতিদের কারও মেয়ে। পরনে হাতে-বোনা মোটা ময়লা শাড়ি। হাতে রুপোর ভারি পৈছা, কাঁখে চুপড়ি তাতে আবার কয়েক লাছি সুতো।

'কোথেকে আসছ মা?'

দুর্গাদাসের প্রশ্ন শুনে মেয়েটি লজ্জায় জড়সড় হয়ে মুখে ঘোমটা টেনে নিচু স্বরে বলল, হাট থেকে। হাটের পর সঙ্গিনীরা সব চলে যাওয়ায় একা-একা বাড়ি ফিরতে ভয় করছে। তাই রাতটার মতো আশ্রয় পাওয়ার আশায় এসেছে।

দুর্গাদাস উদারতার পরাকাষ্ঠা হয়ে বললেন : বেশ তো বাড়ির ভেতরে গিয়ে মেয়েদের বলো। কোনও অসুবিধে হবে না। রাতটা থেকে যাবে।

দুর্গাদাসকে প্রণাম করে মেয়েটি অন্তঃপুরে মেয়েদের কাছে রাতে থাকার কথা বলল। তারা সবাই ঘিরে ধরল অল্পবয়স্কা তন্তুবায় মেয়েটিকে। মেয়েটির চমৎকার ব্যবহার এবং মিষ্টি কথা বাড়ির সমস্ত মেয়েরা অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল। তারা লক্ষ্য করল কি যেন এক অদ্ভুত আকর্ষণ আছে মেয়েটির। বাড়ির সমস্ত মেয়েদেরই ভালবাসা তন্তুবায় মেয়েটির ওপর ঝরে পড়তে লাগল। থাকবার জায়গা ঠিক হল একধারে। মুড়ি-মুড়কি-গুড় দিয়ে সে জলযোগও করল।

মেয়েটি এখন বাড়ির অন্যান্য মায়েদের মতো সবার সঙ্গে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ঘুরে তন্নতন্ন করে সব দেখতে লাগল। শুধু তা-ই নয় কথার ফাঁকে ফাঁকে ঐ বাড়ির মেয়েদের সুখ-দুঃখের কথাও সব জেনে নিল। মেয়েটি যেন কি একটা জাদু জানে। তার মধুর ব্যবহারে সবাই মুহূর্তের মধ্যেই আপন হয়ে গেল। কেউই ঐ মেয়েটিকে ছেড়ে যেতে চায় না। সংসারের কাজ ভুলে সকলে ঐ মেয়েটির সঙ্গে গল্পে মেতে উঠল। আসলে ভগবান তো আনন্দস্বরূপ—রসস্বরূপ। উপনিষদে তাঁকে বলা হয়েছে 'রসো বৈ সঃ'। তাই তিনি যে-জায়গায় যে-রূপেই থাকুন না কেন, সকলকে এক আনন্দে ভরপুর করে রাখেন।

এদিকে অনেক রাত পর্যন্ত গদাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই দাদা রামেশ্বর অন্ধকারের মধ্যে হনহন করে চলেছেন সীতানাথের বাড়িতে। কেননা সারা দিনরাত ঐ বাড়িতেই পাঠ-কীর্তন নিয়ে মেতে থাকে গদাই। এত রাত হয়ে গেল তার আর ঘরে ফেরবার নাম নেই। এদিকে মা যে দুশ্চিন্তায় ঘর-বার করছেন, সে খেয়ালই তার নেই। পথে যেতে যেতে রামেশ্বরের যার সঙ্গেই দেখা হয়, গদাইকে দেখেছে কি না জিজ্ঞেস করেন। সবাই সীতানাথের বাড়িতে খোঁজ করবার জন্য বলল।

কিন্তু রামেশ্বরকে সীতানাথের বাড়িতে গিয়ে হতাশ হতে হল। সেখানে গদাই আসেনি। রামেশ্বর গদাইয়ের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পাড়ার পায়ে-পায়ে চলা সুঁড়ি মেঠো পথে গদাইয়ের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে-ডাকতে চলেছেন। তাঁতি মেয়েটি পা ছড়িয়ে বসে মেয়েদের সঙ্গে খোশগল্পে মেতে আছে। ঠিক এই সময় দাদা রামেশ্বরের উচ্চৈঃস্বরে ডাক কান খাড়া করে শুনতে লাগল তাঁতিনি। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল : যাচ্ছি গো দাদা যাচ্ছি। আমি এখানে—বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

'ছোট ভাই গদাধরে আন্তরিক টান।
সকাতর রামেশ্বর আকুল পরাণ।।
… … …
তথা হতে ততোধিক উচ্চরবে কন।
ওগো দাদা আমি হেথা কেন উচাটন।।' (পৃঃ ৭৩)

দুর্গাদাসের মেয়েরা আনন্দে কোলাহল করতে করতে সব কথা দুর্গাদাসকে জানালে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন : প্রভু আমার সব অহংকার চূর্ণ করে দিয়েছেন।

'লীলাপ্রসঙ্গ' অনুযায়ী দুর্গাদাস সমস্ত কথা শুনে প্রথমে খুবই অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং রেগে গেলেন। পরমুহূর্তেই কিন্তু গদাধরের দরিদ্র তন্তুবায় রমণীর বেশ ও চালচলনের অনুকরণ কতদূর স্বাভাবিক হয়েছিল, সেকথা চিন্তা করে প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়লেন।

তাই পরবর্তী কালে ঠাকুরকে বলতে শুনি : আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করলে কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে যায়। তখন ঠিক মেয়েদের মতো হাবভাব হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমি অনেকদিন মেয়েদের মতো শাড়ি ও গয়না পরে ওড়না গায়ে দিয়ে সখীভাবে ছিলুম।

এইবার গদাধর শিহড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। কামারপুকুর থেকে শিহড়ের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। শিহড়ে ভাগনে হৃদয়ের বাড়িতে যেতে তিনি ভালবাসতেন। সবেমাত্র বর্ষা শেষ হয়েছে, রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত তাই তিনি চলেছেন পালকিতে চড়ে।

'এইবার শ্রীপ্রভুর শিয়ড়ে গমন।
বড় পিয়ারের তাঁর হৃদুর ভবন।।' (পৃঃ ৭৩)

বর্ষার পর মেঘমুক্ত নীল আকাশ আর তার নিচে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, যেখানে শুধু সবুজের সমারোহ। শ্যামল ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে মানুষ চলার ফলে যে সরু সুঁড়ি পথ এঁকেবেঁকে নাম না জানা গ্রাম-গ্রামান্তরে চলে গিয়েছে—তার মধ্যে দিয়ে সোনালী ধানের শিষের কোলাকুলি, বাতাসে ঢেউ-তোলা সবুজ ধানগাছ এবং তাদের শিরশিরে আওয়াজ শুনতে শুনতে গদাধর আনন্দে বিভোর হয়ে পালকিতে চড়ে চলেছেন। এই সব দেখতে দেখতে তিনি তন্ময় হয়ে ভাবে বিভোর হয়ে উঠলেন। এই সময় হঠাৎ একটি অপূর্ব দর্শন গদাধরের জীবনে এসে উপস্থিত হল। তিনি দেখলেন, তাঁর শরীর থেকে কিশোর বয়সের দুটি অপূর্ব সুন্দর বালক বেরিয়ে এসে মাঠময় ছুটোছুটি করে খেলা করছে। পুঁথিকার লিখছেন :

'বিশ্বাগার দেহ-মধ্যে প্রভুর আমার।
বাহিরে আসিল দুটি কিশোর কুমার।।
নয়ন-বিনোদ মূর্তি সুঠাম সুন্দর।
বয়ানে লাবণ্য-কান্তি জিনি শশধর।।' (পৃঃ ৭৩)

তাদের মিষ্টি কথা ও হাসিতে সমস্ত জায়গাটিতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। বুনো ফুল তোলবার জন্য তারা কখনও ছুটে যাচ্ছে দূরে। আবার কখনও বা চলে আসছে একেবারে পালকির সন্নিকটে। তারা কেবল নীরব ছায়ার মতো বাতাসে ভাসছে না, রীতিমতো অপূর্ব কণ্ঠে গান গাইছে। পালকির পাশাপাশি চলতে চলতে তারা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে করতে কথা বলতে লাগল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আনন্দে এই ভাবে চলতে চলতে তারা আবার গদাধরের শরীরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

এই সব দেখে সরল গদাধরের মনে প্রশ্ন জেগেছিল—এই সুন্দর বালক-দুটি—এরা কারা বা কোথা থেকে এসেছে! আর এই সুন্দর বালক দুটি তাঁর শরীরে আশ্রয় নিলই বা কি করে!

লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে : বহুদিন ঠাকুরের এই প্রশ্নের কোনও মীমাংসা হয়নি। ঐ দর্শনের দেড় বছর পরে ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসার পর কথাপ্রসঙ্গে একদিন ঠাকুরের ঐ দর্শনের কথা শুনে ব্রাহ্মণী

বলেছিলেন : বাবা, তুমি ঠিক দেখেছ। এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে একাধারে এসে তোমার ভিতরে রয়েছেন! সেই জন্যই তোমার ঐরূপ দর্শন হয়েছিল।

তান্ত্রিক-সাধনা

গদাধরের যখন যে বাসনা হত মা-ভবতারিণীর অশেষ করুণায় সেগুলি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পূরণ হয়ে যেত। এইবার তাঁর বাসনা জাগল তন্ত্রমতে সাধনা করবার।

'তন্ত্রমতে করিবারে ভজন সাধনা।
হইল এখন মনে প্রবল বাসনা।।' (পৃঃ ৭৪)

আর ঠিক এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে একজন সদ্‌ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন। কামারপুকুরের কাছে বেঙ্গাই নামক গ্রামে তাঁর বাড়ি। শক্তিসাধক। তিনি সেই সময় কলকাতার বৈঠকখানা বাজারে বাস করছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি মা-ভবতারিণীকে দর্শন করার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। ঐ ব্রাহ্মণটিকে পরম ভক্তিমান দেখে ঠাকুর এই প্রবীণ শক্তিসাধকের কাছ থেকেই দীক্ষা নেবেন বলে ঠিক করলেন।

'মহাভাগ্যবান দ্বিজ ভাগ্যসীমা নাই।
গুরুরূপে লৈলা যাঁরে জগৎ-গোঁসাই।।' (পৃঃ ৭৪)

এই ব্রাহ্মণ খুবই সৌভাগ্যবান। কেননা জগতের যিনি গুরু, তিনিই এই ব্রাহ্মণকে গুরুরূপে গ্রহণ করলেন।

মা-ভবতারিণীর মন্দিরের মধ্যে দীক্ষার স্থান ঠিক হল। গদাধর শাস্ত্ররীতি মেনে ঐ ব্রাহ্মণের সঙ্গে মায়ের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দীক্ষাগুরু গদাধরের কর্ণমূলে মন্ত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গদাধর মহা হুংকার দিয়ে মা ভবতারিণীর পদতলে যে শবরূপী মহাদেব শুয়ে আছেন তাঁর বুকে গিয়ে বসলেন। এই দেখে দীক্ষাগুরু ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন।

'দীক্ষাগুরু যেন মন্ত্র দিলা কর্ণমূলে।
হুংকারি বসিলা প্রভু হর বক্ষঃস্থলে।।
… … …
দীক্ষাগুরু দরশন করি মহাত্রাসে।
বাপ বাপ ডাকিয়া পলায় উর্ধ্বশ্বাসে।।' (পৃঃ ৭৪)

ঈশ্বরসাধক ছাড়া অন্যান্য সাধারণ লোকেরা ঠাকুরের দিব্যোন্মাদ অবস্থার অসাধারণ উচ্চতা সম্বন্ধে সামান্যমাত্র ধারণাও করতে না পেরে তাঁকে পাগল বলে ভাবতে থাকে। কেননা তারা লক্ষ্য করেছিল—অত বড় জমিদার রানি রাসমণি বা তাঁর জামাতা মথুরবাবুর অশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করেও নিজের আখের না গুছিয়ে নিরাসক্তভাবে নিজেকে সমস্ত প্রকার ভোগসুখ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে মা-কালী, মা-কালী করেই সারাদিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। কাজেই তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য উন্মাদ ছাড়া আর কি? তবে একটা কথা সকলেই বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল যে, সাংসারিক সকল বিষয়ে উদাসীন হলেও এই উন্মাদের উজ্জ্বল সুন্দর চোখ-দুটিতে, চালচলনে, মধুর কণ্ঠস্বরে এবং অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধিতে এমন একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে যার প্রতি সমাজের প্রতিষ্ঠিত ধনী-মানী-পণ্ডিত ব্যক্তিরা স্বতই আকৃষ্ট হচ্ছেন, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের কাছে তিনি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র বলে বিবেচিত হচ্ছেন।

অনেকের ধারণা কোনও মানুষের মধ্যে যদি উন্মাদের লক্ষণ দেখা দেয়, তবে তার প্রতিকারের উপায় হল মহিলার সাহচর্য। গদাধরের আত্মীয়স্বজনেরাও এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হৃদয়কে গোপনে পরামর্শ

দিলেন একটি রূপসী যুবতী কন্যাকে জোগাড় করে গদাধরের কাছে এনে দিতে। হৃদয়েরও মনে হল তাঁরা ঠিক কথাই বলেছেন। হৃদয়ও তাঁদের কথা অনুযায়ী নিজে গোপনে থেকে মামার ঘরে এক রূপবতী কন্যাকে পাঠিয়ে দিল।

হঠাৎ পথে কোনও বিষধর সাপকে দেখলে মানুষ যেমন ভয়ে আঁতকে ওঠে, ঐ রূপসী কন্যাকে দেখে গদাধরেরও ঠিক সেই অবস্থা হল। কিন্তু এই দেবপুরুষের সান্নিধ্যে এসে সেই কন্যাটির হৃদয়ে এক আমূল পরিবর্তন এসে উপস্থিত হল। ঠাকুরকে দেখে তাঁর চিত্ত পবিত্রতায় ও বাৎসল্যভাবে পূর্ণ হয়ে উঠল। সামান্য অর্থের জন্য কি অপরাধই না করেছেন তিনি! অনুতাপে তিনি অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন।

অনুতপ্ত কন্যাটির মনে হল গদাধর যেন তাঁর নিজের গর্ভজাত অবোধ সন্তান। শুদ্ধ ভাবের উচ্ছ্বাসে এখন তিনি চোখের জলে ভাসছেন।

‘বিশুদ্ধ হইল চিত প্রভু-দরশনে।
গর্ভজাত শিশু যেন ভাবোদয় মনে।।
স্বকার্যে লজ্জিত কিন্তু দিব্যভাবোচ্ছ্বাসে।
বাৎসল্য-পূর্ণিত হৃদি আঁখিজলে ভাসে।।’ (পৃঃ ৭৫)

মানুষ দেখে কাজ। আর ভগবান দেখেন মন। ভগবানের কাছে কেউ নিজের অনুচিত কর্মের জন্য অনুতাপে দগ্ধ হয়ে যদি অশ্রুবিসর্জন করে, তবে ভগবান তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাকে নিজের কাছে টেনে নেন। এখানে ঐ যুবতী-কন্যাটির ক্ষেত্রেও ঠিক সেইটিই হল। তিনি প্রভুর জন্য অশ্রুবিসর্জন করে দয়াময় গদাধরের কাছ থেকে প্রভূত অধ্যাত্ম সম্পদের অধিকারিণী হলেন।

‘ধন্য রূপসীর রূপ যে রূপের বলে।
প্রভুতে বাৎসল্য-ভাব কুড়াইয়া পেলে।।’ (পৃঃ ৭৫)

গদাধরের একান্ত মনের বাসনা—তন্ত্রমতে যত প্রকার সাধনা আছে, সেগুলি নিয়ে সাধনা করার। গদাধরের দীক্ষাগুরু তো আগেই তাঁর দীক্ষার সময়ের কাণ্ড দেখে পালিয়েছেন। এখন উপায়!

পূর্বেই দেখা গেছে ঠাকুরের বিভিন্ন বিষয়ের সাধনার সময়, দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে বিভিন্ন উচ্চকোটির সাধকদের সমাগম হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়। সাধনার সময় যে-যে উপকরণের প্রয়োজন অথবা যে-সমস্ত ভাবের মানুষের সান্নিধ্যের প্রয়োজন—তখন সেই সেই জিনিস বা সেই সেই ভাবের সাধকগণেরই আগমন হত। এই সময় যেখানে যত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন, সবাই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসতে লাগলেন। আর ঠাকুরও তাঁদের সাধনার ক্ষেত্রে যেখানে যে অপূর্ণতা আছে বা ত্রুটি আছে, সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে ও ত্রুটিমুক্ত করে দিয়ে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে লাগলেন।

গদাধরের সাধনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যে-কোনও মানুষের পক্ষে জোগাড় করা খুব সহজ ছিল না। এই সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। ঠাকুর একদিন মা-ভবতারিণীকে সাজাবেন বলে সকালবেলা গঙ্গার ধারের ফুলবাগান থেকে ফুল তুলছিলেন। হঠাৎ চোখ পড়ল গঙ্গার ঘাটের দিকে। দেখলেন একটি নৌকো বকুলতলার ঘাটে এসে ভিড়ল। অবাক হয়ে গেলেন নৌকোটি থেকে অদ্ভুত পোশাক-পরিহিতা একজন স্ত্রীলোককে নামতে দেখে। পরিধানে গেরুয়া ও হাতে ত্রিশূল। ঘাড়-পিঠ অতিক্রম করে কোমর পর্যন্ত অসম্বদ্ধ আলুলায়িত দীর্ঘ কেশ—সন্ন্যাসিনী। তিনি ধীর পায়ে চাঁদনির ঘাটে গিয়ে বসলেন।

ঘরে ফিরে এসে ঠাকুর ভাগনে হৃদয়কে বললেন : ওরে হৃদু, ঘাটে একজন ভৈরবী এসেছে। যেমনই তার গায়ের রঙ, তেমনই তার তেজোময়ী ভঙ্গি। চাঁদনিতে বসে আছে। যা তাকে চাঁদনি থেকে ডেকে নিয়ে আয়। হৃদয় বলত, অপরিচিতা সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য মামার আগ্রহ দেখে সে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

'একদিন দেখিলেন প্রভু লক্ষ্য করি।
সুরধুনীকূলে বসি আছে এক নারী।।
… … …
কেন তিনি অকস্মাৎ ডাকেন কামিনী।
যেমন মানুষ-বুদ্ধি সন্দেহ অমনি।।' (পৃঃ ৭৫)

হৃদয় ঠাকুরের কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে মনে মনে ভাবছে—স্ত্রীলোককে যিনি বিষবৎ মনে করেন, তিনি কেন তাঁকে ডাকছেন? হৃদয় যখনই ঠাকুরকে মানুষ বলে মনে করে, তখনই তার মনের মধ্যে নানা সন্দেহ ও প্রশ্ন এসে ভিড় করে। (ঠাকুর কখনও কোনও স্ত্রীলোককে অসম্মানসূচক কথা বলেননি বা নরকের কীট বলেও ভাবেননি। সমস্ত স্ত্রীজাতিকে তিনি মাতৃজ্ঞান করতেন।)

গদাধরের আদেশ না-মেনে উপায় নেই। হৃদয় তবুও বলল, 'তুমি ডাকলেই বা সে (সন্ন্যাসিনী) এখানে আসবে কেন?'

'তুই যা না। গিয়ে বলবি আমি এখানে আছি।'

হৃদয় চাঁদনির ঘাটে গিয়ে দেখে যে, ঐ ব্রাহ্মণী ঘাটেই বসে আছেন। যেন হৃদয়ের আগমনেরই প্রতীক্ষা করছেন! হৃদয় মামার নাম করে তাঁকে ডাকতেই সন্ন্যাসিনী কোনও প্রশ্ন না করেই আসবার জন্য প্রস্তুত হলেন দেখে হৃদয় আরও বিস্মিত হল।

'ভাবিয়া চিন্তিয়া হৃদু গিয়া সন্নিধানে।
কূলে উপবিষ্টা নারী ডাক দিয়া আনে।।' (পৃঃ ৭৫)

সন্ন্যাসিনী গদাধরকে দেখেই আনন্দের আতিশয্যে কেঁদে ফেললেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন : 'বাবা, তুমি এখানে? শুধু এইটুকুই জেনেছিলাম যে, তুমি গঙ্গাতীরে আছ। সেই থেকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এতদিনে তোমার দেখা পেলাম!'

ঠাকুর বললেন : 'আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ! কিন্তু আমার কথা তুমি জানলে কি করে মা?'

ভৈরবী তখন বললেন : 'তোমাদের তিনজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, একথা জগদম্বার কৃপায় আগেই জেনেছিলাম। এর মধ্যে দুজনের সঙ্গে বাংলাদেশে দেখাও হয়েছে। ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে এসেছি। আজ এখানে তোমার দেখা পেলাম।'

ঠাকুর প্রশ্ন করেছিলেন : 'কে মা তুমি সংসারত্যাগিনী?'

ভৈরবী বলেন, 'বাবা, পূর্ববঙ্গের যশোর জেলার ব্রাহ্মণ বংশে আমার জন্ম। কেউ কেউ যোগেশ্বরী বলেই আমাকে জানে।'

এই ভৈরবীর মনের একমাত্র সাধ—একমাত্র বাসনা ঈশ্বর লাভ করার। সমস্ত মন শ্রীহরির পাদপদ্মে অর্পণ করার ফলে নিজের শরীরের প্রতি তাঁর কোনও ভ্রূক্ষেপই ছিল না।

তা ছাড়াও একদিন রাতে তিনি একজন পরমহংসকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি স্বপ্নে এটিও জেনেছিলেন যে, ঐ পরম পুরুষটি ভাগীরথীর তীরে বাস করছেন। এই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষকে কীভাবে দর্শন করবেন—এই চিন্তায় ভৈরবী কুল, শীল, ভয়, লজ্জা সবকিছু বিসর্জন দিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

'চমকি উঠিয়া চিন্তা করে অনুক্ষণ।
কি করিয়া হয় স্বপ্নদৃষ্ট দরশন।।
… … …
আপন চিন্তায় মগ্ন ঘাটে বসি ছিল।
প্রভুর আজ্ঞায় হৃদু ডাকিয়া আনিল।।' (পৃঃ ৭৫)

সন্ন্যাসিনীকে দেখে ঠাকুর অত্যন্ত পুলকিত হয়ে গদগদস্বরে তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে দেখেই তিনি বুঝেছিলেন, ইনি কেবল একজন সামান্যা রমণীমাত্র নন—উচ্চকোটির সাধিকাও। ইনি খুব সহজভাবেই সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। অনুরূপভাবে তাঁর অন্তরের আধ্যাত্মিক সম্পদও স্বতই প্রকাশিত।

‘পুলকে পূর্ণিত তনু গদগদ স্বরে।
মা বলিয়া প্রভুদেব সম্বোধিলা তাঁরে।।
এ নহে সামান্যা নারী বহু গুণাকর।
যেমন উপরে বাহ্য তেমতি ভিতর।।’ (পৃঃ ৭৬)

ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীভগবানকে লাভ করবার জন্য কঠোর সাধনভজন করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি ছিলেন বিশেষভাবে বিচক্ষণ। গূঢ় শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যায় তিনি পারদর্শী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির মধ্যেই বৈষ্ণবচরণ নামে খুব নামকরা একজন তত্ত্বান্বেষী প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের কথা পাওয়া যায়। শাস্ত্রজ্ঞ সেই মহা-পণ্ডিতও ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। এই রকম গুণবতী কন্যার কথা কবে কে কোথায় শুনেছে?

‘তত্ত্বান্বেষী একজন বৈষ্ণবচরণ।
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পড়া শাস্ত্র অগণন।।
পরাজয় মানে তাঁর পরিচয় পেয়ে।
কে দেখেছে কে শুনেছে হেনরূপ মেয়ে।।’ (পৃঃ ৭৬)

মাতৃহারা শিশু যেমন পুনরায় মাকে ফিরে পেয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধরে, সেইরকম আগ্রহ নিয়ে গদাধর আঁকড়ে ধরলেন ভৈরবীকে। আর ভৈরবী ব্রাহ্মণীও—

‘বিভোর বাৎসল্যভাবে করে নিরীক্ষণ।
যেন প্রভুদেব তাঁর আপন নন্দন।।
প্রভুও বালকবৎ দেন পরিচয়।
অবস্থাভাবের কথা যে রকম হয়।।’ (পৃঃ ৭৬)

ঠাকুরের এত দিনের জমে থাকা সমস্ত কথা শুনে ভৈরবী বাৎসল্যভাবে পূর্ণ হয়ে বললেন : কে তোমাকে পাগল বলে বাবা! একে মহাভাব বলে। এখানে এ ভাব চেনে এমন কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। এই ভাব হয়েছিল শ্রীমতী রাধারানির আর হয়েছিল

শ্রীচৈতন্যের। ভৈরবীর কণ্ঠে এই অমৃত-আশ্বাস ঝরে পড়ায় গদাধর বুঝেছিলেন যে এটি তাঁর শারীরিক কোনও ব্যাধি নয়। এখন ব্রাহ্মণীর কথা শুনে ঠাকুরের হৃদয় ভরে উঠল।

‘ছিল এক শালগ্রাম ব্রাহ্মণীর ঠাঁই।
অন্তরে জানিলা প্রভু জগৎ-গোঁসাই।।’ (পৃঃ ৭৬)

কথায় কথায় ভোগের সময় হয়ে গিয়েছে দেখে অন্তর্যামী গদাধর হৃদয়কে ডেকে বললেন : ‘ব্রাহ্মণীর সঙ্গে শালগ্রামশিলা আছেন। তাঁর জন্য মনের মতো সিধা সাজিয়ে এনে দাও।’

সিধা নিয়ে পঞ্চবটীতে লুচি-ডাল প্রস্তুত করার সময় ঈশ্বরীয় আনন্দে ভৈরবীর চোখদুটি বারবার জলে ভরে উঠতে লাগল।

ভোগ রান্না করে শালগ্রাম-শিলাটির সামনে নিবেদন করে ধ্যানে বসলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী। দু-গাল বেয়ে দরদর করে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছে—ধ্যানে দেখছেন তাঁর নিবেদিত ডাল-লুচি স্বয়ং রঘুবীররূপী শালগ্রামশীলা খুব তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করছেন।

এদিকে কোনও এক অদৃশ্য প্রাণের আকর্ষণে—কোনও এক ব্যাকুল করা অদৃশ্য নিমন্ত্রণের আকুল আহ্বানে গদাধর ভাবাবেশে বিভোর হয়ে পঞ্চবটীতে চলে এসেছেন।

‘এমন সময় প্রভুদেব ভগবান।
চুপে চুপে গিয়া দুই হাতে লুচি খান।।’ (পৃঃ ৭৬)

ধ্যানান্তে চোখ-দুটি মেলে নিজেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে লাগলেন ভৈরবী। দেখলেন তাঁর প্রদত্ত ভোগ ভগবানরূপী গদাধর ভাবে বিভোর হয়ে তাঁর শ্রীমুখকমলে গ্রহণ করছেন। বাহ্য অবস্থায় ফিরে এসে অপ্রস্তুতের মতো ব্রাহ্মণীকে বললেন : মাগো, ভাবে কখন যে কি করে ফেলি, বুঝতে পারি না!

'ব্রাহ্মণী খুলিয়া আঁখি যে সময় চায়।
প্রভুর স্বরূপ অঙ্গে দেখিবারে পায়।।
তায় খান দত্ত ভোগ শ্রীমুখকমলে।
ধেয়া ধেয়া নাচে মাগী পঞ্চবটতলে।।' (পৃঃ ৭৬)

ব্রাহ্মণী বললেন : 'ঠিক করেছ বাবা। আমি ধ্যানে যাঁকে দেখেছি—এখানে এখন তাঁকেই তো দেখছি—সেই ভোগ তিনি খুব তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করছেন।' যাঁকে বুকে নিয়ে এতকাল কাটিয়েছেন, কত সব কঠোর সাধন করেছেন—তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে—এতকালের প্রাণের শালগ্রাম-শিলাটি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিলেন।

'ধিয়ানে দেখিনু যাঁরে পাইলাম তাঁয়।
এত বলি শালগ্রাম ফেলিল গঙ্গায়।।
আনন্দের সীমা নাই তাঁহার অন্তরে।
হেরিয়া দুর্লভ ধন প্রত্যক্ষগোচরে।।' (পৃঃ ৭৬)

ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঈশ্বরলাভ করবার জন্যই আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে, শীত-গ্রীষ্মের দারুণ কষ্ট সহ্য করে কত কঠোর সব সাধনা করেছেন। সেই পরমেশ্বরকে আজ জীবন্ত দর্শন করে ব্রাহ্মণীর অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ। সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ছটফট করে যার জন্য পথে-পথে—বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে কঠোর সাধনভজন, উপবাস এবং অশ্রুপাত করেছেন—গদাধরের মধ্যে নিজের বহু আকাঙ্ক্ষিত শালগ্রামশিলারূপী স্বয়ং নারায়ণের দর্শন লাভ করে আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগলেন ভৈরবী। দক্ষিণেশ্বরে এসে ব্রাহ্মণী সাগরের অমূল্য-রতন লাভ করলেন। আনন্দে উন্মত্তপ্রায় ব্রাহ্মণী বাৎসল্যভাবে পূর্ণ হয়ে বারবার গদাধরের শ্রীমুখকমল দর্শনের জন্য এক-দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু—

'দেখিবারে শ্রীপ্রভুর শ্রীমুখকমল।
সাধে বদী হৈল নিজ নয়নের জল।।' (পৃঃ ৭৭)

ইষ্টদর্শনের আনন্দে চোখদুটি দিয়ে অবিরল ধারায় ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ার জন্য তিনি গদাধররূপী-নারায়ণের সুন্দর মুখখানি দেখতে পাচ্ছেন না। আর তাই ভৈরবী অন্তরে যুগপৎ আনন্দ ও বেদনা দুটোই সমানভাবে অনুভব করতে লাগলেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুরের দেহে জীবন্ত রঘুবীরকে দর্শন করে কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তাঁর ভোজন অবশিষ্ট দেবপ্রসাদরূপে গ্রহণ করলেন। তিনি এটিও বুঝেছিলেন যে, এখন থেকে তাঁর আর বাহ্যপূজাদির কোনও প্রয়োজন নেই।

ঠাকুর মা-ভবতারিণীকে কাতরভাবে বলতেন : 'মা, আমি তোর মুখ্যু ছেলে। আমাকে তুই শিখিয়ে পড়িয়ে নে মা।' তাঁকে শেখাবার বা তপস্যায় সাহায্য করবার জন্যই তো মা-ভবতারিণী পাঠিয়ে দিয়েছেন বিদুষী ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে গুরুরূপে। ঠাকুরের ধর্মজীবনের প্রথম সন্ন্যাসিনী গুরু। তিনি মাতৃরূপিণী ও সর্বমঙ্গলস্বরূপিণী। ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে বোঝাতে লাগলেন দিব্যদর্শন কাকে বলে, কাকেই বা বলে দিব্যোন্মাদনা। তিনি শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে গদাধরকে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। বহু প্রশ্নের সমাধান হল গদাধরের। মুক্ত হলেন অনেকরকম সংশয় থেকেও। ভৈরবী-ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনায় পঞ্চবটীতে বইতে লাগল দিব্য আনন্দের স্রোত।

ভক্তিমতী ব্রাহ্মণী ভক্তিপথের সাধিকা। তিনি প্রায় সবসময় ভক্তিশাস্ত্রাদি পাঠ করতেন।

শিহড়ে যাওয়ার পথে ঠাকুরের অলৌকিক দর্শন এবং শারীরিক বিকারাদির কথা শুনে ব্রাহ্মণীর পূর্বেই ধারণা হয়েছিল, ইনি কখনোই একজন সাধারণ সাধকমাত্র নন—স্বয়ং অবতার। এই রকম একদিন ঠাকুরের সামনে খুবই অনুরাগের সঙ্গে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করছেন—তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ ভৈরবী। পাঠকালে তিনি চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত অবতার-পুরুষের শারীরিক লক্ষণসমূহের সঙ্গে গদাধরের শারীরিক লক্ষণগুলি

মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন। লক্ষ্য করলেন, ভগবানের কথা বলতে গেলেই ঠাকুর ভাবে বিভোর হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কীর্তনানন্দে ঢলে ঢলে পড়ে যান। ধ্যানে বসলেই সমাধিস্থ হয়ে যান। এ-সমস্তকিছুই চৈতন্যদেবের দেবতনুর লক্ষণের সঙ্গে হুবহু এক। সেই জ্ঞান, সেই ভক্তি, সেই তীব্র বৈরাগ্য ও সেই তীব্র অনাসক্তি। যাঁকেই স্পর্শ করছেন, তাঁকেই ঈশ্বরভাবে উদ্দীপত করে দিচ্ছেন। এমন প্রিয় যে নিজের শরীর তীব্র ব্যাকুলতায় তা-ও তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। ভাবে বিভোর হয়ে জলে পড়লেন, না আগুনে পড়লেন সেই বোধই নেই। তখন তাঁর কাছে আগুন বা মাটি সবই তুচ্ছ। এই সময়ে তাঁর শরীরে বাহ্যচেতনার চিহ্নমাত্রও থাকছে না। যেমন গোপিনীদের হয়েছিল। রাসমণ্ডলের মধ্যে থেকে নবম বর্ষীয় বালক শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হলেন। গোপিনীরা তাঁদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে না দেখে একেবারে পাগলিনীর মতো হয়ে তাঁকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। গাছ দেখে বলছেন : তুমি নিশ্চয়ই আমাদের কৃষ্ণকে দেখেছ, তা না হলে অমন নিশ্চল বা সমাধিস্থ হয়ে রয়েছ কেন? তৃণাচ্ছন্ন মৃত্তিকাকে দেখে তাঁরা বলছেন : আহা! তুমি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দেখেছ—তা যদি না হত তবে কেন তোমার দেহে এমন রোমাঞ্চ হচ্ছে। এটাই তো প্রেমোন্মাদ অবস্থা! প্রেমে হাসে-কাঁদে-নাচে-গায়।

ভৈরবী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণের কথা যখন পড়ছেন, দেখছেন—অশ্রু, পুলক, কম্পন প্রভৃতি লক্ষণগুলির যেমন-যেমন বর্ণনা সেখানে রয়েছে, ঠাকুরের শরীরে সেই-সেই লক্ষণগুলি অত্যন্ত প্রকট।

‘যবে যে ভাবের কথা পড়েন ব্রাহ্মণী।
প্রভুর শ্রী অঙ্গে তাহা উদয় তখনি।।
পড়ে গ্রন্থ আর প্রভু-অঙ্গ পানে চায়।
বর্ণিত প্রত্যক্ষ দুয়ে একত্রে মিলায়।।’ (পৃঃ ৭৭)

চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ-দুটির মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের এবং নিত্যানন্দের জীবোদ্ধারের জন্য পুনরায় শরীর ধারণের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কথাগুলি পাঠ করে এবং এই দুজন দেবমানবের আচার-আচরণ, অলৌকিক দর্শন ইত্যাদি সমস্ত কিছুই ঠাকুরের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলে যাওয়ায়, ভৈরবী দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করতে লাগলেন তিনিই অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন। বললেন : ‘এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।’ এবার তারণ করবার জন্যই গদাধরের অবতরণ।

গদাধরের শরীরের সঙ্গে শাস্ত্র-বর্ণিত বিবরণ এবং বাস্তব—দুটিকেই মিলিয়ে নিয়ে আনন্দে হাততালি দিয়ে ভৈরবী বলে উঠলেন, ‘এই তো শ্রীগৌরাঙ্গদেব এসেছেন এবার নিত্যানন্দের দেহে।’

‘করতালি দিয়া মাগী নেচে নেচে বলে।
এইতো গৌরাঙ্গদেব নিতাইয়ের খোলে।।’* (পৃঃ ৭৭)

আনন্দে ভৈরবী এই কথা মন্দিরের প্রত্যেকের কাছে আনন্দ ও আবেগ কথাটি বোঝাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঘোষণা করতে লাগলেন।

ঠাকুরের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণীর অত্যুচ্চ ধারণার কথা ক্রমে ক্রমে কালী-মন্দিরের সবাই জেনে গেলেন। এর ফলে এই বিষয়টি সম্পর্কে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করল। মজার ব্যাপার হল কেউই যেমন ব্রাহ্মণীর কথা মেনে নিতে পারছেন না আবার শাস্ত্র থেকে ভৈরবী যে-সমস্ত উদ্ধৃতি দিচ্ছেন—সেগুলি কেউই খণ্ডন করতেও পারছেন না। এই সমস্ত কথা শুনে অনেকেই তাঁকে উপহাস করতে

---

* ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি’র মধ্যে ‘মাগী’ কথাটির ব্যবহার দেখা যায়। এটির প্রয়োগ নিকৃষ্ট অর্থে নয়। তখনকার দিনে স্ত্রীলোক কথাটি বোঝাতে ‘মাগী’ অভিধাটি প্রচলিত ছিল। এখন ‘মাগী’ শব্দটি অর্থের অপকর্ষের দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

লাগলেন। কিন্তু স্বভাব-উদাসিনী ব্রাহ্মণী কারও কাছ থেকে কোনও কিছু আশা বা প্রত্যাশা করতেন না। যে জিনিসটিকে তিনি সত্য বলে মনে করতেন নির্ভয়ে সেটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন। এ-ব্যাপারে নিন্দিত বা উপহসিত হওয়ার কোনও ভয়ই তাঁর ছিল না। সেইজন্য তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে আবারও বললেন :

'এই রামকৃষ্ণ সেই গৌর গুণধাম।
সাব্যস্তে সহস্র দেয় শাস্ত্রের প্রমাণ।।
প্রমাণ খণ্ডিতে কেহ নারে ধীরগণে।
তথাপি বিশ্বাস কার নাহি হয় মনে।।' (পৃঃ ৭৭)

মথুরবাবুর কানেও ঠাকুর সম্বন্ধে ভৈরবীর এই সিদ্ধান্তের কথা পৌঁছাল। পঞ্চবটীতে ঠাকুরের সঙ্গে মথুরবাবু একদিন কথা বলছিলেন। এই সময় ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে তাঁদের দিকে আসতে দেখে মথুরবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন : 'এই বোধ হয় তোমার সেই বামনী?' ঠাকুর সম্মতি জানিয়ে বললেন : হ্যাঁ, এই সেই ভৈরবী। ঠাকুর ভৈরবীকে সম্বোধন করে বললেন : ওগো! তুমি আমার সম্বন্ধে যা বলছিলে, সেটি মথুর মানতে চাইছে না। বলে যে 'বারোর' বেশি তো আর অবতার নেই।

ব্রাহ্মণী হুঙ্কার দিয়ে বলে ওঠেন : মিথ্যে কথা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে চব্বিশ অবতারের কথা ভগবান ব্যাসদেব উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়াও ভাগবতে তিনি বলেছেন : 'অবতারা হি অসংখ্যেয়া'—অসংখ্যবার ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে।

'মথুর বলেন ইহা কথা কি প্রকার।
বার বিনা নাহি শুনি আর অবতার।।' (পৃঃ ৭৭)

মথুরবাবু বললেন : তবে একথা গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শিরোধার্য করি যে, ছোট ভট্‌চায মা-কালীর অশেষ কৃপাধন্য। তাঁর ওপর মা-ভবতারিণীর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি আছে—এ-বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।

'তবে এ স্বীকার্য কথা মানি শিরোপরে।
কালীর হয়েছে কৃপা তাঁহার উপরে।।' (পৃঃ ৭৭)

ভাব কি, ভাব বা মহাভাব কাকে বলে, কোন ভাবের কি নাম বা কি তার লক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে এখানকার লোকদের অর্থাৎ ভবতারিণী মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কোনওরকম শাস্ত্রসম্মত ধারণা ছিল না। গদাধরের শরীরে বিভিন্ন ধরনের ভাব প্রকাশ পেত। এই সব দেখে কেউ বলতেন এসব বায়ুর উগ্রতা-সঞ্জাত কর্ম। আবার কেউ বলতেন শরীরের ব্যাধি। আবার কেউ বা বলতেন উন্মত্ততা বা মস্তিষ্কের বিকৃতি। যাঁরা একটু উন্নত মনের, তাঁরা বলতেন, মা-কালীর কৃপায় ছোট ভট্‌চাযের এমন অবস্থা।

'যে বড় উন্নত আত্মা এইটুকু গায়।
এমত অবস্থা তাঁর কালীর কৃপায়।।' (পৃঃ ৭৭)

ভৈরবী ব্রাহ্মণী গদাধরকে বলেছিলেন : তোমার মহাভাব হয়েছে। এই ভাব হয়েছিল শ্রীমতী রাধারানির, এই ভাব হয়েছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। কিন্তু এই 'মহাভাব' কাকে বলে?

মহাভাবের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলেন শ্রীমতী। একজন সখী শ্রীমতীর দেহ ছুঁতে গেলে অন্য সখী বলত : 'ওরে এখন কৃষ্ণ-বিলাসের অঙ্গ। ছুঁসনি, ছুঁসনি। এঁর দেহের মধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস করছেন।' মহাভাব হচ্ছে ঈশ্বরের ভাব। দেহ-মনকে একেবারে তোলপাড় করে দেয়। যেন একটা মস্ত হাতি ছোট্ট কুঁড়েঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ঘর ভেঙে একেবারে চুরমার করে ছেড়ে দিল। ঈশ্বরের বিরহআগুন ঠিক যেন প্রলয়ের আগুনের মতো। সে কি সামান্য? রূপ-সনাতন যে গাছের তলায় বসতেন, সেই গাছের পাতা ঝলসে পুড়ে যেত।

ঠাকুর একদিন বলছেন : 'এই অবস্থায় তিন দিন এক জায়গায় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে অনড় হয়ে পড়েছিলাম। হুঁশ হলে বামনি আমায় ধরে

স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু আমার গায়ে হাত ঠেকাবার কি যো আছে! গা মোটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলে। সেই চাদরের উপর দিয়ে ধরলে আমাকে। ধরে নিয়ে গেল গঙ্গায়। গায়ে যেসব মাটি লেগেছিল পুড়ে গিয়েছিল...।'

শ্রীমা বলতেন : 'ঠাকুরের যখন মহাভাব হত, মনে হত বুকের ভিতর যেন সাতটা আগুনের তাওয়া জ্বলছে।'

কৃষ্ণপ্রেমে বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধারানির উনিশ প্রকার শারীরিক বিকার প্রকাশ পেত। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এগুলিকেই মধুরভাব বলে নির্দিষ্ট করেছে। মধুরভাবের পরাকাষ্ঠাকেই 'মহাভাব' বলে।

গদাধরের শারীরিক বিকার সম্বন্ধে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্ত জেনে মথুরবাবু খুবই বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন—মানুষে ঈশ্বরের আবেশ, এ কেমন কথা! মথুরবাবু কৌতুকপ্রিয় মানুষ। তাঁর মনে আসল জিনিসটি জানবার খুবই আগ্রহ। আর গদাধরও নাছোড়বান্দা হয়ে মথুরবাবুকে বারবার বলতে লাগলেন : 'সাধক ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এনে সভা করাও।' অর্থাৎ তাঁর এই ঈশ্বরীয় আবেশ শাস্ত্রে কীভাবে বর্ণিত বা ব্যাখ্যাত হয়েছে আর উক্ত বিষয়ে সাধক ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের কী সিদ্ধান্ত তা জেনে নেবার জন্য ঠাকুর মথুরবাবুকে উৎসাহিত করছেন।

'প্রভুও নাছোড়বান্দা কন বারে বারে।
সাধক শাস্ত্রজ্ঞ আনি সভা করিবারে।।' (পৃঃ ৭৭)

মথুরবাবুও ঠাকুরের কথামতো পণ্ডিতদের সভা করবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, ছোট ভট্চাযের ওষুধ ও ডাক্তারের জন্য তো অনেক টাকা খরচ হচ্ছে—এবার তাঁর কথানুযায়ী পণ্ডিতদের সভা করলে বরং উপকারই হবে। কেননা পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণীর কথা নিশ্চয়ই শাস্ত্র-প্রমাণ দিয়ে কেটে দেবেন। ছোট ভট্চাযের সরল বিশ্বাসী হৃদয়ে তখন নিশ্চিত ধারণা হবে যে তাঁর শারীরিক বিকার, রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তখনকার সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ সাধক বৈষ্ণবচরণের খুব নামডাক ছিল। মথুরবাবু ঐ খ্যাতিমান পণ্ডিতকে দক্ষিণেশ্বরে আনাবেন বলে ঠিক করলেন।

আমন্ত্রণ পেয়ে পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ সশিষ্য দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। দক্ষিণেশ্বরে মা-কালীর মন্দিরে সাড়া পড়ে গেল। বৈষ্ণবচরণ অন্যান্য পণ্ডিতদেরও সঙ্গে নিয়ে সভায় এসে হাজির হলেন। এই সভায় সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মথুরবাবু যেমন উপস্থিত হয়েছেন, ঠিক তেমনই মন্দিরের কর্মচারীরাও মজা দেখবার জন্য সভায় এসে ভিড় জমিয়েছেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী প্রথমেই ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁর যে পর্যবেক্ষণ, যে দৃঢ় ধারণা সেগুলি শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে সভায় পরিষ্কার করে তুলে ধরলেন। শুধু ঐটুকু বলেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। বৈষ্ণবচরণকে সম্বোধন করে বললেন : 'গদাধর নররূপী স্বয়ং অবতার। আপনারা যদি এটি না মানেন, তাহলে বলুন, কেন এবং কি কারণে আপনারা এই তত্ত্ব বা সত্য মানছেন না।'

মা যেমনভাবে তাঁর বিপন্ন সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য বীরদর্পে রুখে দাঁড়ান, ভৈরবী ব্রাহ্মণীও এখন ঠিক সেই ভাবে গদাধরকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কোনও এক দৈববলে বলশালিনী হয়ে ঠাকুরের পক্ষে সওয়াল করবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

আর যাঁকে নিয়ে এত বিশাল পণ্ডিত ও জ্ঞানীদের সমাবেশ, এত হৈ-হট্টগোল সেই গদাধর বাদানুবাদে নিবিষ্ট ঐ সমস্ত পণ্ডিতদের মধ্যে আত্মভোলা শিশুর মতো আলুথালু হয়ে বসে আছেন। কখনও শিশুর মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছেন। কখনও বা 'আপনাতে আপনি' আনন্দ অনুভব করে হাসছেন। কখনও বা কাছে রাখা বটুয়া থেকে দুটি মৌরি বা কাবাবচিনি তুলে মুখে দিয়ে এমনভাবে তাঁদের কথাবার্তা শুনছেন, যেন ঐসব কথা অন্য কারও সম্বন্ধে হচ্ছে। আবার কখনও

কখনও নিজের ভাবাবস্থার বিষয়ে বৈষ্ণবচরণের অঙ্গ স্পর্শ করে বলছেন : ‘ওগো, এই রকমটা হয়।’

‘ওজস্বিনী ব্রাহ্মণীর আমূল বর্ণন।
একমনে শুনিলেন বৈষ্ণবচরণ।।’ (পৃঃ ৭৮)

সব কথা শুনে ভৈরবীর সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সায় দিলেন বৈষ্ণবচরণ। আরও বললেন : গদাধর ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি—যে প্রধান প্রধান উনিশ প্রকার ভাব বা অবস্থার সম্মিলনকে ভক্তিশাস্ত্র ‘মহাভাব’ বলে নির্দেশ করেছেন, কী আশ্চর্য সেই সব লক্ষণগুলিই গদাধরের মধ্যে প্রকাশিত। সাধারণ জীবের শরীর এই উনিশ প্রকার ভাবের উদ্দাম বেগ কখনোই ধারণ করতে সমর্থ হয়নি এবং শাস্ত্র বলছেন : ভবিষ্যতেও কখনও কোনও মানুষই এই ভাবাবেগ ধারণ করতে সমর্থ হবে না।

সুপণ্ডিত জ্ঞানী বৈষ্ণবচরণ সাধনালব্ধ সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে ঠাকুরকে দেখেই মহাপুরুষ বলে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করে ঐ সভার মধ্যে ধীরভাবে তিনি বললেন, ‘এ প্রসঙ্গে বিচারের আর কোনও প্রয়োজন দেখি না। কারণ এঁর শ্রীঅঙ্গেই শাস্ত্রলিপিসমূহের সাক্ষাৎ প্রকাশ দেখলাম।’ কাজেই ব্রাহ্মণী এঁর সম্বন্ধে যা বলেছেন, আমিও ঠিক সেই কথাই বলছি। আমি ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। যে পরমা ভক্তির ফল ‘মহাভাব’ সেটি গদাধরের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট। বৈষ্ণবচরণের কথা শুনে মথুরবাবু এবং সভাস্থ সকলে একেবার বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেলেন।

‘সাধনাজ সূক্ষ্মদৃষ্টিবল সহকারে।
প্রভুরে দেখিয়া কয় সভার ভিতরে।।
… … …
শ্রীঅঙ্গে শাস্ত্রের লিপি দেখিবারে পাই।
ব্রাহ্মণী বলেন যাহা আমি বলি তাই।।’ (পৃঃ ৭৮)

এতকাল তর্কযুদ্ধে অজেয় ছিলেন গৌরীপণ্ডিত। দেখলেন তাঁর চেয়েও শক্তিমান পুরুষ আছে। অত বড় তান্ত্রিক-সাধক গৌরীপণ্ডিত, তিনি শুধু নিজেকে তর্কের মধ্যেই এতকাল আবদ্ধ করে রেখেছেন—সেই ত্রিকালাতীতকে, সেই পরমব্রহ্মকে বোঝবার বা জানবার চেষ্টাওতো তিনি করেননি। তাঁর মনে বিস্ময় : কে এই অসাধারণ ব্যক্তি—এই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ যিনি তাঁর একটি ধ্বনিতেই বিশ্বচরাচরের সমস্ত কোলাহল মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ করে দেন!

যিনি কোনও দিন তর্কে কারও কাছে মাথা নত করেননি, তর্কে অপরাজেয় সেই গৌরীপণ্ডিত এখন বিষণ্ণ মনে মন্দিরে প্রবেশ করলেও মনে-মনে সম্পূর্ণভাবে ঐ ‘পূজারি ব্রাহ্মণের’ কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

‘পরাজিত হ’য়ে রবে বসিল ব্রাহ্মণ।
বিস্ময়-স্তম্ভিতভাবে মলিন বদন।।’ (পৃঃ ৮৩)

এই সময় গৌরীপণ্ডিত দিন-রাত গদাধরকে তাঁর সাধনলব্ধ-জ্ঞান-সহায়ে দর্শন ও উপলব্ধি করে বিস্ময়ে এবং আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন। শেষপর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বয়ং ঈশ্বর বলে গৌরীপণ্ডিত মন-প্রাণ দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করে একদিন তাঁকে বললেন : ‘আমি দীনহীন, আপনার শরণাগত। আপনি সেই পরমব্রহ্ম—স্বয়ং ত্রিভুবনেশ্বর। এখন অবতার হয়ে লীলা করছেন। কৃপা করে আপনি আমার নয়নের আঁধার ঘুচিয়ে দিন।’

‘কি জানি দেখিয়া কিবা কহে একদিন।
আশ্রিত শরণাগত আমি দীনহীন।।’ (পৃঃ ৮৩)

ঠাকুর বললেন, ‘ওহে তান্ত্রিক-ব্রাহ্মণ, আমার মধ্যে তুমি এখন এমন কী লক্ষণ দেখলে? অন্য পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার করে তোমার এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে হবে।’